স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন

পিএইচ. ডি. ডিগ্রি উপাধি লাভের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

গবেষক

সাহেব হেমব্রম

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1300815

বর্ষ: ২০১৫

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন

Certified that the Thesis entitled

"স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন"

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under Supervision of Professor Dr. Ananya Baruya, Department of Bengali, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Ananya Baruya.

Supervisor:

Dated: 22. 07. 22.

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Saheb Hembrom

Dated: 22-07-2022

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ২০১৩ সালে ভর্তি হয়েছি এম.ফিল কোর্সে। এই কোর্সে বিষয় নির্বাচন করেছিলাম 'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস (নির্বাচিত): গ্রামবাংলার চিত্রাবলী'। এই গবেষণার কাজে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়া। এবং এম.ফিল কোর্স সমাপ্ত করি ২০১৫ সালে। এই গবেষণায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাস নির্বাচন করেছিলাম, তাতে গ্রামবাংলার জীবন অন্বেষণ করতে গিয়ে সাঁওতাল জনজাতি সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছিলাম। অর্থাৎ মাত্র দু'টি উপন্যাসে উঠে আসা সাঁওতাল জীবন নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। গবেষণা চলাকালীন মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে পিএইচ. ডি. গবেষণায় সাঁওতালদের নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করবো। আসলে আমি নিজেও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। গল্প-উপন্যাস পাঠ করার সময় আমাদের সমাজের জীবনকে ভিতর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। অনুভব করেছি আমাদের সাঁওতাল জীবনের অতীত ও বর্তমানের অবস্থা। তাই আমি বিষয় হিসাবে নির্বাচন করলাম 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজীবন'। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়া মহাশয়া। যদিও গবেষণায় উল্লেখিত 'জনজীবন' শব্দ পরিবর্তে শুধু 'জীবন' শব্দটি রাখতে বললেন তত্ত্বাবধায়ক। এতএব, আমার গবেষণার শিরোনাম হলো 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন'। এবং আমি ২০১৫ সালে পিএইচ. ডি. গবেষণায় নিযুক্ত হলাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ড. অনন্যা বড়ুয়া মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়। গবেষণার প্রথম পর্যায় থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত তিনি আমাকে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন এবং আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে আমার ভুল-ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছেন ও আমাকে সচেতন করে দিয়েছেন। ওঁনার

সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন হত না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী হয়ে রইলাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে অশেষ সাহায্য পেয়েছি। বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আইভি আদক ও হরিশ মণ্ডল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া ন্যাশনাল গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, আম্বেদকর ভবন - সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গ্রন্থগারের সাহায্য নিয়েছি। তাই গ্রন্থাগারের কর্মীদের সহৃদয়তা ও সহয়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া আমার বন্ধু-বান্ধব আমাকে নানা সময়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই গবেষণা প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে ঋণী হয়ে থাকবো ‘University Grants Commission’ এর NET/JRF অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের কাছে।

আমার পূজনীয় বাবা কিষ্টু হেমব্রম এবং মা মাগদালিনা চর্ড়ের নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি আমার বাবা, মা, দাদা, দিদি, ভাই, বোনদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

সাহেব হেমব্রম

মানচিত্র

DISTRIBUTION OF SCHEDULED TRIBES

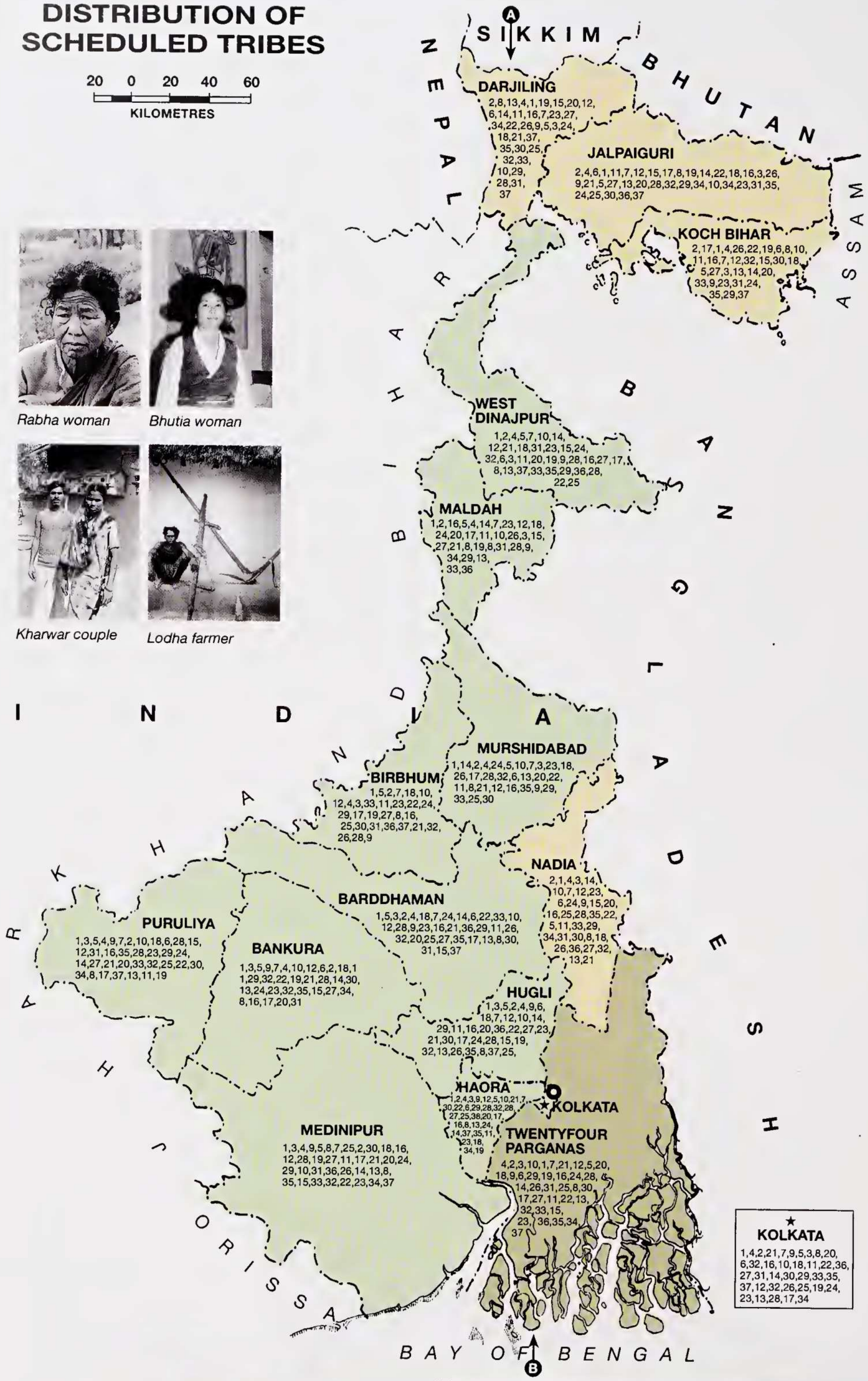

Rabha woman

Bhutia woman

Kharwar couple

Lodha farmer

SCHEDULED TRIBES
RANKED ON POPULATION SIZE 1981

1. SANTAL
2. ORAON
3. BHUMIJ
4. MUNDA
5. KORA
6. LODHA
7. MAHALI
8. BHUTIA
9. SAVAR
10. BEDIA
11. MECH
12. LOHARA
13. LEPCHA
14. MAL PAHARIA
15. CHIK BARAIK
16. KHARWAR
17. RABHA
18. MAHLI
19. NAGESIA
20. KISAN
21. GOND
22. ASUR
23. SAURIA PAHARIA
24. PARHAIYA
25. HO
26. GARO
27. KORWA
28. GORAIT
29. CHERO
30. BAIGA
31. KARMALI
32. HAJONG
33. MAGH
34. BIRJIA
35. BIRHOR
36. KHOND
37. CHAKMA

DOMINANT TRIBES

- SANTAL
- ORAON
- MUNDA

Toto couple

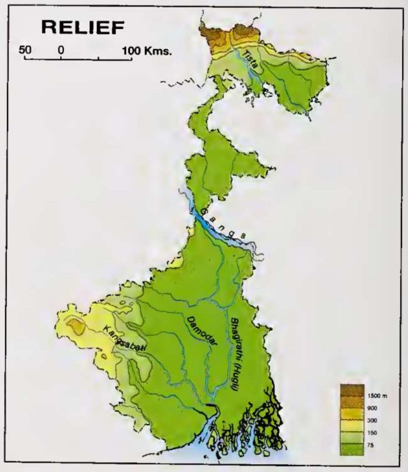

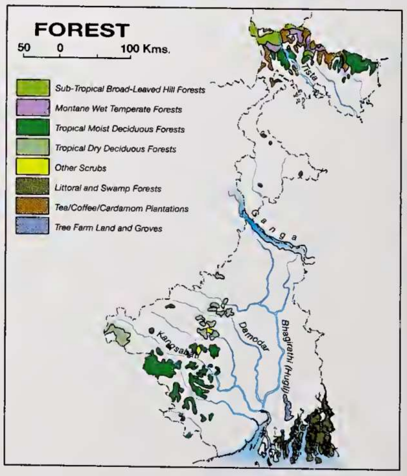

HABITAT PROFILE

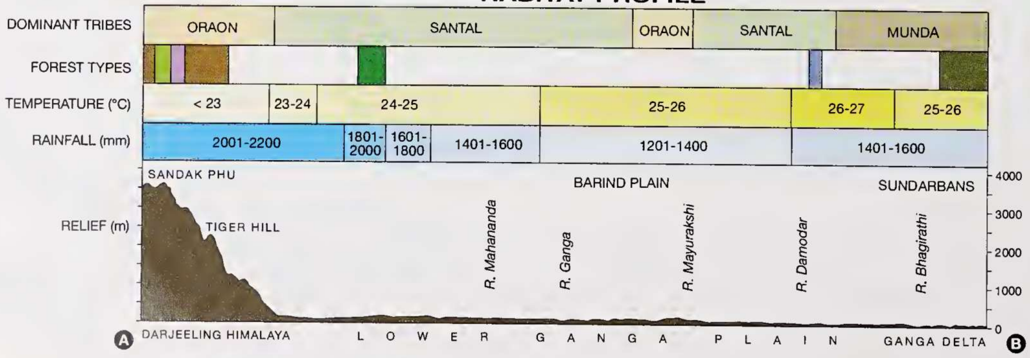

Santal Migration

JHARKHAND

DISTRIBUTION OF SCHEDULED TRIBES

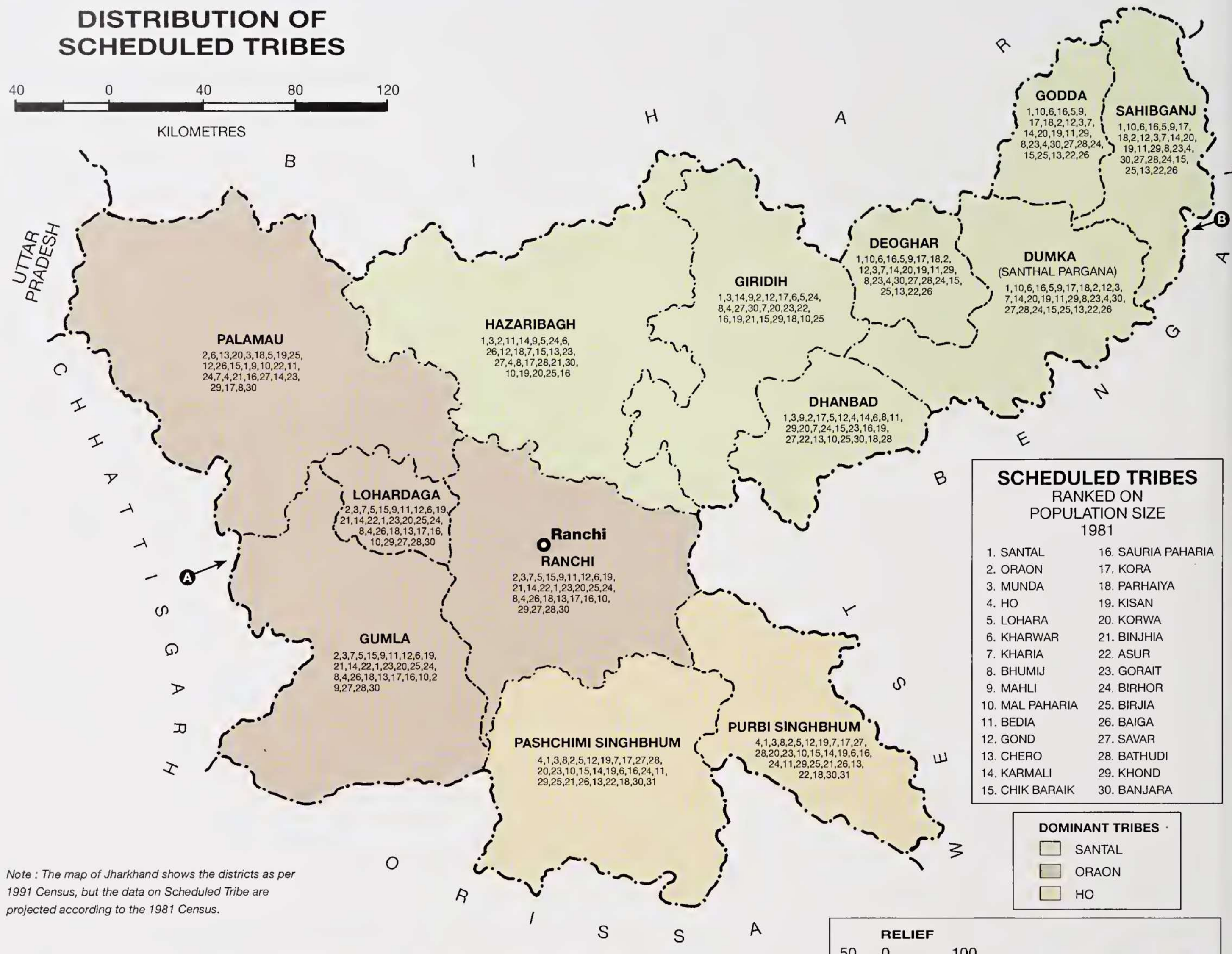

SCHEDULED TRIBES
RANKED ON POPULATION SIZE
1981

1. SANTAL	16. SAURIA PAHARIA
2. ORAON	17. KORA
3. MUNDA	18. PARHAIYA
4. HO	19. KISAN
5. LOHARA	20. KORWA
6. KHARWAR	21. BINJHIA
7. KHARIA	22. ASUR
8. BHUMIJ	23. GORAIT
9. MAHLI	24. BIRHOR
10. MAL PAHARIA	25. BIRJIA
11. BEDIA	26. BAIGA
12. GOND	27. SAVAR
13. CHERO	28. BATHUDI
14. KARMALI	29. KHOND
15. CHIK BARAIK	30. BANJARA

Note : The map of Jharkhand shows the districts as per 1991 Census, but the data on Scheduled Tribe are projected according to the 1981 Census.

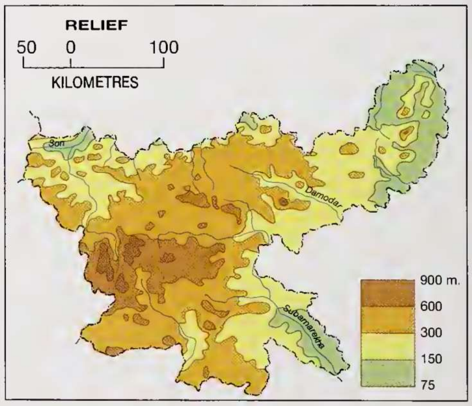

Gond woman

Santal girl

Mal Paharia women

Munda boy

Birhor woman

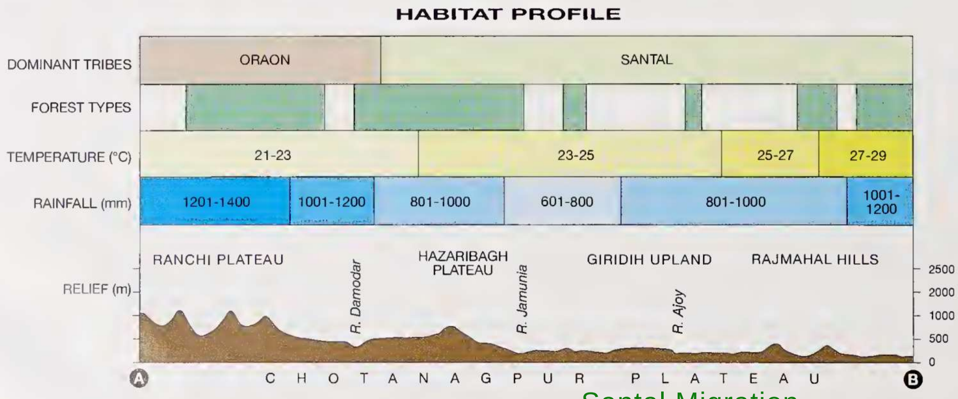

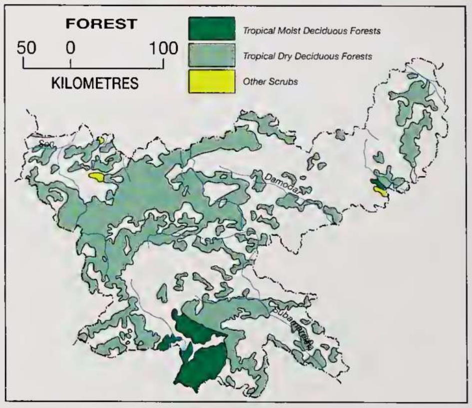

Santal Migration

DISTRIBUTION OF SCHEDULED TRIBES

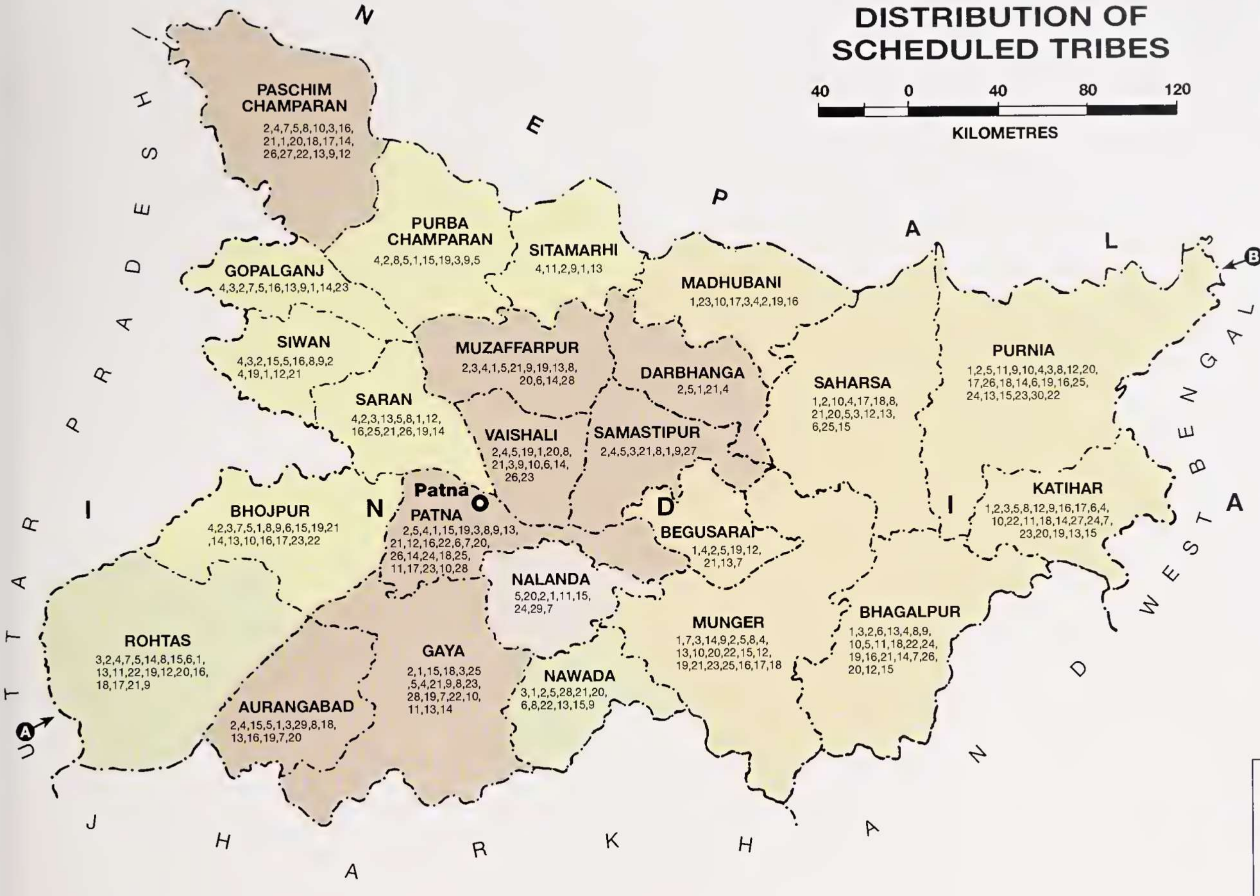

SCHEDULED TRIBES RANKED ON POPULATION SIZE 1981

1. SANTAL
2. ORAON
3. KHARWAR
4. GOND
5. MUNDA
6. KORA
7. CHERO
8. LOHARA
9. MAHLI
10. MAL PAHARIA
11. BEDIA
12. KISAN
13. KHARIA
14. KORWA
15. GORAIT
16. CHIK BARAIK
17. SAURIA PAHARIA
18. PARHAIYA
19. HO
20. KARMALI
21. ASUR
22. KHOND
23. BAIGA
24. BANJARA
25. SAVAR
26. BIRJIA
27. BINJHIA
28. BIRHOR
29. MAHALI
30. BATHUDI

DOMINANT TRIBES

- SANTAL
- ORAON
- KHARWAR
- GOND
- MUNDA

Kharwar man

Oraon boy

Munda man

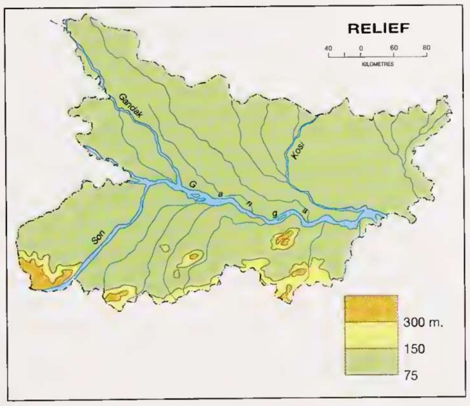

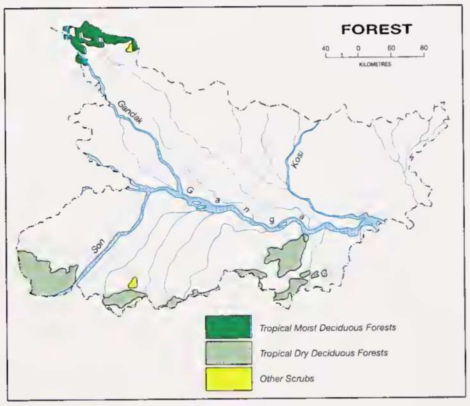

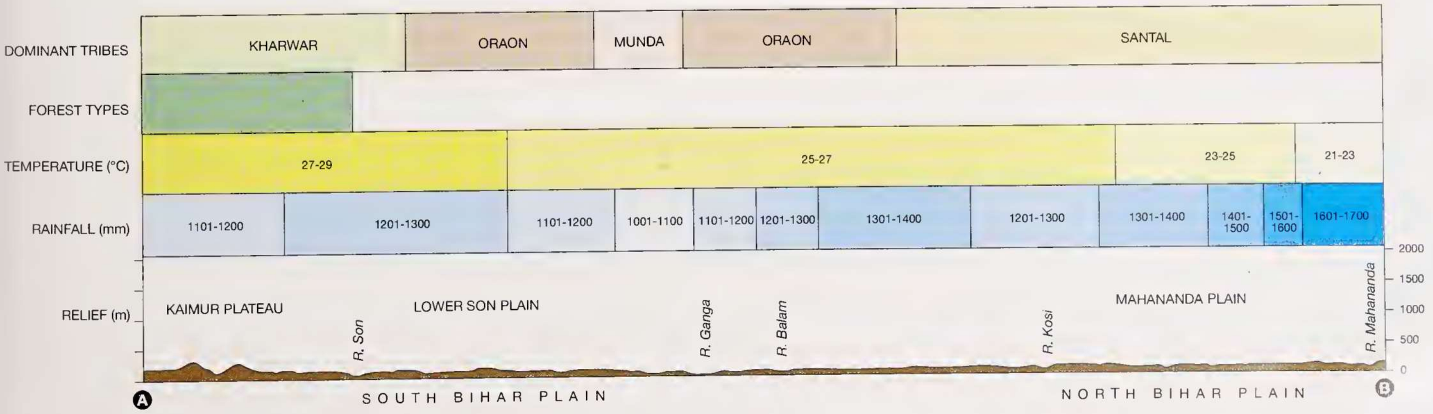

Santal Migration

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা		১ - ১৬
প্রথম অধ্যায়:		
	সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি	১৭ - ৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায়:		
	সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা	৫৪ - ১০৬
তৃতীয় অধ্যায়:		
	বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)	১০৭ - ২৭৪
চতুর্থ অধ্যায়:		
	বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)	২৭৫ - ৩৩৮
উপসংহার		৩৩৯ - ৩৪৭
গ্রন্থপঞ্জি		৩৪৮ - ৩৭৫

ভূমিকা

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে 'পুরাভূমি' বলে একটা ভূখণ্ড উল্লেখ করেছেন। 'পুরাভূমি'র অন্তর্গত 'মালভূমি'র পরিধি বিশাল। একদিকে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম ও ধলভূম, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং মালভূমির অন্য অংশে জঙ্গলমহলের অনুর্বর এলাকা ও রানীগঞ্জ আসানসোল পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা। মেদিনীপুরের শালবনী, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুরের সমস্ত অংশ জুড়ে। এছাড়া ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর নাম উল্লেখিত। এই সমস্ত স্থানের নাম মালভূমি, যার আগের নাম ছিল মানভূম। এই মালভূমি আসলে ছোটোনাগপুরে অবস্থিত এবং এটা খুব পুরনো একটা মালভূমি অর্থাৎ এই ভূখণ্ডের চারিদিকে জঙ্গল এলাকা ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের গ্রাম ছিল। বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আদিবাসীরা বাসস্থান নির্মাণ করে। সেখানেই তাদের জীবনযাপনের পথ চলা শুরু হয়। এদের জীবিকা হলো কৃষিকাজ। তাদের জীবন সম্পর্কে অল্প-বিস্তর এবং কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাপদে' পাওয়া যায়। 'চর্যাপদ' গ্রন্থে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। লুইপাদ, কুক্কুরিপাদ, কম্বলপাদ, শবরিপাদ, কাহ্ন পা- এরা অনেকেই ব্যাধ বা শবর ছিলেন। ফলে তাদের সাহিত্যে তৎকালীন নিম্নশ্রেণির জীবন প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, 'ভবিষ্যৎ পুরাণে'ও জঙ্গলমহল-ঝাড়খণ্ড এলাকার কথা উল্লেখিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'ঝারিখণ্ডে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সমস্ত ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা শালপাতায় খাওয়া-দাওয়া করত, মাটিতে বসে মাটির পাত্রে জল খেত ও খেজুরপাতার চাটাইয়ে ঘুমাত। এসমস্ত জনজাতিকে 'খেলোয়াড় বংশ' বলা হত, পরবর্তীতে এদের অস্ট্রিক বংশের মানুষ বলা হয়। অর্থাৎ সাঁওতাল, শবর, ওঁরাও, খেড়িয়া, ভূমিজ, মুণ্ডা, হো, ভিল প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। এরাই হলো ঝাড়খণ্ডের মূল নিবাসী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য দেখা যায় নিম্নবর্ণের নানা চরিত্র।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্যতম নায়িকা ফুল্লরা হাঁড়িয়া বিক্রি করে সংসার চালায়। আর কালকেতু জীবিকার্জন করে জঙ্গলের পশু-পাখিদের চামড়া সংগ্রহের মাধ্যমে। কালকেতুর জীবনযাপন অনেকটাই অনার্য। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু চরিত্রটিকে অনার্য চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। কালকেতুর জীবনযাপন নিত্যদিনের প্রয়োজন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-আশা সবদিক দিয়ে দেখা যায় কালকেতুর মধ্যে আর্য জাতির বিশেষ কোনো লক্ষণ নেই। গোপীজনবল্লভ দাস রচিত 'রসিক মঙ্গল' (১৬৫৭-৬০) কাব্যে চতুর্দশ লহরীতে ইতিহাসের নানা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম স্থান হলো কাশীপুর, বলরামপুর, গোপিবল্লভপুর ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাঁওতালদের সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া না গেলেও আধুনিক যুগ থেকে সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে প্রভৃতি রচনা পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথ চলা শুরু হয় উনিশ শতক থেকে। এই উনিশ শতকেই দেখা যায় বিভিন্ন রচনায় সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডাদের জীবন ফুটে উঠেছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'পালামৌ'(১৮৮০-১৮৮২) গ্রন্থ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'জঙ্গল' এলাকায় কোল জাতিরা কীভাবে জীবনযাপন করে- সেই সমস্ত চিত্র 'পালামৌ'তে রয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) তাঁর 'শক্তিকানন'(১৮৮৭) উপন্যাসেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জীবন নিয়ে অল্পস্বল্প আলোচনা পাওয়া যায়। অবিনাশচন্দ্র দাসের(১৮৬৭-১৯৩৬) 'পলাশবন' ও 'অরণ্যবাস' উপন্যাসে সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতির দিকগুলি অস্পষ্টভাবে আভাসিত। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫–১৯৩২) 'বিদ্রোহ'(১৮৮২) ও 'মিবাররাজ'(১৮৮৭) উপন্যাসে আদিবাসীদের জীবনচিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। 'বিদ্রোহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস, কারণ এই উপন্যাসে সামাজিক ইতিহাস সংক্ষিপ্তরূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রতিটি রচনাতেই সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি সাঁওতালদের ছন্দময় জীবনের ছবি 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬) ডায়রিতে তুলে ধরেছেন। 'কোপাই' (ভাদ্র, ১৩৩৯), 'খোয়াই'

(শ্রাবণ, ১৩৩৯), ‘বাসা’ (ভাদ্র, ১৩৩৯), ‘ক্যামেলিয়া’ (শ্রাবণ, ১৩৩৯), ‘সাঁওতাল মেয়ে’ (মাঘ, ১৩৪১) প্রভৃতি কবিতায় সাঁওতালদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পবিস্তর আলোকপাত করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আদিবাসী জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬) আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ‘কয়লাকুঠি’, ‘বলিদান’, ‘জননী’, ‘রিপোর্ট’, ‘মরণ’, ‘ঝুমুর’ প্রভৃতি ছোটগল্পে সাঁওতাল শ্রমিকদের সংগ্রামী জীবন নিয়ে গল্প নির্মাণ করেছেন। কয়লাকুঠির শোষিত দিনমজুর শ্রমিক নিয়েই তাঁর গল্পের উপাদান। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নতুন ধরনের রচনা তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই শুরু হয়েছে। তাঁরা গ্রামকেন্দ্রিক আচার-আচরণ এবং আঞ্চলিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর ‘পাষাণপুরী’(১৯৩৩), ‘প্রেম ও প্রয়োজন’(১৯৩৫), ‘কালিন্দী’(১৯৬৪০) প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে সাঁওতাল জীবনের খণ্ড চিত্র অঙ্কিত। সাঁওতাল জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর বিখ্যাত ও সার্থক রচনা ‘কালিন্দী’ উপন্যাস। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ঔপন্যাসিক ও বিশিষ্ট শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০), তাঁর গল্প-উপন্যাসের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে অরণ্যে অবস্থিত আদিবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে। সাঁওতালদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলিক চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন ‘অভিযাত্রিক’(১৯৪১), ‘স্মৃতির রেখা’(১৯৪১), ‘তৃণাঙ্কুর’(১৯৪৩), ‘ঊর্মিমুখর’(১৯৪৪), ‘বনে-পাহাড়ে’(১৯৪৫), ‘হে অরণ্য কথা কও’(১৯৪৮) প্রভৃতি ডায়েরির পাতায়। তাঁর বিখ্যাত ‘আরণ্যক’(১৯৩৯) উপন্যাসে অরণ্য ঘেরা মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬) ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৫) উপন্যাস দিয়েই বাংলা আঞ্চলিক

উপন্যাসের পথ চলা শুরু হয়। ঔপন্যাসিক সাঁওতাল জনজাতি নিয়ে বিশেষ কিছু রচনা করেননি। তবে তিনি 'দর্পণ' (১৯৪৫) উপন্যাসে আদিবাসী জীবন, ব্রাত্য জীবন, মেহনতী মানুষের জীবন ও শোষিত নিপীড়িত কৃষক জীবনের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন।

এতক্ষণ ধরে ভূমিকায় যে বিষয় আলোচনা করেছি, তা হলো স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে সাঁওতাল জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এখান থেকেই আমাদের ধারণা তৈরি হয় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন কীভাবে উঠে এসেছে। এবং এধরনের রচনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গবেষণাও রয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস নিয়েও গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। যা আমাদের এই গবেষণায় গবেষণার পূর্বসমীক্ষা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। রণজিৎকুমার সমাদ্দারের 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ সমকালীন সমাজ ও সাহিত্য'(২০১২) গ্রন্থ 'প্রতিভাস' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে উঠে আসা সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ২০১০ সালে 'পুস্তক বিপণি' থেকে সুবোধ দেবসেনের 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের উল্লেখও পাওয়া যায়। ২০১২ সালে 'পুস্তক বিপণি' থেকে ঋষিপ্রতিম ঘোষের 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির জীবনচিত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন ড. রমেশ সরেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতি'। উক্ত শিরোনামে তিনি যে ভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছেন, তা এরকম- প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ- সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- ভারতীয় সমাজ সভ্যতায় সাঁওতাল শ্রেণির অবস্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়- ভারতীয় সাহিত্যে সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি। তৃতীয় অধ্যায়- বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়- বাংলা গল্পের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়। ২০১৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন ড. শান্তি সরেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র'(১৯২২-১৯৮২)। উক্ত শিরোনামে তিনি যে ভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছেন, তা এরকম- প্রথম অধ্যায়- সাঁওতাল সমাজ পরিচিতি, দ্বিতীয় অধ্যায়- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর গল্পে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, তৃতীয় অধ্যায়- তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, চতুর্থ অধ্যায়- স্বাধীনতা উত্তরকালের নির্বাচিত কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, পঞ্চম অধ্যায়- মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র। উপরিউক্ত অভিসন্দর্ভ ও গবেষণামূলক গ্রন্থগুলিতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত গল্প-উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিকও উঠে এসেছে। তবুও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন নিয়ে ভারসাম্যযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অনুপস্থিত। যা এই গবেষণার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে সাঁওতাল জীবনের গতিপ্রকৃতি বোঝা যায়। ১৮৭০ সালে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য 'Government of India' 'উপজাতি স্বতন্ত্রকরণ আইন' পাশ করে। তা 'land Tranfer Act' নামে ১৯৭১ সালে কার্যকর হয়। আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদেরই থাকবে। অন্য কোনো জাতি কিনতে পারবে না। যা স্বাধীনতা পরে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য ভূমিসংস্কার আইন, অপারেশন বর্গাদার আইন, সংরক্ষণ আইন পাশ করা হয়। শিক্ষার আইন, অরণ্য সংরক্ষণের আইন, কৃষি আইন এবং আদিবাসী শিল্প ও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য

সরকারের পক্ষ থেকে নানা পরিকল্পনা করা হয়। যেখানে আদিবাসীরা সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি থেকে অনেক পিছিয়ে, সেখানে সরকারের পক্ষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদেরকে জীবনের মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করা হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা গল্প-উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, রচনাশৈলীর ঐতিহ্য ও সৃষ্টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ স্বাধীনতা পরবর্তীতে যে ইতিহাস ও বাস্তব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারই বাস্তবচিত্র যখন গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে, তখন লেখকদের প্রকাশভঙ্গি ও আখ্যানের কাঠামো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তাই এই গবেষণার শিরোনাম- 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন।' এই শিরোনামেই উল্লেখিত সময়কাল, অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত গল্প-উপন্যাসগুলিই আলোচ্য গবেষণায় আকরগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রকাশকালের সীমাবদ্ধতা থাকলেও গল্প-উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সময়কাল ও ঘটনাকালের সীমাবদ্ধতা ধরা হয়নি। বিষয় হিসাবে বিশেষ জনজাতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলত এই গবেষণায় সাঁওতাল জীবনকে অনুসন্ধান করাই মূল উদ্দেশ্য। সাঁওতাল জীবনকে অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য আদিবাসী মানুষের জীবনচিত্রও উঠে এসেছে এই অভিসন্দর্ভে। এবং আদিবাসীদের সঙ্গে অ-আদিবাসীদের আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছে সেইগুলিও আমাদের আলোচ্য বিষয়। গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনকে লেখকরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন? তা যুক্তিসহকারে দেখানোই এই গবেষণার অভিপ্রায়। লেখকদের লেখনীতে সময়ের সঙ্গে আখ্যানের বিবর্তন কতখানি ফুটে উঠেছে- তা বিশ্লেষণ করাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে উঠে আসা সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর সাঁওতাল জীবনের স্বরূপ, বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা যেমন

থাকবে, তেমনি গল্প-উপন্যাসের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র, উপস্থাপনভঙ্গি ও গঠনগত কাঠামোও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে।

'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন' শিরোনামে গবেষণার পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে–

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

আমাদের এই গবেষণায় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই 'স্বাধীনতা-উত্তর' কথাটি সংযোজিত। 'স্বাধীনতা-উত্তর' কথাটি গবেষণার শিরোনামে উল্লেখিত বলে অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হয়নি। উপরিউক্ত অধ্যায় পরিকল্পনা ক্রমান্বয়ে ও সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার প্রথম অধ্যায় 'সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনার আগে আমরা আলোচনা করব যে আদিবাসীরা কীভাবে কোথা থেকে ভারতে আসে। সাঁওতাল জাতি যে সময়ে ভারতে প্রবেশ করে তার আগে পরে কোন্ জাতি ভারতে প্রবেশ করে? ইতিহাস, নৃতত্ত্ববিদ্যা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হয় যে ভারতের মাটিতে প্রথম প্রবেশ করেছিল আদিবাসী। এই আদিবাসী আসলে কারা? তাদের জীবন ধারণের বৈশিষ্ট্য কীরকম? বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে আদিবাসী বলা হয়? এই ভাগগুলো কোন সময় থেকে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে? সেই সম্পর্কে এই অধ্যায়ে

সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে বহু আদিবাসী রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাঁওতাল জনজাতি। সাঁওতালরা মূলত বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল ও বাংলাদেশ। বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কম-বেশি সমান। সাঁওতালদের রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং নিত্যদিনের জীবনযাপনের ধরন প্রায় একই। শুধুমাত্র স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন। স্থান ও কালের নিয়মে সাঁওতাল জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির তারতম্য দেখা যায়। সেই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিও বিশেষভাবে পরিবর্তনীয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে অবস্থিত সাঁওতালদের ভিন্ন সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতির নিয়মকানুনও লক্ষ করা যায়। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবে সার্বিকভাবে সাঁওতাল জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষাগত দিক থেকে সাঁওতালদের অবস্থা কীরকম? সরকার থেকে আদিবাসীরা সুযোগ সুবিধা কতটা পেয়েছে? সর্বোপরি সাঁওতালদের পরিচয় ও তাদের জীবন অনুসন্ধান করাই এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাখা হয়েছে ‘সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা।’ এই অধ্যায় কেন রাখা হয়েছে? কি কি যুক্তি দিয়ে এই অধ্যায় তৈরি হয়েছে? এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় সাঁওতাল জাতির মাইগ্রেশন। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট স্থানে সাঁওতালদের বসতি ছিল একটা সময়ে। কিন্তু সেই সময়ে ওই স্থানে সাঁওতালদের আর্থিক সমস্যা বিশালাকার ধারণ করে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তারা নতুন স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং জীবন জীবিকায় তাদের পরিবর্তন আসে। নতুন ভৌগোলিক স্থানে তাদের সামাজিক পরিকাঠামো ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এধরনের মাইগ্রেটেড

সাঁওতালদের জীবন নিয়ে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। আবার যে সমস্ত সাঁওতালরা তাদের আদি বসতি থেকে ছেড়ে কোথাও যায়নি। তাদের জীবন নিয়েও বিভিন্ন আখ্যান পাওয়া যায়। অর্থাৎ সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার ছবি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত প্রেক্ষাপট ও পটভূমি জানা খুবই প্রয়োজন। শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট ও পটভূমি নয়, প্রেক্ষাপট ও পটভূমির সময়কালও গুরুত্বসহকারে বোঝা দরকার। দেশকাল ও ঘটনাকালের সঙ্গে লেখকের জীবন দর্শনের মিশ্রণে গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতেই গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। এর কারণ হলো সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার ইতিহাস, অর্থাৎ সাঁওতালরা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গল্প-উপন্যাসে উঠে আসা সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার ভৌগোলিক পটভূমি কত বৈচিত্র্যময়, তা এক নজরে সংক্ষেপে দেওয়া হলো-

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালচিতি’(১৯৪৮) ও ‘শিকারী’(১৯৪৯) গল্পদুটি জামশেদপুর এলাকার পাহাড়ি অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমল মাঝির গল্প’(১৯৫৬) ও ‘একটি প্রেমের গল্প’(১৯৬৪) গল্পদুটির পটভূমি বীরভূমের লালমাটি। তাঁর ‘সপ্তপদী’(১৯৫৮) উপন্যাস বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। ‘অরণ্য-বহ্নি’(১৯৬৬) উপন্যাসে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহে’র পটভূমিকায় অবস্থিত উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে, তিনপাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে, বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর ও গোটা সাঁওতাল পরগণা ও দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।
- কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ উপন্যাস ও ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ গল্পের পটভূমি হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, রাজগীর, মধুপুর প্রভৃতি স্থান।

- শ্রী কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য-কুহেলী’১৯৪৯) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কুলাডাঙ্গার হাট, রামপুর মৌজা, ঘুসরুকাটা গ্রাম, হলদিগড় গ্রাম, হলদিগড় পাহাড়, তরুণী পাহাড়, কোলিয়ারির খাদান, কাজোড়ার কয়লা কুঠি, চরণপুরের খাদান, পাথরডির খাদান প্রভৃতি প্রান্তিক অঞ্চল।
- রমাপদ চৌধুরীর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’(১৯৫২), ‘রেবেকা সোরেনের কবর’(১৯৫৩), ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ ও ‘নারীরত্ন’(১৯৫৫) গল্পগুলির প্রেক্ষাপট কোলিয়ারি অঞ্চলের একরামপুর থানা, ময়নাগড়, বরকাডিহি, সোনাডি ও সোনাতুলসীর মতো প্রভৃতি গ্রাম।
- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চতপা’(১৯৫৮) উপন্যাসের পটভূমি নদীনালা ও ড্যামকেন্দ্রিক।
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’(১৯৬৮) উপন্যাসের পটভূমি নির্মিত হয়েছে ছোটনাগপুরের ‘পালামৌ’ অঞ্চলের ধলভূমগড় স্টেশন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।
- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘তৃণভূমি’(১৯৭০) উপন্যাসের পটভূমি হলো উর্বর মাটির পাশে নদীর অববাহিকা অঞ্চল।
- আব্দুল জব্বারের ‘মাতালের হাট’(১৯৭২) উপন্যাসের পটভূমি হলো সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, ডুলং, তারাফেনী, শঙ্খ, কোয়েল, দামোদর, জহরশর্ণা প্রভৃতি নদনদীর উপকূল অঞ্চল।
- মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু’(১৯৭৭), ‘দ্রৌপদী’(১৯৭৭) ও ‘অক্লান্ত কৌরব’(১৯৮০) ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি জাগুলা, বাকুলি, চরসা জঙ্গল, পলতাকুড়ি, কদমখুঞা, পিয়াসোল- প্রভৃতি গ্রাম।
- অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’(১৯৮৫) উপন্যাসের পটভূমি হলো ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও বাংলাদেশ।

- মানব চক্রবর্তীর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন'(১৯৯৪) উপন্যাসের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিহার রাজ্যের রাঁচি-ভাগলপুর অঞ্চলের মিহিজাম স্টেশনের আশেপাশের স্থান জামতাড়া, মধুপুর, ক্যাওটাজালি প্রভৃতি গ্রাম।
- তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ'(১৯৯৫) ও 'দ্বৈরথ'(২০১৪) উপন্যাসের পটভূমি হলো মেদিনীপুর জেলা ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের কিছু অঞ্চল।
- ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু'(১৯৯৫) উপন্যাস রাঢ়ভূমির পটভূমিকায় রচিত।
- নলিনী বেরার গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টিভূমি হলো সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল।
- সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যচর্চার ভুবন পুরুলিয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত।

এই ধরনের নানা স্থানের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট যখন গল্প-উপন্যাসে স্থান পায়, তখন সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার ছবি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে।

আমাদের এই গবেষণায় তৃতীয় অধ্যায় হিসাবে রাখা হয়েছে 'বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)।' বলা যেতে পারে এই গবেষণার প্রধান ও অন্যতম অধ্যায়। আসলে জীবনকে সঠিকভাবে আলোচনা করতে গেলে আধুনিক উপন্যাসের জুড়ি মেলা ভার। মূলত সাঁওতাল জীবন সম্পর্কে গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্য যে সময় থেকে পাওয়া যায়, তা হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সাঁওতালরা জোতদার জমিদার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই-বিদ্রোহ করেছে। সাঁওতাল সংগ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই জানা যায়, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাবা তিলকা মাঝি, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব প্রমুখ বীর সন্তান লড়াই করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনেও সাঁওতাল জাতির ভূমিকা অস্বীকার করা অনুচিত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও কৃষক, খাদ্য ও নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সাঁওতালরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনেও সাঁওতাল জাতির সংগ্রাম নতুনরূপ ধারণ করেছে। সাঁওতালদের রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস বাংলা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

লেখকরা সাঁওতাল জীবনের সংগ্রাম, লড়াই ও রাজনীতি কতটা তুলে ধরতে পেরেছেন এবং গল্প-উপন্যাসগুলি কথাসাহিত্য হিসাবে কতটা মর্যাদা ও সার্থকতা লাভ করেছে, তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। কারণ একই সঙ্গে লেখকরা স্বাধীনতা উত্তরকালে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের ঘটনাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন আবার সমকালীন রাজনৈতিক দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। কাহিনি, ঘটনা, পরিবেশ, ভাষা, সময় ও চরিত্র অনুসারে ঔপন্যাসিকরা সাঁওতালদের লড়াই, আন্দোলন ও রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন। সাঁওতালদের প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে ঔপন্যাসিকরা নিজেদের জীবনদর্শন ও রাজনীতির তাত্ত্বিকরূপ আখ্যানের বয়ানে নির্মাণ করেছেন।

সাঁওতাল সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বলতে হয় যে, সাঁওতাল জীবন গোষ্ঠীভিত্তিক। সাঁওতালদের বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবিকা নির্বাহ, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কার, কুসংস্কার, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ, চারুকলা-কারুকলা, ভাষা ব্যবহার, লোককথা, গান, নৃত্য ও মনস্তত্ত্ব– সামগ্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকরা কীভাবে বাংলা উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন– তা আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত উপন্যাসগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেই উপন্যাসের প্রকাশকাল অনুসারে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এতে করে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের দিকগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূলে কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য-কুহেলী’(১৯৪৯), সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’(১৯৫৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সপ্তপদী’(১৯৫৮), ‘অরণ্য-বহ্নি’(১৯৬৬), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চতপা’(১৯৫৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’(১৯৬৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘তৃণভূমি’(১৯৭০), আব্দুল জব্বারের ‘মাতালের হাট’(১৯৭২), মহাশ্বেতা দেবীর ‘অক্লান্ত কৌরব’(১৯৮০), ‘সিধু কানুর ডাকে’(১৯৮১), ‘শালগিরার ডাকে’(১৯৮২), অভিজিৎ সেনের ‘রহু

চণ্ডালের হাড়'(১৯৮৫), মানব চক্রবর্তীর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন'(১৯৯৪), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ'(১৯৯৫) ও 'দ্বৈরথ'(২০১৪), ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু'(১৯৯৫), নলিনী বেরার 'শাল মহুলের প্রেম' ও 'দুই ভুবন'- উপন্যাসগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে 'বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)।' আমরা জানি যে ছোটগল্পের পরিসর খুবই কম থাকে, এখানে বৃহৎ বিষয় ও কাহিনিকে উপস্থাপন করা হয় না। ছোটগল্পে জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বিশেষ কোনো একটা ঘটনা কিংবা একটা দিককে তুলে ধরা ছোটগল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। অল্প পরিসরে সাঁওতাল সমাজের বৈচিত্র্যময় দিক উঠে এসেছে গল্পের ভুবনে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা গল্পকাররা সাঁওতাল জীবনকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছোটগল্পের উপাদান নির্মাণ করেছেন। বাংলা গল্পকাররা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জঙ্গলে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর ছন্নছাড়া জীবনকে গবেষণা করেছেন। এমন কি তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দেওয়া। একটি সুসংহত রাষ্ট্রের আড়ালে সাঁওতাল জীবনকে ধারাবাহিকভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা শিল্পসত্তাতে অনুসন্ধান করেছেন। যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সর্বোপরি সাহিত্যিক গুণ ও গুরুত্ব রয়েছে। সাঁওতাল জীবনের নানা ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাঙালি গল্পকার আখ্যানের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে মূল কাহিনি হিসেবে প্রেমের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে, সেখানে ছোটগল্পে নর-নারী প্রেমের প্রবৃত্তি ও জটিলতা উপস্থাপিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে সাঁওতাল নর-নারী সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মিশনারি ইংরেজদের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক কী রকমের ছিল? সেই জটিল সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ গল্প আলোকপাত করা হয়েছে। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমল মাঝির গল্প’ কিংবা ‘একটি প্রেমের গল্প’ গল্পদুটিতে সাঁওতাল সমাজের অভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল জাতি আধুনিক শিক্ষায় কতটা শিক্ষিত হয়ে উঠছে, সাঁওতাল গ্রামগুলিতে শিক্ষার আলো কতখানি প্রবেশ করছে, তা বুঝবার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালচিতি’ গল্প। সাঁওতালদের জীবন যে অন্যের শাসনে পরিচালিত হয় তার নির্দশন পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের ‘শিকারী’ গল্পে। আবার ভিন্ন জাতির কাছ থেকে সাঁওতালরা সৎ পরামর্শ পেতে পারে তার উদাহরণ পাওয়া যায় কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’(১৩৫৯) গল্পে। তাঁর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে মানুষের লোভ-লালসার চিত্র কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে, তা গল্প বলার কৌশল ও চরিত্র নির্মাণ থেকে বোঝা যায়। রমাপদ চৌধুরী বাস্তব ও মিথের পরম্পরাকে কীভাবে রক্ষা করেছেন? তা তাঁর ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্পে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর ‘নারীরত্ন’ গল্প এধারার ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। গল্পে নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিল দিকগুলি ধরা পড়েছে।

সত্তর দশকের ব্যতিক্রমী লেখিকা হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত চারটি বিশেষ গল্পের নাম হলো ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘দ্রৌপদী’, ‘জল’ এবং ‘এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ’। এই গল্পগুলিতে লেখিকা সত্তর দশকের নকশাল বাড়ি আন্দোলনের ঘটনাকে রাজনৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। সত্তর দশকের আর এক কথাসাহিত্যিক হলেন নলিনী বেরা, তাঁর ‘ঝাঁটার কাঠি’ ‘খোরপোষ’ ‘ঘবা, তিহা-র গল্প’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে সাঁওতালদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ও সামাজিক মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণের দিকগুলি বেশি করে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যিক নলিনীর বেরার গল্প

আলোচনা করতে গেলেই সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের প্রসঙ্গ চলে আসে। আসলে এঁরা একই সময়ের লেখক। সৈকত রক্ষিতের ‘ছল’, ‘যশোমণি মুর্মু’, ‘রাঙামাটি’, মাড়াই কল’ গল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা, বেদনা, কষ্টের অনুভব পরিব্যপ্ত হয়েছে।

সবার শেষে শেষকথা বা উপসংহারে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে অধ্যায়গুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজানো এবং সেই বিষয়ে তথ্য ও তাত্ত্বিক দিকগুলি যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করা। গবেষণামূলক যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ উত্তর আমরা পেয়েছি এমন কথা বলা যায় না। তবে বেশ কিছু নতুন দিক এই গবেষণায় উঠে এসেছে, আমাদের এই গবেষণায় সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণে জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি

সাঁওতাল জনজাতি আসলে মূল জনসমাজেরই অংশ। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পিছিয়ে রয়েছে। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এদের সমাজে পড়েনি। তারা পাহাড়-পর্বত বনে-জঙ্গলে বসবাস করে। সভ্য মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না। এই ধরনের ধারণা আমাদের জনসমাজে প্রচলিত আছে। আসলে এর মূলে রয়েছে আদিবাসী সমাজের জাতিসত্তা। আদিবাসী মানুষ সব থেকে বেশি বসবাস করে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতে সব থেকে বেশি আদিবাসী বসবাস করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেনসাস রিপোর্টে-

> The tribal population of the country, as per 2011 census, is 10.43 crore, constituting 8.6% of the total population. 89.97% of them live in rural areas and 10.03% in urban areas. The decadal population growth of the tribal's from Census 2001 to 2011 has been 23.66% against the 17.69% of the entire population.[১]

ভারতের কোন কোন প্রান্তে আদিবাসীরা বসবাস করে- সেই সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে নানা মত পাওয়া যায়।[২] বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ড. বিরজাশঙ্কর গুহ-এর মতে ভারতের আদিবাসী নানা অঞ্চলে বিভক্ত-

(ক) উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারত,

(খ) মধ্যভারত,

(গ) উপদ্বীপীয় ভারত,

(ঘ) উঃ অক্ষাংশের নীচের অঞ্চল।

অধ্যাপক ডি.এন. মজুমদার এবং টি.এন. মদন-এর উল্লিখিত অঞ্চলগুলি হলো-

(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল,

(খ) কেন্দ্রীয় ও মধ্যাঞ্চল,

(গ) দক্ষিণাঞ্চল।

ড. এস. সি দুবে আদিবাসীদের ভৌগোলিক বিস্তারকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করেন-

(ক) উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারত,

(খ) মধ্যভারত,

(গ) দক্ষিণ ভারত এবং

(ঘ) পশ্চিম ভারত।

আবার অধ্যাপক বি. কে. রায় বর্মন ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন-

(ক) উত্তরপূর্ব ভারত- আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা।

(খ) নিম্ন হিমালয় অঞ্চল(Sub-Himalayan region)- উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ।

(গ) মধ্য ও পূর্ব ভারত- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ।

(ঘ) দক্ষিণ ভারত- তামিলনাড়ু, কেরালা এবং কর্নাটক।

(ঙ) পশ্চিম ভারত- রাজস্থান, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র।

অর্থাৎ ভারতের নানা প্রান্তে বসবাস করে আদিবাসী মানুষ। এদের মূলনিবাস বন-জঙ্গল, পাহাড়ি অঞ্চলে। তার কারণ আর্যদের সঙ্গে অনার্যরা যুদ্ধে পরাজিত হয়। ফলে তারা পরাজিত হয়ে পাহাড়, জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল, - ‘অবশ্য তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, তা না হলে তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন জাতিতেই পরিণত হত।’[৩] হিন্দু সমাজের নানা শাস্ত্র গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘শাস্ত্রকার মনুর নির্দেশ ছিল ‘পৃথিবীতে মাত্র চারিটি বর্ণ আছে। পঞ্চম নাই- বর্ণ নাস্তি তু পঞ্চমঃ। তিনি আরও বলেছিলেন ঐ চতুর্থ বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য- ইহাঁরা দ্বি-জাতি অর্থাৎ দ্বি-জ এবং শূদ্র এক জাতি। বর্ণের প্রকৃত অর্থ রঙ। গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাজনের যাবতীয় তত্বকথা প্রচারিত হউক না কেন, ভারতের পক্ষে এটা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে জাতিভেদের একমাত্র নির্ণায়ক জন্ম। তাই বৈদিক যুগ থেকে ‘দাস’, ‘দস্যু’, ‘চণ্ডাল’, ‘রাক্ষস’, ‘বানর’, ‘নিষাদ’, ‘কিরাত’, ‘শবর’, ‘কোল’, ‘ভীল’, ‘বুনো’, ‘কুলী’ নামে ভূষিত একদল মানবগোষ্ঠী ভারতীয় তথাকথিত সংস্কৃত জনমানসে এবং তাঁদের সৃষ্টি সাহিত্যে মর্যাদাবান হয়ে ওঠেনি।’[৪] আধুনিক সভ্য সমাজ তাদেরকে নিচু চোখেই

দেখেছে। ‘যেসব অঞ্চলের স্বাধীনচেতা পাইক বা রাইত চাষীরা ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে তাঁদেরকেই চিহ্নিত করেছিলেন ‘বর্বর’, জংলী’, ‘চুয়ার’, ইত্যাদি হীন সম্বোধনে, এগুলোর ইংরেজী প্রতিশব্দ যথাক্রমে ‘বারবারিয়ান’, স্যাভেজ’, ‘ফিল্ড র‍্যাট’।’[৫] শিক্ষিত মানুষরা নিম্নশ্রেণির মানুষদের ‘আবওরিজিন্যাল’ ও ‘নেটিভ’ হিসাবে দেখত। ‘নেটিভ’ শব্দটি প্রচলন করেছিল ইংরেজরা। কিছু ইংরেজ ‘নেটিভ’ শব্দটি ‘মিত্র’ হিসাবেও ব্যবহার করেছে। তাই ‘নেটিভ’ শব্দটি ‘নেটিভবাবু’ অর্থে রূপান্তরিত হয়। আর উনিশ শতকে বাবু সমাজ সৃষ্ট ‘কলমচি বাবুসমাজ’ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণি ও অ-শিক্ষিত সমাজ পরিণত হয় ‘বন্য’, ‘অসভ্য ‘আদিমজাতি’ হিসাবে। ‘অসভ্য’, ‘জংলি’, ‘বুনো’, ‘আদিম’, ‘কুলি’- মানুষকে অনেকেই ‘ছোটজাত’ বা ‘ছিটলোক’ হিসাবে বলে থাকে। ‘নেটিভ’ শব্দটি ‘ছোটলোক’ শব্দের সঙ্গে মিশে যায়।[৬] আদিবাসীদের নিচুজাতি হিসেবে দেখানো হয়। বাংলা ভাষী মানুষরা উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ‘বুনো’ জাতি মনে করত। কিন্তু আদিবাসী শব্দটির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য ‘Tribe’ শব্দ, যার উৎপত্তি ল্যাটিন ‘tribus’ শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো একই বংশধারার ধারাবাহিকতা নিয়ে বসবাসকারী একটি গোষ্ঠী। এক সময় রোমানরা খুবই আনন্দের সঙ্গে প্রয়োগ করতেন নিজেদের গর্বিত পরিচয়ের সুবাদে।’[৭] পরে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি উন্নত জাতি-সত্তার মানুষেরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং উওর ও দক্ষিণ আমেরিকার এবং অস্ট্রেলিয়া দখল করে বসলেন তখন থেকেই ‘অ্যাবোরিজিন্যাস’, ‘ট্রাইব’, ‘ওয়াইল্ড’, হিলম্যান’, ‘স্যাভেজ’, ‘প্রিমিটিভ’ ইত্যাদি শব্দ ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে প্রচার করা হয়।[৮] প্রাচীনকালে রোমানরা প্রযুক্তিগতভাবে অনুন্নত একদল অনগ্রসর জাতিকে ‘tribus’ বলত। আবার ভারতের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আদিবাসী শব্দের মধ্যে ‘আদি’ ব্যাপারটা আছে, অর্থাৎ ভারতের ‘আদিম বাসিন্দা’। যারা ভারতে প্রথম এসেছিল, তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে-

> আদিবাসীরা প্রাচীন হলেও তাদের এই 'আদিবাসী' নামটা মোটেই প্রাচীন নয়। যতদূর জানা যায়, ঠক্কর বাপা এই প্রথম নামটা তৈরী করেন। ইংরেজী 'ট্রাইব' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে এটা ব্যবহার হচ্ছে। অনেকে আবার 'উপজাতি' 'খন্ডজাতি' বা জনজাতি' কথাও ব্যবহার করেন।[৯]

বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন' গ্রন্থে 'আদিম' ও 'পার্বত্য' জাতি হিসেবে আদিবাসীদের চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' গ্রন্থে 'অরণ্যবাসী' শব্দ প্রয়োগ করেন, আবার শরৎচন্দ্র রায় তাঁর 'মানভূম জেলার পুরাকীর্তি ও কয়েকটি আদিম অধিবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে 'আদিম' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকে বুদ্ধিজীবীরাও 'আদিবাসী' শব্দটি গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে সংবাদ-পত্র-পত্রিকাতে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যাপক ভাবে প্রচার হয়। আর এ. কে. নাজমুল করিম সম্পাদিত 'সমাজবিজ্ঞান পরিভাষাকোষ' গ্রন্থে ইংরাজি 'ট্রাইব'কে 'গোষ্ঠী' বা 'উপজাতি' রূপে ধরা হয়।[১০] সি.পি.এম সরকার 'উপজাতি' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে 'উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' খোলা হয়েছিল। কিন্তু এই উপজাতি শব্দের প্রতি অনেকের অভিযোগ ছিল যে, শব্দের মধ্যে যে 'উপ' ব্যাপারটা আছে, তাতে নাকি নিচু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সভ্য সমাজ থেকে তারা বহু দূরে, তারা অনুন্নত। 'উপ' শব্দ থেকে বোঝা যায় যে তাদেরকে ছোটো করা হয়। কিন্তু আদিবাসীদের ছোটো করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে, প্রকৃতপক্ষে তারাইতো ভারতের মূল সমাজ। শুধু যে 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহার করা হয়, এমনটা কিন্তু নয়, সেই সঙ্গে 'খণ্ড জাতি' শব্দও প্রচার করা হয়। এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রাজনীতি হয়েছে।[১১] সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের নানা সময়ে নানা নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। '১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার তথ্যে পেশাভিত্তিক যে জাতিবিন্যাস করা হয়, তাতে চাষবাস ও পশুপালন জাতির একটি 'জঙ্গলের আদিবাসী বা 'বনবাসী'(forest tribes) বিভাগীকরণ করা হয়।...

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার তথ্যে এই বিভাগ 'অ্যানিমিস্টস'(animists) হিসাবে দেখানো হয়। ...১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের তথ্যে tribal animists or people following tribal religion হিসাবে পরিচিতি পায়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় এই জনগোষ্ঠীকে 'পাহাড়ি ও জঙ্গলের আদিবাসী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ... ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় 'আদিম জনজাতি'(primitive tribe) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ...১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত সরকারের অ্যাক্ট অনুসারে এই জনসমষ্টিকে 'পশ্চাৎপদ জনজাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। ...১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে এইসব পশ্চাৎপট জনজাতি 'tribes' বা 'আদিবাসী' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।'[১২]

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিকের ভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিকড়। তারা কোথা থেকে এসেছে? কোন সময়কালে এসেছে এবং কীভাবে এসেছে?- এই সমস্ত নানা প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এছাড়া আমাদের সামনে উপস্থিত হয় আর্য-অনার্য তর্ক-বিতর্কও। মূলত আর্যজাতি কবে ভারতে প্রবেশ করেছে- তার সঠিক সময়কাল এখনও পাওয়া যায়নি, যা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ করা যায়। কেউ বলে থাকেন খ্রিঃপূর্ব তিন হাজার বছর আগে, আবার কেউ কেউ বলেছেন খ্রিঃপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে, অনেকেই আবার খ্রিঃপূর্ব পনেরশো বছর পূর্বে আর্যজাতির আগমনের কথা বলেন। তবে আর্য জাতি ভারতে প্রবেশ করার বহু বছর আগে অনার্য জাতি ভারতে এসেছিল। অনার্য জাতির সময়কাল ও স্থানকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। কারও মতে খ্রিঃপূর্ব দশ হাজার বছর আগে, আবার কারও মতে খ্রিঃপূর্ব সাত হাজার বছর আগে কিংবা খ্রিঃপূর্ব চার হাজার বছর। বস্তুত এই অনার্য জাতিকে শারীরিক প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নৃতত্ত্ব হিসাবে এই ভাগগুলি হলো-

১. নিগ্রোবটু (Negrito) - দক্ষিণ ভারতের কাদার, ইরুলা ছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারোয়া, ওঙ্গে, সেন্টিনেলিস এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত;

২. প্রোটো-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) - ভারতের বেশিরভাগ আদিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বীরহড়, লোধা, ভিল, কোল, শবর, চেঞ্চু, কুরুম্বা প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত;

৩. মঙ্গোলীয় ((Mongoloid) - লেপচা, টোটো, ডুকপা, রাভা, চাকমা ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই শ্রেণিভুক্ত।[১৩]

পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশ পালেস্তান থেকে নিগ্রোবটুদের পরেই আর একটি জাতি ভারতে প্রবেশ করে, যাদের নাম দেওয়া হয় 'Proto-Australoid' বা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়ড'। প্রাথমিকভাবে এরা আদিম জনগোষ্ঠী, অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর মতোই এদের চেহারা। এই জাতির মানুষ দেখতে হয় কৃষ্ণ বর্ণ, চেপটা-নাক এবং দীর্ঘ-কপাল। এই ধরনের মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে, একেবারেই নিম্নশ্রেণি মানুষদের মধ্যে এই রকম চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে দাক্ষিণিকার বলা হয়। এই দক্ষিণ দেশীয় বা দাক্ষিণ নাম থেকেই পরবর্তীতে অস্ট্রিক (Austric) ভাষা গোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত হয়। ল্যাটিন 'Austric' শব্দ দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মনে করা হয় এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে বিকাশ লাভ করে। এই গোষ্ঠীর মানুষ মেসোপটেমিয়া হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে এদের সমাজ ও সংস্কৃতিই আদিম সভ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বীরহড়, লোধা, ভিল, কোল, শবর, চেঞ্চু, কুরুম্বা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী প্রোটো-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিকের পাশাপাশি আদিবাসীদের ভাষাগত দিকও বোঝা খুবই প্রয়োজনীয়। ভাষার ইতিহাসে আদিবাসী মানুষের রূপরেখা পাওয়া যায়। পৃথিবীর মূল ভাষা বংশগুলির মধ্যে চারটি ভাষা বংশ থেকে যা আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষা বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে এবং সেগুলি হলো-

১) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)

২) অস্ট্রিক (Austric)

৩) দ্রাবিড়(Dravidian)

৪) ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan)।[১৪]

ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর যে সব বংশের ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে সেগুলিই হলো ভারতের অনার্য ভাষা। এই চার ভাষা বংশের মধ্যে সব থেকে প্রাচীন ভাষা বংশ হলো অস্ট্রিক। নিম্নে অস্ট্রিক ভাষা বংশের তালিকা উল্লেখ করা হলো[১৫]–

অস্ট্রিক বংশ

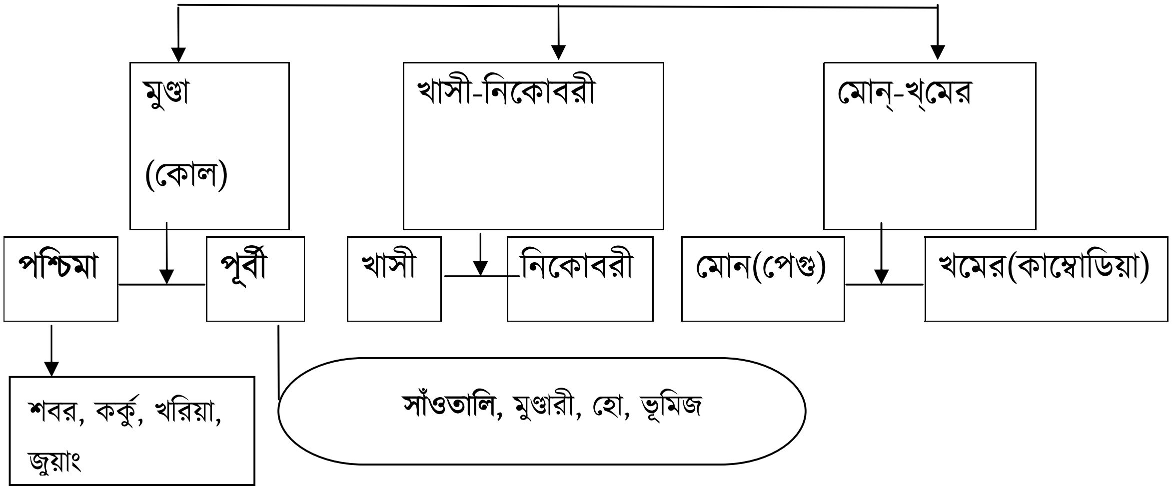

ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ভাষাগত দিক থেকে জানা যায় পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রত্ন-অস্ট্রালয়েড্ জাতির যে শাখা ভারতে এসেছিল তারাই এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে গিয়ে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি হয়। অস্ট্রিক জাতি বা অনার্য জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি হলো সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এরা দেখতে কেমন হয়? এই সম্পর্কে বহু নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষক হলেন এইচ. এইচ রিস্লে। তিনি দেখিয়েছেন যে-

> In point of physical characteristics the Santal may be regarded as typical examples of the pure Dravidian stock. Their complexion varies from very dark brown to a peculiar, almost charcoal like,

black; the proportions of the nose approach those of the Negro, the bridge being more depressed in relation to the orbits than is the case with Hindus; the mouth is lage, the lips thick and projecting; the hair coarse, black, and occasionally ourly; the zygomatio arohes prominent, while the proportions of the skull, approaching the dolichocephalic type, conclusively refuse the hypothesis of their Mongolian descent.[১৬]

কিন্তু ১৮৭২ সালে ডাল্টনের গবেষণায় নতুন তথ্য উঠে আসে, সেখানে সাঁওতালদের চেহারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অধিকাংশ সাঁওতালদের রঙ হয় কালো ও গাঢ় বাদামী। গোলাকার মাথা এবং নাকের আকার কিছুটা চ্যাপ্টা এবং উচ্চতার দিক তারা ছোট থেকে মাঝারি। তাদের মুখ গোল থাকে, কপাল সোজা ও চওড়া এবং মাথার চুল ঢেউ খেলানো হয়। হো, মুণ্ডা, শবর, ওঁরাও ও কোল প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠনের সঙ্গে সাঁওতালদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সমগ্র বিশ্বের মধ্যে চারটি দেশে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ সাঁওতাল বসবাস করে। যথা- ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান। তার মধ্যে ভারতে বসবাস করে সব থেকে বেশি। ভারতে প্রায় সত্তর লক্ষ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস। ভারতের পর পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশেও বহুসংখ্যক সাঁওতাল জাতি বসবাস করে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ও আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে সাঁওতাল জনজাতি বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় বসবাস করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেলাগুলি হলো- মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বাকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি। বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষ সাঁওতাল জনগোষ্ঠী স্থায়ী বাসিন্দারূপে অবস্থান করে। এছাড়া নেপাল ও ভূটানে অল্প সংখ্যক সাঁওতালদের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৭] ভারতের ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুসারে সাঁওতাল জাতি জনসংখ্যা ছিল ৩৬,৩৩,৪৫৯ জন। সব

থেকে বেশি সাঁওতাল বসবাস করে বিহার রাজ্যে, ১৮,০১,৩০৪ জন। আর পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৭৬,৯৮০ জন। আদিবাসীদের মধ্যে এই দুই রাজ্যে সাঁওতালরা বসবাস করে ৩৬.৫১% এবং ৫৪.৩৬%। বিহারের সাঁওতাল পরগণায় ১০,০৩,৮১৯, হাজারীবাগ জেলায় ২,০৩,১৬৫, সিংভূম জেলায় ১,৬৫,৫৩৬, ধানবাদে ১,২৬,১৬৩ এবং পূর্ণিয়ায় ১,৯৬,৬৩২। আর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় সব থেকে বেশি সাঁওতাল বসবাস করে, প্রায় ২,৮৬,০১০ জন। বর্ধমানে ১,৮০,২৮০, বাঁকুড়া ১,৫৭,৮০৬, দক্ষিণ দিনাজপুর ১,৩০,৪৭৩ এবং বীরভূম ১,০৪,৭২২। এছাড়া উড়িষ্যা রাজ্যে ৪,৫২,৯৫৩ জন।[১৮] ২০০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে সাঁওতালদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তবে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি। আসলে আসাম রাজ্যে আদিবাসী হিসেবে সাঁওতালদের জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়নি। ভারতের চার রাজ্যের বসবাসকারী সাঁওতাল পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে মোট জনসংখ্যা, পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলার লিঙ্গ অনুপাত, শিশু লিঙ্গ অনুসারে শিশুর অনুপাত, পুরুষ ও মহিলার স্বাক্ষরতার হার, প্রধান কর্মী এবং আংশিক কর্মীর হার একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে,[১৯]-

State	Number of house hold	Total Population			Sex ratio	Child sex ratio	Literacy (%)			WPR	Main worker	Marginal worker
		Total	Male	Female			Total	Male	Female			
West Bengal	5,62,526	25,12,331	12,48,370	12,63,961	1012	979	54.7	66.1	43.5	50.5	53.5	46.5
Tripura	752	2,913	1,514	1,399	924	982	71	78.7	62.6	48.5	64.2	35.8
Bihar	86,644	4,06,076	2,06,506	1,99,570	966	972	43.1	53.1	32.7	45.1	56	44
Jharkhand	5,69,996	27,54,723	13,71,168	13,83,555	1009	975	50.8	62.9	39	48.1	39.6	60.4
Odisha	1,94,874	8,94,764	4,45,700	4,49,064 1	1008	972	55.6	68.1	43.3	48.6	44.9	55.1

বিপুল সংখ্যক সাঁওতাল সমাজে 'সাঁওতাল' শব্দ প্রয়োগেও বির্তক রয়েছে। সমাজ, সাহিত্য ও পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ড. অতুল সুর মনে করেন– 'কিংবদন্তি

অনুসারে তাদের আগের নাম ছিল খারবার। 'খর' শব্দ 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'হর' শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষ। মেদিনীপুরের সাঁওতাল পরগণায় এসে যখন তারা বাস করে, তখন তাদের নাম সাঁওতাল হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর জেলায়। এ-থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল পরগণাতেই তাদের প্রথম বাস। মনে হয় 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' উল্লেখিত 'হর' জাতি ও সাঁওতাল জাতি অভিন্ন।'[২০] 'মনসামঙ্গল কাব্যে' 'সাঁতালী' পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২১] অনেকেই মনে করেন যে 'সাঁতালী' শব্দ থেকে সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'সামন্তপাল' থেকে 'সাঁওতাল' শব্দের উৎপত্তি।[২২] আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় যে সাঁওতাল কিংবা বাঙালিরা 'সাঁওতাল' শব্দ প্রথম পর্যায়ে ব্যবহার করেনি। মূলত ইংরেজ জাতিই 'সাঁওতাল' শব্দ প্রচলন করে। ১৭৯৫ স্যার জন শোর 'Soonatars' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।[২৩] 'Soonatars' শব্দের পরিবর্তে ১৮২০ সালে হ্যামিলটন 'Sontals' শব্দ ব্যবহার করেন।[২৪] আবার ১৮২৭ সালে পেটি ওয়ার্ড 'সান্টারস' নাম উল্লেখ করেছিলেন।[২৫] এখানে 'সান্টারস' বলতে 'সাঁওতে' অর্থাৎ মিলিতভাবে কিংবা দলবদ্ধভাবে থাকাকে বোঝানো হয়েছে।'[২৬] রেভ স্ক্রেফস্-রুড-এর মতে অপভ্রংশ শব্দ 'সাওনতর' মূলে 'সাঁওন্ত' বা 'সামন্তভূমি' আছে।'[২৭] ডি-বড়কা কিস্কু-এর 'The SANTAL and Their Ancestor'[২৮] গ্রন্থ কিংবা ক্ষুদিরাম বসুর 'সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান'[২৯] গ্রন্থেও বলা হয় যে 'সাঁওতাল' নামটি ইংরেজরা দিয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব' গ্রন্থে উল্লেখিত 'কোল' কুটির শিল্পীদের বলা হত 'সান্তাল' বা সাঁওতাল'।[৩০] অবশ্য 'সাঁওতাল' শব্দের উৎস নিয়ে যে সংশয় আছে তা ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে-র বক্তব্যে ধরা পড়ে-

> সাঁওতালী পুরাণ সংগ্রাহক স্ক্রেফস্রুড সাহেবের মতে, সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবত 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এদেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করে। আগে প্রাচীন মেদনীপুরের এক অংশকে বলা হত

'সাওন্ত' বা 'সামন্তভূমি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। 'সামন্তপাল' মানে 'সীমান্তরক্ষক'। মধ্যযুগে এই 'সামন্তপাল' কথাটিই 'সামন্ত-আল' ও পরে 'সাঁওতাল: সাঁওতাল পরিণত হয়। প্রশ্ন ওঠে যে, সামন্তভূমিতে তো শুধু সাঁওতালরাই বসবাস করত না, আরও বহু জাতি ছিল। তারা কেন সাঁওতাল নামে অভিহিত হল না? তাছাড়া, সাঁওতালরা সীমান্তরক্ষক হিসাবে ছিল বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩১]

তাই আমরা দেখতে পাই যে, অভিধানে এবং শব্দকোষে 'আর্যজাতি' ভারতে প্রবেশ করার বহু বছর আগে থেকে অনার্যজাতি বসবাস করত।[৩২] অনার্যজাতির মানুষরা গাছ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, স্থান, পশু, পক্ষী ইত্যাদি দেবতাস্বরূপ পূজা করত। বঙ্গদেশের গ্রামে-গঞ্জে গাছপূজা বহুল প্রচলিত বিষয়, শেওড়াগাছ, বটগাছ, পাথর ও পাহাড়-পূজা দেখা যায়। বর্তমান ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনযাপনে আদিম অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।[৩৩] প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আদিবাসীদের লৌকিক জীবন নির্ভর করে থাকে পবিত্র শালগাছের তলায় কিংবা জাহের থানে। এছাড়া সাঁওতাল লোকগানের মধ্যেও বনভূমির আবিষ্কার পাওয়া যায়। যেমন তারা মনে করে তাদের গ্রামগুলির বসতি স্থাপন করেছিলেন মারাংবুরু ও জাহের এরা। আদিবাসী জীবন নিয়ে চর্চা করা বিশেষজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়ে বড় হয়, শৈশব থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করে। তখন তাদের কণ্ঠে জাগে বিচিত্র মধুর সঙ্গীত-

এ বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ী তৈরী করব
রাজারাণী হয়ে আমরা থাকব,
জগতের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে যাব
স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।[৩৪]

বছরের পর বছর তাদের জীবন কাটে প্রকৃতি অন্তঃপুরে, অফুরন্ত আনন্দের মাঝে। বাইরের জগতে এতটুকু কালিমা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রকৃতির মতই তারা সরল, শান্ত ও সুন্দর। ছল, চাতুরী, প্রতারণা তাদের অজানা।

আসলে মুণ্ডা বা হো গোষ্ঠীর মতোই সাঁওতালরাও 'হড়' বা 'হোরো' বলে নিজেদের সর্বত্র পরিচয় দিয়ে থাকে। যার অর্থ 'মানুষ'। আবার আদিবাসীদের পূর্বপরিচয় 'খেরওয়াল' বংশ হিসাবে। আদিবাসীরা ভিন্নজাতির মানুষদের দিকু নামে পরিচয় দেয়। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী সভ্যতার যে যারা আছে, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর ও চিন্তার মানুষজনদেরই 'দিকু' বলা হয়েছিল।[৩৫] খেরওয়াল জাতি মানুষদের কাছে 'দিকু' শব্দটি অমানবিক গুণসম্পন্ন একদল মানুষকে বোঝায়।[৩৬] এই অমানবিক মানুষের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় 'সাঁওতালি কাহিনী'(বনবীর গাথা) গ্রন্থে-

সাঁওতাল দুর্বলহেরী বাঙালী, বেহারী
ঢুকেছে সাঁঅতাল গ্রামে খেলিছে চাতুরী,
কোথাও বসেছে তারা ব্যাপারীর বেশে
সাঁওতাল ক্রেতার ডাকে সমাদরে হেসে।
বাঙ্গালীর প্রবঞ্চনা বেহারীর কুমন্ত্রণা
ক্রমে বন্ধ সাঁওতাল বাণিজ্য ব্যভার,
মহাজন চাষী খনে বাঁটা লেনদেন
শতগুণে বারায়েছে কুসীদের হার।[৩৭]

পূর্বে মহাজন, ব্যবসায়ী বাঙালি-বিহারীদের দিকু বলা হতো, অর্থাৎ বর্তমানে আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য জাতির মানুষদের 'দিকু' নামে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে মুণ্ডা জাতির মতোই সাঁওতালরা মুণ্ডা বা কোল ভাষা বংশের মানুষ। সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে 'খেরওয়াড়' বা 'খেরওয়াল' বংশ থেকে তাদের উদ্ভব। এই আদিবংশের একটি শাখা কীভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হলো সে সম্পর্কে একটি প্রাচীন লোকশ্রুতি সংগ্রহ করেছিলেন কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কে.পি চট্টোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ'(প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। সাঁওতাল জাতির সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নিয়ে মাঝি রামদাস টুডু রেস্কা তাঁর 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি'(১৮৯৪) গ্রন্থে সুন্দর ও যথার্থভাবে আলোচনা করেছেন। সাঁওতালদের প্রথম মানব-মানবী পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি হিহিড়ি-পিপিড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিল। সেখান থেকে তারা চলে যায় খজকামনে। সাঁওতালদের চারিত্রিক দোষের কারণে খজকামনে সাতদিন ধরে আগুন বৃষ্টি হয়। সেখান থেকে এক স্বামী ও স্ত্রী বেঁচে যায়, তারা 'হারাতা' নামক নির্জন গুহায় আশ্রয় নেয়। এখানে স্বামী-স্ত্রী বলতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে বোঝানো হয়েছে। তারা 'হারাতা' স্থান ত্যাগ করে ভূখণ্ড-সাসাংবেড়া অঞ্চলে চলে আসে। এখানেই 'খেরওয়াল' বংশের পরিচিতি বাড়তে থাকে এবং সাঁওতালদের সাতটি পদবী সৃষ্টি হয়। 'সাসাংবেড়া' অঞ্চলে তারা বেশিদিন থাকতে না পেরে 'জারপি দিশম' হয়ে 'সিঞদুয়ার' বা সিঞদরজা' পার হয়ে 'আইরে দিশম' বা আইরে দেশে বসবাস শুরু করে। তারা 'আইরে দিশম' থেকে 'কায়েণ্ডা দিশমে' যায়। 'কায়েণ্ডা দিশম্' থেকে 'দায়দিশমে', হান্টারের রিপোর্ট অনুসারে 'দায়দিশমে' থেকে তারা 'চাম্পা' দিশমে আসে। 'চাম্পা'তেই সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। আর এই 'চাম্পা' দেশেই সাঁওতালদের বারোটি পদবী যুক্ত হয়। বস্তুত ওয়াডেলের গবেষণা অনুসারে সাঁওতালরা প্রায় দু'শো বছর বসবাস করার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তারা সভ্যতা গড়ে তোলে।

'চাম্পা গাড়' বা সিন্ধুনদের অববাহিকা সাঁওতালদের আদিস্থান। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক প্রভাব' গ্রন্থে 'চাম্পা গাড়' সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী কান্দাহার ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে বহুদিন যাবৎ বসবাস করেছে। 'গান্ধার' বা 'কান্দাহার'- এই নামটি ছিল প্রাচীন আফ্গানিস্তানের এবং 'চায়-চাম্পা' নাম ছিল সিন্ধু উপত্যকার। 'চায়-চাম্পা গাড়ে' 'খেরওয়াল' বংশের বিকাশ ঘটে। চাম্পা দেশের

সময়কালে খেরওয়ালদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই দেশে বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সাঁওতালরা পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুরুষ ও নারীরা আলাদা আলাদা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ পুরুষরা 'হিচাঃবুটা' আর নারীরা 'মাতকমবুটা' স্থানে চলে যায়। এরপর সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করে তারা 'জনা জস্‌পুর' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আবার 'জনা জস্‌পুর' থেকে সাঁওতালরা 'ঘাসপাল বেলাওংজা' জায়গায় চলে যায়। আর এভাবেই তারা মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটি দল 'শির দিশম' আর অন্য দল 'শিকার দিশমে' চলে যায়। যে বনে তারা বসবাস করতে শুরু করে, সেই বন দু'টির নাম হলো 'সিংবীর' ও 'মানবীর'। যথাক্রমে এই 'সিংবীর' এর নাম হলো 'সিংভূম', আর 'মানবীর' এর নাম হলো 'মানভূম'। সেরউইল (১৮৫১, ১৮৫৪) তথ্য অনুসারে এই অঞ্চলেই সাঁওতালরা সুস্থভাবে জীবনযাপন শুরু করে। সাধারণত 'সিংভূম' ও 'মানভূম' অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা বিরাট ছিল। পরবর্তীকালে বিশাল এই ভৌগোলিক ভূখণ্ডই 'দামিনী-ই-কো' নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাধারণত সাঁওতালরা নানা সময়ে নানা কারণে যুদ্ধ ও লড়াই করার ফলে তারা একই স্থানে দীর্ঘ-কাল ধরে বসবাস করেনি, বারবার তারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তবুও তাদের মূল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সবসময় তারা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তাই সাঁওতাল জীবনের ধারাবাহিক বিবর্তনের রূপরেখা কমবেশি ধরা পড়েছে। আর এই সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন-

> অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রাচীন ও বর্তমান জনদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় এবং অনুমান করা যায়, ...ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছু অভাব ছিল; সহজেই পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত এবং আত্মসমর্পন করিয়াই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিত। বার বার অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বশ্যতা

> স্বীকার করিয়াও যে ইহারা নিজেদের জনগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই বশ্যতা করিয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই ইহাদের প্রাণশক্তি। বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুন্ডা প্রভৃতির জীবনচারণ একটু মনযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্বহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কাম পরায়ণও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরিয়া এত বিবর্তন-পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে বিশেষ বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[৩৮]

সাঁওতালরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি এবং নিয়ম-কানুনও রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তারা মন থেকে প্রতিবাদ করে। এছাড়া একসঙ্গে তারা বসবাস করে, একই আঞ্চলিক পরিবেশে থাকতে ভালোবাসে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের মধ্যে সমতার বিষয় রয়েছে। সাঁওতালদের সাধারণ জীবনযাপনের ধরনটা কী রকমের! তারা কীরকম অবস্থায় থাকে ও কীভাবে থাকে? তাদের ঘর বাড়ি কীরকম? তারা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে ও নিত্যদিনের জীবনযাপনে কোন সময়ে কী ধরনের জীবিকা গ্রহণ করে থাকে? তারা কী কী পছন্দ করে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাহিদাগুলি কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে? তাদের সমাজ সংস্কৃতি কীরকমের? তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংগঠন কোন ধরনের? সাঁওতালদের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং অন্যান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সাঁওতাল জীবন সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে নিম্নে, -

ঘরবাড়ি:-

মূলত সাঁওতালদের বাসস্থান বনে-জঙ্গলে। বন-জঙ্গল ছাড়াও এদের বসবাস শহর থেকে বহুদূরের প্রান্ত এলাকায়। যেখানে যোগাযোগের অভাব রয়েছে, সেখানে অন্যান্য জনজাতির বসবাসও সেইভাবে থাকে না। এই সমস্ত প্রান্ত অঞ্চলে রাস্তার দুধারে সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি থাকে সারিবদ্ধভাবে। সাধারণত এরা বড় বড় ঘর-বাড়ি তৈরি করতে পছন্দ করে। তারা ঘরের

বারান্দাও বড় রাখতে চায়। সাঁওতালরা ঘরের চালের উপরে মিষ্টি কুমড়ো, চাল কুমড়ো, পুঁই শাঁক– ইত্যাদি সবজি লাগিয়ে রাখে। তারা ঘরের সামনে ফাঁকা স্থানে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষও করে থাকে। প্রতিটা বাড়ি খুবই সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। ছাউনি করা মাটির ঘর হলেও সেই বাড়িগুলি হয় খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের বাড়ির দেওয়ালগুলিতে খুব সুন্দর ছবি আঁকা থাকে। বাড়ির দেওয়ালে জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি, ফুল-ফল, ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জীবনচিত্র যেন তুলে ধরা হয়।

আসবাবপত্র:-

সাঁওতালরা সাধারণত ঘরের মধ্যে বিশেষ কিছু রাখে না। এরা নিজেরাই নিজেদের আসবাব পত্র তৈরি করে। ঘরে থাকার জন্য ও ঘুমানোর জন্য খেজুর পাতা দিয়ে মাদুর তৈরি করে, আর দড়ির সাহায্যে দড়ির খাটিয়া তৈরি করে থাকে। একই সঙ্গে খড়ের কিংবা কাঠের ছোটো টুল থাকে। আত্মীয়স্বজনরা এলে সেই খাটিয়া কিংবা কাঠের টুলে বসতে দেওয়া হয়। সাঁওতালদের যাবতীয় আসবাবপত্র মাটি-খড়-বাঁশ-গাছপালা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া মাটির সাহায্যে সুন্দর করে রান্না করার জন্য উনুন থাকে। এমনকি তাদের বাটি, কলসি, হাড়ি, ইত্যাদি জিনিসপত্রও মাটির হয়ে থাকে। এদের সব থেকে পছন্দের আসবাবপত্র হলো কাঁসার থালাবাটি। এসব ছাড়াও তাদের ঘরের মধ্যে ঝুড়ি, চালুনি, কুলো ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়াও সাঁওতালদের তীর-ধনুকতো থাকেই, সঙ্গে শিকারের জন্য নানা রকম সরঞ্জামও সাজানো থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজগোজ:-

সাঁওতালদের নিত্যদিনের পোশাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে ‘গামছা’। সাধারণত ছেলেরা গামছা সবসময় পরে থাকলেও এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাও গামছা ব্যবহার করে থাকে। তবে ছেলেদের ট্র্যাডিশনাল ড্রেস হচ্ছে ‘পাঞ্চি’ধুতি। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ‘পাঞ্চি পারহাট’। এই ‘পাঞ্চি ধুতি’

এবং 'পাঞ্চি পারহাট' তারা সবসময় ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে অনুষ্ঠানের সময় এবং মেলার সময় তাদের এই ধরনের পোশাক ব্যবহার করতে বেশি দেখা যায়। আদিবাসী মেয়েরা সুন্দর করে সাজগোজ করার পর তাদের মাথায় সবসময় ফুল লাগানো থাকে। এছাড়া তারা গয়নাও পরে থাকে। তবে তারা কাঁচের চুড়ি বেশি ব্যবহার করে না। কিংবা সোনাও কম ব্যবহার করে। তাদের যাবতীয় ট্র্যাডিনশাল সাজগোজ হয় রূপোর অলঙ্কার দিয়ে। যেমন মালা, আংটি, পাগরা, বালা, চুর, বাজু, তোড়া, কমরদানি- ইত্যাদি রূপোর অলঙ্কার মেয়েরা ব্যবহার করে।

সাঁওতাল নর-নারীর চিহ্ন:-

সাঁওতাল নর-নারীদের বিশেষ চিহ্ন থাকে, যে চিহ্নের সাহায্যে তাদেরকে চেনা যায়। মেয়েদের গলার নিচে বুকের মধ্যে 'খোঁদা' বা 'উলকি' থাকে। মেয়েদের বুকের মধ্যে ছোটো কিংবা বড় একটা বা তারও বেশি 'খোঁদা' থাকে, তবে এই খোঁদা বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকে। ছোট ছোট ফুল তৈরি করা হয়। মূলত এই খোঁদা তৈরি করে খুঁদনিরা এবং এটি তারা সুচ এর মাধ্যমে করে। অন্যদিকে ছেলেদের হাতে থাকে 'শিকা'। বিশেষ করে বাঁ হাতে গোল করে 'শিকা' দেওয়া হয়। যা অনেকটা হাতের ঘড়ির মত দেখতে হয়। সেই অংশের চামড়াটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু দিন পর তা শুকিয়ে যায়। তারপর চিরদিন সেটি থেকে যায়। এই 'খোঁদা' বা 'উলকি' এবং 'শিকা' যদি শরীরে না থাকে তাহলে সাঁওতাল নরনারীরা যেন তাদের পরিচয় দিতে পারে না। মূলত এটিই অচেনা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে একে অপরকে চেনার একমাত্র উপায়।

জীবিকা:-

সাধারণত সাঁওতালদের জীবন হচ্ছে কৃষি নির্ভরশীল জীবন। তাদের প্রধান কাজ হলো কৃষি। বন-জঙ্গল কেটে জমি বানিয়ে জমিতে ধান চাষ করার ইতিহাস যেন তারাই শুরু করেছে। জমি

চাষ ছাড়াও তারা বনে-জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারকে শিকার করে কিছু দিনের জন্যে আহার সংগ্রহও করে থাকে। এমনকি বনে জঙ্গলের ফুল-ফল-পাতা খেয়েও তারা জীবনযাপন করে থাকে। সাঁওতালরা দল বেধে কাজ করতেই বেশি ভালোবাসে। আর যাদের জমি জায়গা নেই, তারা অন্যের জমিতে 'মুনিশ' হিসেবে কাজ করে থাকে। কখনও কখনও তারা খেত-মজুরি কিংবা দিন মজুরি হিসাবেও কাজ করে। আবার ঠিকা ধরেও তারা কাজ করে থাকে। যখন চাষ-আবাদ ঠিক ঠাক হয় না তখন তারা 'নামাল' এর কাজে চলে যায়। আর এই কাজ বিশেষ করে বর্ধমান জেলাতে যেন বেশি দেখা যায়। এছাড়াও অন্যান্য সময়ে দেখা যায় যে, সাঁওতালরা বিভিন্ন কল-কারখানাতেও কাজ করে থাকে। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে বহু সাঁওতালরা চা বাগানেও শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। বস্তুত জমি চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লাঙল চাষে মেয়েদের নিষেধ থাকলেও এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাও পুরুষের সমান সমান কাজ করে থাকে।

নিত্যদিনের সংসার চালানোর জন্য তারা শাক-সব্জি বাজার থেকে খুবই কম কিনে খায়। সাধারণত বন-জঙ্গল থেকেই তারা শাক সংগ্রহ করে থাকে। যদিও তারা ঘরের মধ্যেই পুই শাক, চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো- ইত্যাদি চাষ করে থাকে। এছাড়া পুকুর ঘাট থেকে শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছ- ইত্যাদি সংগ্রহ করে রান্না-বান্না করে থাকে। ঘরের মধ্যে মুরগী, হাঁস, শুয়োর ইত্যাদিও তারা পালন করে এবং আত্মীয় স্বজনদের আগমন ঘটলে সকলেই মিলে ঘরোয়া মাংস খাওয়ার চিত্রও দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে আবার মাঠে-ঘাটে পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার শিকার করে নিয়ে আসে এবং গ্রামের সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করে।

সাঁওতালদের গোত্র:-

সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে সাঁওতালদের মোট ৭টি গোত্র ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে আরও পাঁচটি গোত্র যোগ হয়ে যায়। ফলে সাঁওতালদের মোট বারোটি

গোত্র পাওয়া যায়, যথা- হাঁসদা, কিস্কু, হেমব্রম, টুডু, মার্ডি, মুর্মু, চঁড়ে, সরেন, বাস্কে, বেদেয়া, পাঁউরিয়া ও বেসরা।

এই সমস্ত গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাধা-নিষেধ রয়েছে এবং সমস্ত গোত্রের ধর্মীয় প্রতীকও পৃথক পৃথক থাকে। গোত্রের উপগোত্রগুলিও নানা ভাগে বিভক্ত। গোত্রগুলিকে মূলত প্রকৃতির বিভিন্ন জীব-জন্তু, পশু-পাখি, গাছ-গাছালি, ফুল-ফলের নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই গোত্র ছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে নানা রকম পারিবারিক কিংবা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বন পালিত হয়। আবার গোত্র অনুসারে গোত্রের প্রকৃতির প্রতীকগুলিকে তারা মেনে চলে। অর্থাৎ নিজেদের গোত্রের প্রতীককে কেন্দ্র করে তারা বিবিধ রীতিনীতি মেনে চলে। যেমন গোত্রের চিহ্ন অনুসারে তারা তাদের পালিত পশুদের দেহে চিহ্ন করে রাখে, ফলে তারা নিজেদের পালিত পশু সহজেই চিনতে পারে।

সাঁওতাল সমাজের গঠন প্রণালী:-

আদিমকাল থেকেই সাঁওতালরা তাদের সমাজ সম্পর্কে খুবই যত্নশীল ও দায়িত্বশীল। তারা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ সংগঠনের গুরুত্ব স্বীকার করে এসেছে। সাঁওতাল সমাজের সংগঠনের মাধ্যমে সমস্ত গ্রামের মানুষ নিজেদের পরিচালনা করে থাকে। তাদের সমাজে এই সংগঠন ব্যাপারটা খুব বড়। এই সংগঠন শুরু হয়- মূলত গ্রাম থেকে। সাঁওতালদের প্রত্যেক গ্রামে এই সংগঠন থাকে। সমাজের নানা রকম নিয়ম-কানুন ও আইনবিধি গঠন করা হয়। যাতে করে সাঁওতাল গ্রাম ও সমাজ ঠিক পথে চলতে পারে। তাদের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য এই সমস্ত গ্রাম সংগঠনের অপরিহার্য ভূমিকা থাকে। এছাড়া গ্রামের লোকজন যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করে, তাহলে তাদের সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য গ্রাম সংগঠন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সাঁওতালদের এমন কিছু আইনও আছে যা সাঁওতাল সমাজের কোনো ব্যক্তি সেই আইন অমান্য

করলে তাকে কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হয়। এমনকি আইনানুসারে সেই ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করতেও তারা পিছপা হয় না এবং সেই ব্যক্তিকে তারা 'বিটলাহা' আখ্যা দিয়ে থাকে।

সাঁওতালদের সমাজ সংগঠন অনুসারে গ্রামের সব থেকে নিচের স্তরে থাকে গোডেত। সাধারণত সে তাদের গ্রামের বিশেষ বিশেষ খবর প্রচার করে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কুডাক নাইয়কে, যে কিনা নাইয়কের সহকারী। যার কাজ হলো গ্রামের বিভিন্ন দেবতাদের সময়ে সময়ে পূজা দেওয়া কিংবা গ্রামের কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেই জন্যে অপদেবতাদের দূর করা। কুডাক নাইয়কের উপরে থাকে নাইয়কে, গ্রামের পূজারী। যাকে ছাড়া কোনো অনুষ্ঠানেই সম্পন্ন হয় না। নাইয়কের উপরে থাকে জগ-পারানিক, সাধারণত জগ-মাঝি না থাকলে এই জগ-পারানিক সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার উপরে থাকে জগ-মাঝি। জগ-মাঝি মূলত গ্রামের নানা রকম সমস্যা দেখাশোনা করে থাকে। এছাড়া সমস্ত রকম অনুষ্ঠান, বিবাহ, আচার-আচরণও পরিচালনা করে থাকে। একই সঙ্গে গ্রামের নানা রকম বিচার হলে জগ-মাঝি তা পরিচালনা করে। জগ মাঝির উপরে থাকে পারানিক। পারানিক মূলত মাঝির সহকর্মী। মাঝি না থাকলে পারানিক কাজ করে থাকে। সবার উপরে থাকে মাঝি হাড়াম, গ্রামের মোড়ল।[৩৯] যার হাতে গ্রামের সমস্ত দায়িত্ব থাকে। গ্রামের সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত সমস্যা, সমস্ত বিচার-আচার মাঝি হাড়ামের হাতে দায়িত্ব থাকে। বস্তুত অনেকগুলি গ্রামের মাঝি নিয়ে একজন 'পরগণাইত' গঠিত হয়।[৪০] পরগণাইতের সহকারী 'দিশম মাঝি' হিসাবে একজনকে নির্বাচন করা হয়। প্রায় দশ-বারোটি গ্রামের বিচারালয় মিলে গঠিত হয় পরগানাইত এবং এর দায়িত্ব থাকে দিশম মাঝির হাতে।

জন্ম সংস্কার:-

জন্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা নিয়ম কানুন থাকে না, তবে কিছু ক্ষেত্রে আবার থাকেও। যেমন জন্মের শুদ্ধিকরণের পদ্ধতিতে এটা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মেয়ে

সন্তান হলে তিনদিনের শুদ্ধিকরণ পালিত হয়। আর ছেলে সন্তান হলে তা হয় পাঁচদিনের। এই তিন দিন কিংবা পাঁচ দিন ব্যাপারটা এখন খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। যাইহোক এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানকে সাঁওতালরা 'জানাম ছাটিয়ার' নামে চিহ্নিত করে থাকে।

বিবাহ:-

সাঁওতালদের বিবাহ রীতিনীতি এবং নিয়মকানুনও বহু ধরনের। বিয়ের নানা নিয়মনীতি তারা মেনে চলে। সাধারণত সাঁওতালদের বিয়ে সব মাসে হয় না। যেমন 'বাহা' পরবের আগে তাদের বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। মূলত বাহা পরবের পর থেকে বিয়ে শুরু হয় এবং 'দাশায়' পরবের আগের সময় অবধি। তবে অনেক সময় নানা কারণে 'দাশায় পরব' ও 'বাহা পরবে'র মাঝখানেও বিবাহ হয়। বিয়ে সম্পর্কেও সাঁওতাল সমাজে বেশ কিছু কঠোর নিয়মনীতি প্রচলিত রয়েছে-

- সাঁওতাল সমাজে সিঁদুরের গুরুত্ব খুব বেশি। একটা ছেলে ও মেয়ে একবারেই সিঁদুর দিতে ও নিতে পারে।
- অল্প বয়সে কোনো ছেলে ও মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হয় না। মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়া তাদের সমাজে নিষিদ্ধ।
- সাঁওতাল সমাজে মেয়েপক্ষকে কোনো রকম পণ দিতে হয় না। বরং ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষকে পণ দিয়ে থাকে। যদি ছেলেপক্ষ কোনো মেয়েপক্ষ থেকে পণ গ্রহণ করে তাহলে তাকে এবং তার পরিবারকে কঠিন-কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।
- বিধবা মেয়েকে যে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারে।
- অন্য জাতির সঙ্গে তাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কেউ বিয়ে করলে তাকে 'বিটলাহা' আখ্যা দেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক বিবাহ:-

সাঁওতালদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হলো পবিত্র বিবাহ। এই বিয়ের মূলে থাকে পারিবারিক মেলবন্ধন। অর্থাৎ ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে দেখাশোনা করার পর বিয়ে হয়। উভয়পক্ষ রাজি থাকলে তবেই এই বিয়ে হয়। উভয়পক্ষের সঙ্গে একজন ব্যক্তি যোগাযোগ করে, যার নাম দেওয়া হয় 'রায়বার হাড়াম'। যাকে 'ঘটক' বলা হয়ে থাকে। এই রায়বার হাড়াম ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষকে রাজি করায়, তারপর প্রথমে মেয়েকে দেখার জন্যে ছেলেপক্ষের একজন অভিভাবক তাদের বাড়িতে যায়। এরপর মেয়ে পছন্দ হলে রায়বার হাড়াম একটা দিন ঠিক করে, যে দিনে মেয়েকে দেখার জন্যে ছেলের বাড়ির লোকজন মেয়েপক্ষের বাড়িতে যায়। সেই দিন গ্রামের মাঝি, পারানিক, নাইয়কে, গোডেতসহ গ্রামের সমস্ত লোকজন হাজির হয়। এই সময় মেয়ে দেখার নানা পর্ব ও নিয়ম-কানুন তারা পালন করে। সেই সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করার পর যখন ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষ উভয়ই রাজি হয়, তখন তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হয়। এই আনুষ্ঠানিক বিবাহ হওয়ার পূর্বে তারা ধাপে ধাপে অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। প্রথমে ধাপে 'মালা মুদাম' পর্ব। এই পর্বে মেয়ে পক্ষের বাড়িতেই ছেলেপক্ষের লোকজনরা মেয়েকে মালা ও আংটি দিয়ে বরণ করে। তারপর 'জামাই হরোগ' অর্থাৎ জামাইকে আশীর্বাদ করতে মেয়েপক্ষের লোক ছেলেপক্ষের বাড়িতে যায়। এই পর্বে মূলত অভিভাবকরাই যায়। জামাই হরো হয়ার পর 'বাহু হরোগ' হয়। এই সময় ছেলেপক্ষের লোকজনরা মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যায়। এরপর বিয়ের আগে 'বালায়া জোহার' নামক একটা বড় অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান মূলত উভয়পক্ষের অভিভাবকদের। এই অনুষ্ঠান হয় ছেলেদের বাড়িতে এবং সেখানে মেয়েপক্ষের সমস্ত লোকজনকে পছন্দের মতো মাংস খাওয়ানো হয়।

এর পর মূল বিয়ের আয়োজন করা হয়। এই বিয়ে ঠিক করার দিনে উপস্থিত থাকে ছেলে ও মেয়ে পক্ষের আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারের লোকজন, একই সঙ্গে উপস্থিত থাকে গ্রামের মাঝি-পারানিকসহ মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। এরপর সকলের মতামতে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। তবে বিয়ের দিন হয় সাতমাহা, পাঁচমাহা ও তিন মাহা। যে কোনো একটা মাহাকে বেছে নেওয়া হয়। সাতমাহা ও পাঁচমাহা বিয়ের ব্যাপারটা খুব কম দেখা যায়। মূলত তিন মাহার বিয়েটাই বেশি হয়। তারপর বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সাঁওতালদের বিয়ে একেবারেই আলাদা, সাধারণত তারা মাটিতে বসে বিয়ে করে না। একটি ঝুড়িতে কন্যাকে অর্থাৎ পাত্রীকে বসিয়ে নিয়ে আসা হয় বিবাহমন্ডপে, বরপক্ষের লোকজন তুলে ধরে থাকে এবং অন্যদিকে একজন জোয়ান পুরুষ বরকে কাঁধে তুলে ধরে থাকে। এরপর মেয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে এবং ছেলে পুর্বদিকে মুখ করে থাকে। তখন বর কন্যাকে সিঁদুর দান করে, তারপর বর বউকে ঝুড়ি থেকে কোলে করে মাটিতে নামায়। আর এভাবেই সাঁওতালদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়ে থাকে।

টুঙকি দিপিল বাপলা:-

এই বিয়ে হয় মূলত যাদের আর্থিক সামর্থ থাকে না তাদের জন্য। এই বিয়েতে কন্যা পক্ষের বিশেষ কিছু করার থাকে না। বিয়ের সব আয়োজন ছেলে পক্ষের বাড়িতেই হয়।

অর আদের বাপলা:-

এই বিয়েতে ছেলে যদি কোনো একটা মেয়েকে পছন্দ করে। পছন্দ করে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে, তাহলে সেই ছেলে তার বন্ধুদের সঙ্গে করে মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে আসে। তারপর গ্রামের মোড়লরা হাজির হয় এবং মেয়েকে জিজ্ঞেস করে সে এই বিয়ে রাজি কিনা! মেয়ে যদি বিয়েতে রাজি হয় তবেই এই বিয়ে হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠান বিয়ের মতোই হয় কিন্তু যদি মেয়ে রাজি না থাকে তাহলে ছেলেকে জরিমানা দিতে হয়।

ঞির বল বাপলা:-

এই বিয়ে হয় একটু অন্যরকম ভাবে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে, তখন এই ধরনের বিয়ে হয়। মেয়েটি গ্রামে এসে সমস্ত মাঝি-মোড়লদের জানিয়ে ছেলের বাড়িতে জোর করে থাকতে শুরু করে। ছেলের বাড়ির লোকজন মেয়েকে যদি মেনে নেয় তাহলে খুব ভালো কিন্তু যদি মেনে না নেয়, তখন মেয়েকে তারা নানা ভাবে অত্যাচার করতে শুরু করে। আসলে এখানে মেয়েকে এক রকম ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয় যে, সে কতটা অত্যাচার সহ্য করতে পারে। তবে বেশিদিন তাকে এই অত্যাচার সইতে হয় না। কারণ কিছুদিন পরে তাদের বিবাহ হয়।

ইতুৎ সিন্দুর বাপলা:-

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকে কিন্তু বাড়ির লোক এই সম্পর্ককে মানতে রাজি না হয় তখন ছেলে তার প্রেমিকাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করে। আর সিঁদুর দেওয়া মানেই তাঁকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা। তাই তখন বাড়ির বাবা মা এর কিছু করার থাকে না।

সাঙ্গা বাপলা:-

সাঙ্গা বিয়ে মানে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেওয়া। এখানে সিঁদুর দিয়ে বিবাহ হয় না। ফুল দিয়ে বিবাহ হয়। সাদা ফুলে তিন বার সিঁদুর লাগিয়ে মেয়ের চুলের খোঁপায় দিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত এই বিয়েতে জাঁকজমক অনুষ্ঠান করা হয় না।

কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা:-

সাঁওতাল সমাজে এই বিবাহ খুব কমই হয়। মূলত মেয়ে যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকে আর ছেলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে, তখন গ্রামের লোকজন টাকা দিয়ে একটা বরকে কিনে নিয়ে আসে। যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় আর তার সঙ্গেই সেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। এবং পরবর্তী সময়ে সে ঘর জামাই হিসাবে পরিচিতি পায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ:-

নানা কারণে বিবাহ ভেঙ্গে যেতে পারে তবে সাঁওতাল সমাজে এই বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা একটু অন্যধরনের। বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এভাবে-

> 'ছেলে বাঁ পায়ের উপর দাঁড়ায় এবং তাকে তিনটি শালপাতা দেওয়া হয়; সে গলবস্ত্র হয়ে পাতা নেয় আর সূর্যদেবকে প্রণাম করে ওই শালপাতা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর ঘুরে ডান পা দিয়ে ঘটির জল উল্টে দেয় আর স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে সরে যায়। এরপর ছেলেটি মাঁঝি থেকে শুরু করে উপস্থিত সবাইকে একে একে প্রণাম করে। মেয়েটিকেও তাই করতে হয়। এই ভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদের রীতিনীতি।[৪১]

মৃত্যু ও সৎকার:-

সাঁওতাল সমাজে দেখা যায় যে মৃতদেহ কবর কিংবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে বহু নিয়মকানুন থাকে। বাড়ির মধ্যে মৃতদেহটিকে প্রথমে স্নান করানো হয়। স্নান করার পর নতুন জামা কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। হাতে পায়ে আলতা দেওয়া হয়। তারপর মৃতদেহের গায়ে হলুদ ও তেল মাখানো হয়। হলুদ ও তেল মাখানোর পর কপালে সিঁদুর দেওয়া হয়। এই কাজগুলো শুধুমাত্র বাড়ির মহিলাই করে থাকে। তারপর আত্মীয়-স্বজনরা তেল ও হলুদ দেয়। যাবতীয় কাপড়-চোপড় ও তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস-পত্র মৃতদেহের পাশে রেখে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তার শরীরের নানা স্থানে বিভিন্ন রকম অলঙ্কার লুকিয়ে রাখা হয়। তার সঙ্গে টাকা পয়সাও রাখা হয়। তারপর একটা বাঁশের তৈরি খাটিয়ায় মৃতব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হয়। সেই সময় মৃতব্যক্তির পরিবারের পুরুষ মানুষরা যখন খাটিয়াটাকে বাইরে নিয়ে যায় তখন বাড়ির মহিলাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে মহিলারা নদীতে বা পুকুরে চলে যায়। আর অন্যদিকে পুরুষরা খাটিয়াটাকে প্রথমে গ্রামের চৌমাথায় নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয় কারণ মৃতব্যক্তির শরীরে যেন কোনো

অশরীরী আত্মা প্রবেশ করতে না পারে। তারপর সেখান থেকে কবর স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কবর স্থানে গিয়ে গোডেত মশাই প্রথমে মৃতব্যক্তিকে খাটিয়া থেকে নামিয়ে দেয়। এরপর উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে মৃতদেহকে শুয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরিবারের বড় সদস্য প্রথমে একটি পাত্রে জল নিয়ে নিজের হাত ও পা ধুয়ে নেয়, তখন কিছু জল সেই পাত্রের মধ্যে রেখে দেয়। সেই বাকি জল দিয়ে মৃতব্যক্তির হাত ও পা ধুয়ে দেয় এবং মুখে কিছুটা জল দিয়ে থালাতে সামান্য টাকা রেখে দেয়। এরপর একে একে উপস্থিত গ্রামের লোকজন একই কাজ করে। এই রীতি পালন করার পর মৃতব্যক্তিকে কবরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। অবশ্য প্রবেশ করানোর সময় জ্যান্ত একটা বাচ্চা মুরগি সেখানে রেখে দেওয়া হয়। যাতে সেই মৃতব্যক্তির আত্মা সেই মুরগির মধ্যে দিয়ে জীবিত হয়ে ওঠে। তারপর বাড়ির মূল সদস্য কবরের উপরে প্রথম মাটি দেয় এবং এরপর একে একে গ্রামের সবাই কবরে মাটি দিতে শুরু করে। কবর দেওয়ার পরে সকলে মিলে নদীতে বা পুকুরে চলে যায়। সেখানে আগে থেকেই নাপিত উপস্থিত থাকে। নাপিত প্রথমে বাড়ির মূল সদস্যদের চুল দাড়ি কাটে ও মাথা নেড়া করে। তারপর বাকিরাও চুলদাড়ি কেটে মাথা মুণ্ডণ করে। এই সময় নদীতে বা পুকুরের উপরে মাটি দিয়ে থান তৈরি করা হয় এবং সেখানে পূজা করা হয়। অবশ্য সেই পূজার যাবতীয় জিনিস জলে ভাসিয়ে দিয়ে সকলে স্নান করে নেয়। স্নানের পর সকলেই বাড়িতে ফিরে আসে। ফেরার সময় গ্রামে প্রবেশ করার মুখে সামান্য আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই আগুনের উপর হাত ও পায়ের মধ্যে একটু উত্তাপ নিয়ে সবাই মিলে গ্রামে প্রবেশ করে। অন্যদিকে মহিলারাও একই রীতি পালন করে। বাড়িতে প্রবেশ করার পর পূজা হয়। পূজা হওয়ার পর ‘ভান্ডান বা শ্রাদ্ধের দিন ঠিক করা হয়।

দেবদেবী:-

সাঁওতালদের দেবদেবীর সংখ্যা অনেক রয়েছে তবে সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে প্রথমে তারা একজনকেই ঈশ্বর বলে মান্য করত। সে হলো 'ঠাকুর-জীউ'। সেই প্রথমে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি সৃষ্টি করে। কিন্তু ঠাকুর জীউ-এর নাম বিশেষ ভাবে উচ্চারিত হয় না। এর বদলে তারা 'চান্দো বঙ্গা' নামটি উচ্চারণ করে থাকে। এই 'চান্দো' শব্দটির মানে হলো 'চাঁদ' কিন্তু এর মূল অর্থ 'ভগবান'। এই 'চান্দো বঙ্গা' আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক 'সিঞ চান্দো', দুই 'নিন্দা চান্দো'। 'সিঞ চান্দো' অর্থাৎ সূর্যদেব, যে সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা। আর 'নিন্দা চান্দো' হলো চাঁদদেব।

সাঁওতালদের কাছে 'মারাং বুরু' বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। কারণ, সেই প্রথম পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে হাঁড়িয়া খাইয়ে দিয়ে মিলনে আবদ্ধ করেছিল। যারা পরবর্তীকালে সাঁওতাল সমাজে সাত ছেলে ও সাত মেয়ের জন্ম দেয়। আর এজন্যই সাঁওতালরা 'মারাংবুরু'র নামেই পূজা দিয়ে থাকে। এছাড়াও সাঁওতালদের বহু দেব-দেবী আছে। যেমন 'জম সিম', 'জাহের থান', 'গোসাই এরা'– ইত্যাদি দেব-দেবী। বস্তুত তাদের মূল বিশ্বাস বোঙ্গাদের উপর। তাই তারা প্রতিটা দেব-দেবীকে খুব যত্ন সহকারে সেবা করে।

উৎসব ও অনুষ্ঠান:-

সাঁওতালদের কাছে এই উৎসব অনুষ্ঠানটাই হলো তাদের নিজেদের সংস্কৃতির মূল ও মুখ্য পরিচয়। সাঁওতালরাও সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন 'এরক সিম বোঙ্গা', 'হারিয়াড় সিম বোঙ্গা', 'জান্থাড়', 'সহরায়', 'বাহা', 'নাওয়াই', দাঁসায়', 'কারাম', 'মাঃ মড়ে,' 'শিকার পরব'- ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান তাদের সমাজে হয়ে থাকে। মূলত সময় ও মাস অনুসারে উৎসবগুলি তারা পালন করে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ সাধারণত গ্রামের মোড়লাই ঠিক করে থাকে।

বর্তমানে সাঁওতালদের জীবনযাপনের ধরন খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তবে কিছু পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। এর পিছনে সরকারের অবদান যথেষ্ট রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাদীদের উন্নয়নের জন্যে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে তারাও ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে। এই ধরনের সুযোগ সুবিধা ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়- 'রাষ্ট্র বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেশের দুর্বলতর অংশের, বিশেষত তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনীতিগত স্বার্থপূরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করবে।'[৪২] আবার ৩৪২ ধারাতে বলা হয়েছে- 'রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপন জারি করে আদিবাসী বা আদিবাসী গোষ্ঠীকে অথবা গোষ্ঠী অংশকে বিধিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত করলে তারা তফসিলী আদিবাসী হিসাবে গণ্য হবে।'[৪৩] ১৯৫০ সালে সংবিধানের ৩৪২ধারাতে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র সাতটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম ছিল। তার মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ছিল।[৪৪] পরে 'দি সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডার(এয়ামেণ্ডমেন্ট) এয়াক্ট ১৯৫৬ প্রবর্তন করা হয়। তার ফলে সাতটি গোষ্ঠীর বদলে আরও বারোটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম তপশীলিভুক্ত হয়। একই সঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর 'সিডিউল্ড ট্রাইবস্(মডিফিকেশন) অর্ডার ১৯৫৬' প্রবর্তন করা হয়। এখানে আরও বাইশটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তপশিলীভুক্ত করা হয়।[৪৫] সব শেষে ১৯৭৬ সালে 'দি সিডিউল্ড কাস্টস এয়াণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডার(এয়ামেণ্ডমেন্ট) এয়াক্ট অনুযারী পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত হয়।[৪৬] 'আদিবাসী পঞ্চশীল' নীতিতে বলা হয়, আদিবাসীদের উন্নতির জন্য মননশীল মনোভাব, নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য উৎসাহ প্রদান, বন-জঙ্গল ও জমির উপর নিজস্ব স্বীকৃতি দেওয়া, প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কাজে যোগ্যলোক তৈরি করা, আদিবাসী এলাকায় বেশি সংখ্যক বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ, প্রশাসনের অতিরিক্ত চাপ কমানো এবং গুণগত বিচারে উন্নয়ন গঠন করার কথা বলা

হয়েছে।[৪৭] সাংবিধানিক রক্ষা কবচে 'তপশিলী উপজাতিরা দেশের মোটজনসংখ্যার ২২ভাগ।'[৪৮] অনগ্রসর, সংখ্যালঘু এবং দুর্বলতম মানুষের অপমান, লাঞ্ছনাও বৈষম্য লক্ষ্য করেই সংবিধানে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার দায়বদ্ধতা রাখা হয়েছে।[৪৯] ভারতীয় সংবিধানে ৪৬ক অনুচ্ছেদ এবং ২৪টি বিভিন্ন ধারায় বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ভারতীয় সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৯, ও ৩৫ ধারা বা অনুচ্ছেদ অনুসারে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিতের সর্বস্তরে নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'[৫০] ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ধারাতে বলা হয় চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে, ১৭ নম্বরে অস্পৃশ্যতার আচরণ করা দন্ডণীয় অপরাধ, ১৯ নম্বরে ভারতের সর্বত্র বসবাস ও সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয় করার ন্যস্ত হয়েছে। ২৩ নম্বরে কোনো ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা চলবে না, ২৯ নম্বরে ভারতের যে কোনো নাগরিকসমূহের, যাঁদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা ও লিপি কিংবা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তাঁরা তা অবিকৃত রাখতে পারবেন।[৫১] আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনাতে ১৯৫৪ সালে Multipurpose Tribal Development Project (MADA) গঠিত হয়। প্রথম দিকে তেতাল্লিশটি প্রকল্প ছিল। যদিও 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে Community Development Block(CDB)-র সূচনা হয়েছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে CDB-র জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ বা তার বেশি আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত, সেই সকল ব্লককে Tribal Development Block(TDB) নামে চিহ্নিত করা হয়।'[৫২] মূলত আদিবাসী উন্নয়নের জন্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 'পঞ্চবার্ষিকী' পরিকল্পনাতে, এতে বিরাট পরিবর্তন আসে। 'পঞ্চবার্ষিকী' সময়ে আদিবাসী উপ-পরিকল্পনাও করা হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জওহরলাল নেহেরুর 'পঞ্চশীল' নীতির মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। সামগ্রিকভাবে আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে তিনভাগে ভাগ

করা যায়- (ক) অর্থনৈতিক, (খ) শিক্ষাগত ও (গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।[৫৩] আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নের জন্য যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হলো- পাট্টা বিতরণ, বর্গাদার রেকর্ড ও ঋণদান। এছাড়া রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, গৃহনির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ- ইত্যাদি বন্দোবস্ত করা হয়। বিভিন্ন কৃষি ঋণ, কৃষি প্রযুক্তির সহায়তা, দোকান, কারখানা তৈরি করা, জেরক্স মেশিন বসানো, বা অন্যান্য কুটির শিল্প, এছাড়াও আদিবাসী মহিলাদের হাঁস, মুরগিপালন, শুকরপালন এবং ছোটখাটো ব্যবস্য-বানিজ্যের জন্যও ঋণদান ব্যবস্থা করা হয়।[৫৪] 'আদিবাসীদের ঋণদানের জন যে সমস্ত সংস্থাগুলি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'West Bengal SC & ST Development and Corporation' এবং 'West Bengal Tribal Development Co-operative Corporation Ltd'। জাতীয় স্তরেও এ ধরনের আদিবাসী ঋণদানের সংস্থা রয়েছে। আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা (Tribal Sub-plan) করা হয়, বর্তমানে ১৯৭৪ সালে এই উপ-পরিকল্পনার সূচনা হয়। তারপর 'Integrated Tribal Development Project' (ITDP) পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়।'[৫৫] আর সাধারণভাবে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলির দ্বারা আদিবাসীদের শিক্ষাগত দিক উন্নয়ন ঘটানোর হয়, তা হলো পুস্তক ক্রয়, হোস্টেলের ব্যয়, পড়ুয়াদের খাতা খরচ, পড়ুয়াদের আবশ্যিক ব্যয়- বিভিন্ন প্রকার অনুদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বৃত্তিপ্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, পরীক্ষা প্রশিক্ষণ, ছেলে-মেয়েদের জন্য আবাসিক নির্মাণ, ও বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ- ইত্যাদি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। একই ভাবে ২৬০ আশ্রম হোস্টেল, ৪২টি ছাত্রাবাস, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, 'রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল ফেলোশিপ' (২০০৫-২৬) চালু করা হয়।[৫৬] সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যে- 'ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা হয়েছে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে

হবে।’[৫৭] এছাড়াও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু জন্মশতবর্ষ পালন, প্রতিযোগিতা(সাঁওতাল নাটক), উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার প্রদান, সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে ‘হুল দিবস’ ইত্যাদি পালিত হয়।[৫৮] অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা আদিবাসীরা পেয়ে থাকলেও এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নানান ধরনের রাজনীতি হয়ে থাকে। খুব কম আদিবাসীই এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আর অন্যদিকে রাজনৈতিক মানুষগুলো এই ধরনের বিভিন্ন সরকারী স্কিমগুলি নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে এখনও আদিবাসীরা মূল সমাজ থেকে বহু পিছিয়ে রয়েছে এবং এই কারণেই তাদের উন্নতির হার খুবই কম। বরং নিরক্ষর হার অনেক বেশি। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্প বিপ্লবের ফলেও আদিবাসী সমাজ ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে নীরোদ সি চৌধুরি তাঁর সুবিখ্যাত ‘দি কন্টিনেন্ট অফ সারসি’ গ্রন্থে বলেছেন-

> মিশরের নীল নদের জলাধার নির্মাণের ফলে ঐতিহ্যমন্ডিত মিশরের মন্দিরগুলি যেভাবে ডুবে গেছে ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের, শিল্পায়নের ফলে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে চলছে তাতে এই জাঁকজমকপূর্ণ সুবিশাল কর্মকাণ্ডে আদিবাসীদের কোন ভূমিকা নেই, যার ফলে মানব ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ, অবলুপ্তির দিকে তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীরা এক জঘন্য ও বিবর্ণ অবস্থার দিকে পৌঁছচ্ছে, দুঃখজনক হলেও এটা মানতেই হবে। ভবিতব্যের মাঝে এখন তাহলে প্রশ্ন কি? অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সত্যি সত্যিই তাঁরা অবলুপ্ত হবেন, না দাসত্ব ও অবক্ষয়ের নয়া শৃঙ্খলে তাঁদের জড়ানো হবে।[৫৯]

আদিবাসী চিরদিনই অবহেলিত থেকে গেছে, তাদের জীবন আগামি দিনে অন্ধকারময়। বলতে গেলে আদিবাসীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি শিক্ষাচর্চার দিকও উন্নতি ঘটেনি।

তথ্যসূত্র:

১। STATISTICAL PROFILE OF SCHEDULED TRIBES IN INDIA 2013 MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION Government of India www.tribal.nic.in , p- 1, Accessed 12th July, 2015

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৬১

৩। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৭

৪। মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৪

৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

৮। তদেব

৯। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ২

১০। মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৪

১১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ২

১২। ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২৪

১৩। তদেব

১৪। শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ২০১২, পৃষ্ঠা- ৫০৯

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৩৮

১৬। Risley, H.H, *The Tribes and Castes of Bengal*, Firma KLM Private limited, Calcutta, 1998, p- 225

১৭। Santal people From Wikipedia, link- https://en.wikipedia.org/wiki/Santal_people , Accessed 20th january, 2019

১৮। Das, Dr. A. K, *To be with Santals*, Cultural Research Institute, on behalf of Scheduled Castes and Tribes Welfare Department, Government of west Bengal, Calcutta, 1982, p- 44

১৯। STATISTICAL PROFILE OF SCHEDULED TRIBES IN INDIA 2013 MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION Government of India www.tribal.nic.in , Accessed 12th July, 2015

২০। সুর, অতুল, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্য লোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ২০০

২১। বাস্কে, শ্রী রামসুন্দর, প্রসঙ্গ: *সাঁওতাল জাতির পরিচয় ও জাতি সত্তার গঠন প্রণালী,* চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী (সম্পা), সমকালীন পত্রিক, বর্ষ- ২, সংখ্যা- ৬, দামোদর গ্রুপ অফ প্রিন্টার্স, দুর্গাপুর, ১৬ অক্টো ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩

২২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *কোলজাতির সংস্কৃতি,* ঘোষ, দীপঙ্কর(সম্পা.), বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২২

২৩। Malley, L.S.S.O' (I.C.S), *Bengal District Gazetteers*, Santal Parganas, Op.cit. p- 114

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭

২৫। রায়, শ্রী প্রভাষচন্দ্র, *সাঁওতাল বিবরণ,* ঘোষ, দীপঙ্কর(সম্পা.), বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩২৯

২৬। Dalton, E.T. *Descriptive Ethnology of Bengal*, Op.cit. p-123

২৭। এল ও স্ক্রেফস্‌, রেভারেন্‌ড, *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা,* পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৭

২৮। মুর্মু, বিমল, *সাঁওতালি ভাষা ও বিশ্বের ভাষা মানচিত্র,* আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮

২৯। দাশ, ক্ষুদিরাম, *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩-৫

৩০। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব,* ১৮/১ শান্তিনগর, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১৮৬

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫

৩৩। রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০, পৃষ্ঠা- ৫৮

৩৪। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৩

৩৫। মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৮১

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮২

৩৭। দত্ত, লোকনাথ, *সাঁওতালি কাহিনী(বনবীর-গাথা),* চৌধুরী, অরুণ (সম্পা), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৯

৩৮। রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০, পৃষ্ঠা- ৫৪

৩৯। Archer, W. G, Tribal law and Justice, Concept publishing Company PVT.LTD, New delhi, First Published 1984, p- 4

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫

৪১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২০৮

৪২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯

৪৩। তদেব

৪৪। তদেব

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯-১০

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

৪৭। তদেব

৪৮। মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৩৫

৪৯। তদেব

৫০। তদেব

৫১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৭৭

৫৩। তদেব

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৫৫। তদেব

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮০

৫৭। তদেব

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৫৯। মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা

বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষজন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে- যা 'মাইগ্রেশন' নামে পরিচিত। মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'মাইগ্রেশন'। **১৯৭১** সালের ভারতের সেনসাস রিপোর্টে 'Migrant' এর জনগণনা হয়েছিল জন্মস্থান ও কর্মস্থান অনুসারে। যে ব্যক্তি যেখানে জন্মলাভ করেছে অথচ সেখান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে জীবিকার্জন করে তাকে 'Migrant' বলা হয়। আর যে ব্যক্তির জন্মস্থান ও কাজের স্থান একই থাকছে, তাকে 'Migrant' বলা হয় না। খুব স্বাভাবিক বিষয়, সারা বিশ্বে আদিবাসীরা নানা সময়ে নানা কারণে স্থানান্তর হয়েছে। এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরেও নিজেদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। সাঁওতাল জাতির 'মাইগ্রেশনে'র ইতিহাস যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখা যাবে ব্রিটিশ যুগের অনেক আগে থেকেই কৃষিকাজের জন্যে বহু সাঁওতাল স্থানান্তরিত হয়েছে। সাঁওতালদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেশনের নানা দিক পাওয়া যায়, বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে। একটি বিশেষ শক্তি মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় জন্মভূমি থেকে। নতুন স্থানে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় আকঁড়ে থাকে সাঁওতাল মানুষ। তারা প্রশাসনিক সীমানাকে অতিক্রম করে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে তারা স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা আধা স্থায়ী বা সাময়িক জীবনযাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয় জাতীয় সীমানার মধ্যে। ভারতের মতো দেশে সাঁওতালদের সংস্কৃতি ও জীবনবোধ পরিবর্তন হতে থাকে বারে বারে।

মাইগ্রেশন নানা কারণে হয়ে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম দিক হলো প্রকৃতি। যেখানে কৃষকের কর্মসংস্থান হয় না এবং নিম্নমানের কৃষি উৎপাদন হয়, সেখানে অতিমারি, মহামারি, অতিবৃষ্টি, কম বৃষ্টি, খরা- নানা ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। সেই রকম স্থানের নাম হলো জঙ্গলমহল অঞ্চল। সাঁওতালদের আদি বাসস্থানের সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয়- ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিতে অবস্থিত রাজমহল, রামগড় পর্বতমালা, সুবর্ণরেখা, কোয়েল ও বৈতরণীর

মতো প্রভৃতি নদী। এই বৈতরণী নদী উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও সিংভূমের সীমারেখাকে ধরে রেখেছে। জঙ্গলমহলের উত্তরে অবস্থিত হাজারীবাগ, গিরিডি ও বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি, পশ্চিমে লোহারদাগা ও হাজারীবাগ, এবং দক্ষিণে সিংভূম, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা।[১] ছোটনাগপুর, সিংভূম, মানভূম এবং জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গলের সম্পদ আদিবাসীদের জীবনধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধ সবই মিলত জঙ্গল থেকে। শাল, পলাশ, মহুয়া থেকে শুরু করে তসর, কালমেঘ, সর্পগন্ধা এবং অন্যান্য বহু আয়ুর্বেদিক ওষুধ বৃক্ষের পরিপূর্ণ এই জঙ্গল সম্পদের ওপর একরকম একচেটিয়া অধিকার ছিল আদিবাসীদের।[২] হান্টার সাহেব উল্লেখ করেছেন, এই সমস্ত স্থানে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারের সঙ্গে ঠিকাদারদের 'Contractor of the Mohajons class' সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৬ সালে মানভূমে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন জঙ্গলমহলে অবস্থিত আদিবাসী মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন ফলমূল ও পশুপাখিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জীবনধারণে সক্ষম হয়েছিল। এই অঞ্চলে পতিত জমি ছিল, সেখান থেকে গোচারণের মধ্যে দিয়ে চাষযোগ্য জমি তৈরি করে জঙ্গল থেকে উৎপাদিত বাঁশ-বেত-ঘাস পাওয়া যেত এবং সেটা বিক্রি করে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মেটানোর চেষ্টা হত। সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীদের কৃষিকাজের জন্য নির্ভর করতে হত বৃষ্টিপাতের ওপরে। বৃষ্টির অভাবে সাঁওতালরা সাময়িকভাবে স্থান পরিবর্তন করে। খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তার ফলে সাঁওতালদের জনসংখ্যার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৮০১ সালে ওয়েলেসলির শাসন ব্যবস্থার সময় সরকারীভাবে যে জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল, তা পুরোপুরিভাবে সঠিক নয়। ১৮০৭ সালে ফ্রান্সিস বুকানন বাংলা প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে জনগণনার অবস্থা নির্ণয় করতে গিয়েও শেষ করতে পারেননি। ১৮৫৪-৫৬ সালে বাঁকুড়া জেলাতে জনসংখ্যা সমীক্ষা করা হয়েছিল, 'তাতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,৩৮,৪৯৫ যার মধ্যে ৩,৯৩,৫৫৩ ছিল হিন্দু এবং সাঁওতাল এবং বাকি ৪৪,৯৪২ ছিল মুসলমান।'[৩] এর থেকে

বোঝা যায় যে আদিবাসীদের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক সাঁওতালরাই ছিল। এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় এই অঞ্চলে সাঁওতালরাই বেশি বসবাস করে। ভাগলপুর জেলা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে ফ্রান্সিস বুকানন বেশ কিছু নতুন তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন ভাগলপুর অঞ্চলে প্রায় ৫০০ সাঁওতাল পরিবার নতুন বসতি স্থাপিত হয়। তাঁর মতে, জমিদারের অত্যাচারে বীরভূম থেকে সাঁওতালরা ভাগলপুর অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। এই তথ্য থেকে বুঝা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বীরভূম এবং তার আশেপাশে অঞ্চলে সাঁওতালদের বসতি ছিল। ১৮৭২ সালে জঙ্গলমহলের জনসংখ্যার চিত্র কিছুটা পাওয়া যায়-

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতালদের সংখ্যা
বর্ধমান	৫৪,৪১৯	৪,৪৮৭
বাঁকুড়া	৩৯,০৮০	২৫,২৭৪
মেদিনীপুর	১,৭২,৬৭২	৯৬,৯২১
বীরভূম	পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।	৬,৯৫৪।[৪]

সাঁওতালদের জনসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, সাঁওতালরা যেখানে-সেখানে চাষাবাদ করত এবং পশুপাখি শিকার ও হাস-মুরগি-গরু-মোষ পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি ছিল আধা জমি চাষ ও ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করা। জঙ্গল পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থায়ী কৃষক হিসাবে বসবাস করতে শুরু করে।

সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ‘দামিনী-কো’। হাজারীবাগ জেলার চায় ও চাম্পা অঞ্চলে সাঁওতালদের আদিভূমি ছিল। কর্নেল ডালটন চম্পা নগরীতে জৈনিক সাঁওতাল রাজার একটি দুর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের জৈনিক সেনাপতি সৈয়দ ইবরাহিম আলী এই অঞ্চল আক্রমণ করলে সাঁওতাল রাজা পরিবারসহ নিজেকে ধ্বংস করেন। এই বর্ণনাটি রেফারেন্স ফিলিপস কর্তৃক সংগৃহীত সাঁওতাল উপকথার সঙ্গে মিলে যায়। বোডিং সাহেব মনে

করেন, হাজারীবাগের চায়-চম্পাতে এবং ছোটনাগপুরের মালভূমিতে সাঁওতালদের বসতি ছিল। সাঁওতালদের আদিম লোকশ্রুতি অনুসারে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। সাঁওতালদের উপকথার বর্ণনা থেকে তাদের যাত্রাপথ সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। নৃতত্ত্ববিদ রিসলে মনে করেন হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশের ফলে সাঁওতালরা তাদের আদিবাস থেকে ভূমিচ্যুত হয়েছিল।[৫] অন্যদিকে জানা যায় যে, '১৭৭২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই চাকলা মেদিনীপুরের জমিদারি লাভ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত যদিও জঙ্গলমহল নামে কোন নির্দিষ্ট জেলা ছিল না তবু পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূমের জেলা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল।'[৬] অর্থাৎ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা জঙ্গলমহলে প্রবেশ করেছে। আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় জঙ্গলমহলে সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল না। মাক আলপিন ১৯০৯ সালে বর্ণনা করে জানিয়েছেন যে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সাঁওতালরা জঙ্গলমহলের আদি বাসিন্দা নয়। এই অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে তাদের বসবাস শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এরা ছোটনাগপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। স্যার জন শ্যোর্-এর মতে সাঁওতালদের আদি বাসস্থান হচ্ছে রামগড় অঞ্চল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জয় লাভ করার পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতাল ছন্নছাড়া হয়ে যায়। শুধু সাঁওতাল নয়, বাংলাদেশে যেভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারি। এই অঞ্চলে প্রায় সমস্ত মানুষই ছিল কৃষিজীবি। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জমি পতিত জমিতে রূপান্তরিত হয়। এইরকম চরম পরিস্থিতির চিত্র হেস্টিংস সাহেব লক্ষ্য করেন, জমিদারদের বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়, শ্রমিকের অভাবে বঙ্গদেশের অবস্থা বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাই জমি ব্যবস্থার আইন-কানুন বার বার পরিবর্তন হতে থাকে।

চাষযোগ্য জমির অভাব দেখা দিতে শুরু করে এবং অন্যদিকে বাজার মূল্য সমস্যা হয়ে উঠে জনসমাজে। দুর্ভিক্ষজনিত যে জঙ্গলমহল কিংবা বাংলাদেশের নানা স্থানে আদিবাসী সাঁওতাল কৃষক ও শ্রমিক হিসেবে চালান করা হয়। বাংলাদেশের কৃষকদের শূন্যতা, স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালরা তা পূরণ করেছিল। শুধু বাংলাদেশ নয় জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং ময়ূরভঞ্জ এই সমস্ত জায়গাগুলোতে সাঁওতাল জাতি স্থানান্তর হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মারফতে সমস্ত পতিত জমি এবং জঙ্গল কেটে জমি তৈরির কাজে সাঁওতালদের নিযুক্ত করা হয়। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ঘোষিত হওয়ার পরেই জমিদাররা জমি চাষ নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়েছিল। সাঁওতালদের বিনা খাজনার নামে বা নামমাত্র খাজনার জমি চাষের অধিকার দেওয়া হত। দুর্ভিক্ষের কারণে চাষ করার লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই বাংলার কৃষি অর্থনীতির সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাঁওতালরা একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বন কেটে বসত তৈরিতে তারা ছিল বিশেষভাবে দক্ষ।[৭] জমি মালিকের সঙ্গে সাঁওতালদের মৌখিক শর্ত থাকার কারণে সাঁওতালরা জমির অধিকার পেতে থাকে। জঙ্গল কেটে কেটে কৃষি জমি তৈরি করা এবং সেই সূত্রে তারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। নতুন বসতি স্থাপনের সময় নতুন জেলার নামকরণ উঠে আসে। ১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল জেলার সূত্রপাত হয়। পরে আবার নতুন রেগুলেশনে ১৮৩৩ সালে জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটানো হয়। ‘জঙ্গলমহলে ভৌগোলিক অবস্থানের বীরভূম বাঁকুড়ার একটি বড় অংশ ছিল। সাঁওতালি ভাষায় ভীর বা বীর বলতে জঙ্গল বোঝায় এবং হান্টারের মতানুসারে বীরভূম নামটির উৎপত্তি এই জঙ্গল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকেই। কোম্পানি দেওয়ানি লাভের সময় বীরভূমের রাজা ছিলেন মোহাম্মদ আসাদ আল জামান খান বাহাদুর।’[৮]

জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করা একমাত্র ও সর্বাপেক্ষা দক্ষ ছিল সাঁওতালরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকেই দেখা যায় সাঁওতালরা জঙ্গলমহলের জঙ্গল কেটে চাষযোগ্য জমি

তৈরি করে। জঙ্গলমহলের সাঁওতালরা সামাজিক উন্নতির জন্য কৃষিকাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, অথচ এই অঞ্চলের বাঙালিরা কৃষিকাজে পারদর্শী ছিল না। ফলত তাদের হিংসা হত বেশি করে। শুধু তাই নয় জাতিগত ভাবেও বাঙালিরা সাঁওতালদের নিচু চোখেই দেখতো। এই সম্পর্কে হামিল্টন এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়- ‘এই জঙ্গলের (মেদিনীপুর) কিছু অংশ একদল দরিদ্র, হতভাগ্য জাতিচ্যুত লোক অধিকার করে আছে। এরা সাঁওতাল নামে পরিচিত। সমতলবাসীদের কাছে এরা অন্ত্যত নিচু জাতের লোক হিসাবে ঘৃণিত এবং এরা সাঁওতালদের কোনোভাবেই তাদের গ্রামে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয় না। মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে এরা তাদের স্থান দিতে চায় না।’[৯] গ্রামবাংলার বাঙালি হিন্দু সমাজের গ্রামে সাঁওতালদের প্রবেশ অবাধ ছিল না। বাঙালি সমাজের কাছে জঙ্গলী মানুষ হিসাবেই এদের প্রাধান্য বেশি ছিল। এর বিপরীতে দেখা যায় সাঁওতালদের অহংকারও কম ছিল না। অর্থাৎ তারাও বাঙালি থেকে আলাদাভাবেই থাকতে চেয়েছে। তারা জঙ্গলের সমতলভূমিতে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। এই সমতলভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা অঞ্চলে জঙ্গলের জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করার জন্য একমাত্র বিকল্প ছিল সাঁওতালরা। তবে তারা কৃষিজমি উৎপন্ন করলেও তাদেরকে কোনো পাট্টা জমি দেওয়া হয়নি মৌখিকভাবে তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম বন্দোবস্ত হয়েছিল। ‘১৮০২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের কালেক্টর আর্নেস্ট লিখেছেন যে জমিদারেরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই সাঁওতালদের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতেন, কেননা বন কেটে আবাদি জমি তৈরি করার ক্ষেত্রে সাঁওতাল ব্যতীত আর কোন বিকল্প ছিল না। প্রথম দিকে সামান্য অত্যাচারেই তারা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেত। তারা অনেক কষ্ট করে বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ধান ও কলা ফলাতো।’[১০] তবে লাভের অধিকাংশ অংশ মহাজনদের হাতে চলে যেত এবং সাঁওতালরা মহাজনদের কাছ থেকে বিষ কেনার জন্য এবং খাবারের জন্য যে ঋণ নিত সেই ঋণ শোধ করতে সাঁওতালদের বহু সময়

লাগত, বংশ-পরম্পরা ভাবে তারা সেই ঋণ শোধ করত। ফলে জর্জরিত সাঁওতালরা সেখান থেকে অন্য স্থানে পালানোর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করত। বাধ্য হয়ে সাঁওতালরা তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাবে দামিনী-কো, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে অবস্থিত বহু সাঁওতাল ছড়িয়ে পড়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে, তারা পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলাগুলোতে পালিয়ে যায়।

সাঁওতাল জনজাতির মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ভূমিকা ছিল কনট্রাক্টরদের। কারণ, সাঁওতাল পরিবার ও সমাজবদ্ধ জীবন মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আদিবাসী জীবনের অন্যতম বিশ্বাস হলো গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন। আদিবাসীদের জীবনে বন-জঙ্গলে শিকার করা খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল, পাহাড় কেটে জমি তৈরি করা, প্রাচীন পদ্ধতিতে জমি চাষ করা। ইংরেজরা জোর করে সাঁওতালদের জমি চাষে নিযুক্ত করত, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত। ইংরেজরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নানা মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নানা রকম লোভনীয় শর্তে সাঁওতালরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন রকম আইনকানুন প্রয়োগ করতে থাকে, যা সাঁওতাল জীবনকে ছন্ন-ছাড়া করে তোলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের নীতি প্রয়োগ করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি'তে(১৭৯৩)। স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালরা ভূমিহীন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে চড়া হারে কর আদায় প্রক্রিয়া চলতে থাকে। দামিনি-কো ও সাওরিয়া পাহাড় অঞ্চলে 'অরণ্য আইন'(১৮৬৪), 'সরকারী জঙ্গলের সীমা নির্ধারণ'(১৮৭১), 'সংরক্ষিত অঞ্চল'(১৮৯৮), 'ডেপুটি কমিশনার জঙ্গল'(১৯০৬), 'সরকাররী জঙ্গলে সীমা বৃদ্ধি'(১৯১০)- ইত্যাদি নানা রকম আইন প্রয়োগ করতে থাকে ব্রিটিশ সরকার। যা আসলে আদিবাসী জীবনকে বিপন্ন করে তোলে এবং সাঁওতাল জাতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা বেঁচে থাকার তাগিদে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালরা অরণ্যের অধিকার হারায় এবং তারা দিনমজুর ও

শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। আধুনিক যুগের ইতিহাসে সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃষিবিদ্যা। তারা কৃষিজমিতে আধুনিক কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না, সেই কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য বহুদূরে যেতে হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে কার্যকারী ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয় সর্দার বা কনট্রাক্টর। বড় বড় শিল্প-কলকারখানা ও রোড তৈরির সময় শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তখন কনট্রাক্টর সাঁওতাল শ্রমিকদের একটা স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্থানে কাজের সূত্রে তারা বাইরে যায়। বিশেষ করে রেললাইন ও ড্যাম তৈরির সময়। উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে কাজ করার জন্য কিংবা সুন্দরবন অঞ্চলে নীল-চাষ ও বন-জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করার কাজে জোর করে সাঁওতালদের নিয়ে গেছে ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯১ সালে সাঁওতালরা মাইগ্রেটেড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের কাজে নিযুক্ত হয়। শ্রমিক হিসাবে ইংরেজ সরকার তাদেরকে নিয়ে যায়। চা চাষের সূত্রপাত করে ব্রিটিশ সরকার। জলপাইগুড়ি জেলা চা বাগান অঞ্চলে সাঁওতালরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে। সেখানেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুটা পরিবর্তন হয়। ব্রিটিশ যুগের(১৮২০-১৯২০) সময় লাগাতার সাঁওতালদের আসামের চা বাগানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা ‘টি ট্রাইবাল’ নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে শ্রমিক সাঁওতালরা সাহেবগঞ্জ জেলাতেও কাজের সূত্রে বসতি স্থাপন করে, সেখান থেকে তারা উত্তরপ্রদেশের মুজ্জাফর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ, সাঁওতালরা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য পরিবার সমেত বর্ধমানের কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়। এভাবেই খুব গরিব পরিবারের সাঁওতালরা বর্ধমানে যেতে থাকে এবং সেখানে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে।

ইংরেজ সরকার দামিনি-কো অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণা নামে এক নতুন জেলা ঘোষণা করে। সাঁওতালদের মাঝি বাবাদের হাতে সাঁওতাল গ্রামের শাসনব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের সাঁওতালরা প্রথম থেকেই জমির পাট্টা হিসাবে রেকর্ড ছিল। কিন্তু ইংরেজ ও জমিদারের অত্যাচারে সাঁওতালরা জমিচ্যুত হয়ে যায়। অথচ জমির সঙ্গে সাঁওতালদের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কে ক্যালশ জানিয়েছেন-

> No motive is so strong in a tribal people as the preservation of the life of the tribe and his moves albeit. The motive works for the most part at the unconsions level,and the Santals land not only provides economic secerity but is a powerful link with his ancestors...Hunger drove them to despair, but this attachment to land provided also an emotional basis without which the rebellion might not have taken place.[১১]

সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তরযাত্রার চিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে বৈচিত্র্যময়ভাবে উঠে এসেছে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র ও ভাষা ব্যবহার যেমন উপস্থিত থাকে, তেমনি থাকে এক বিশাল দেশকালের প্রেক্ষাপট। সেই দেশকালের প্রেক্ষাপটে সাঁওতালদের দেশান্তর যাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকদের জীবনদর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে। লেখক যখন বিশেষ কোনো ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত মানুষের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেন তখন সেই ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর অবস্থিত মানুষের অতীত পরিচয় অন্বেষণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। মানুষের অতীত পরিচয়ে লুকিয়ে রয়েছে স্থানান্তরিত আত্মকথাতে। যে আত্মকথার মূলে রয়েছে সাঁওতাল সমাজের ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের পরিচয় প্রমাণ করে সাঁওতাল জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের ভূখণ্ডের চিত্র নানা ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রভৃতি স্থানে বসবাসকারী সাঁওতাল জাতির

পরিচয় পাওয়া যায়। যা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে উঠে আসা সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার চিত্র ইতিহাসের ক্রমানুসারে আলোকপাত করা হয়েছে। যে ইতিহাসের মূলে রয়েছে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন, দাঙ্গা ও যুদ্ধ, অর্থাৎ 'মাইগ্রেশনে'র অন্যতম দিক হলো আন্দোলন, যার ফলে মানুষ ছন্নছাড়া হয়। ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীরাও নানা সময়ে নানা স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছে। যা আদিবাসী বিদ্রোহ হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত যে সমস্ত নিম্নশ্রেণির মানুষ এবং অশিক্ষিত বর্বর আদিবাসী মানুষের দল বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে তাদের সকল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হওয়ার পরেও এধরনের আদিবাসী বিদ্রোহের গুরুত্ব রয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাবা তিলকা মাঝি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫০ সালে বিহারের সুলতানগঞ্জে বাবা তিলকা মাঝির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সুন্দ্রা মুর্মু। তিলকা বেড়ে উঠেছেন পাহাড়-জঙ্গলের পরিবেশে, জঙ্গলের পশুপাখি তাঁর কাছে খুব পরিচিত। তিলকার যখন পনেরো বছর বয়স, তখন ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে। সেই সময় ইংরেজ সরকার সাধারণ কৃষকদের উপর জোর-জুলুম করে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। পাহাড়-জঙ্গলের মানুষের সর্বস্ব অধিকার ছিনিয়ে নেয় ইংরেজ সরকার। বাধ্য হয়ে তিলকা মাঝি বিদ্রোহ করেন তাদের বিরুদ্ধে। ভারতের ভাগলপুর ও বিহার অঞ্চলের মহান নেতা হিসাবে এখনো তিনি-ই পরিচিত। ১৭৮৪ সালের ১৩ই জানুয়ারিতে তিলকা মাঝি তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল অগাস্টাস ক্লীভল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। লড়াইয়ে ক্লীভল্যান্ড সাহেব পরাজিত হন। তিনি মারা যাওয়ার পর ইংরেজ সরকার বাবা তিলকা মাঝির বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। সরকারের সৈন্য তাঁকে গ্রেপ্তার

করার চেষ্টা করলেও তিনি পালিয়ে যান সুলতানগঞ্জ পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানে উভয়পক্ষের গরিলা যুদ্ধ চলে বহুদিন যাবৎ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন বাবা তিলকা মাঝি। ইংরেজ সরকার তাঁকে ফাঁসি দেয়। তিলকার বিদ্রোহ পরবর্তী আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে প্রভাবিত করেছে। বাবা তিলকা মাঝির লড়াই ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

বাবা তিলকা মাঝির লড়াইকে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবী 'শালগিরার ডাকে'(১৯৮২) উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসের ঘটনাকাল শুরু হয়েছে ১৭৫০ সাল থেকে। এই সময়ে পাহাড়-পার্বত্য অঞ্চলের সীমারেখা বিস্তৃত ছিল। ভাগলপুর থেকে রাজমহল এলাকায় প্রান্তর, ঘন জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড়ে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়াদের বসবাস। ভারতের প্রাচীন অরণ্যভূমির ইতিহাসে বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী ভাগীরথী, তার পশ্চিমে রাজমহলের জঙ্গল এলাকা, ওদিকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের অবধি– উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিণে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ অবধি। আদিবাসীরা জমিতে চাষ করে কিন্তু জমির উপরে যে একটা আইন আছে, তা সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়ারা খোঁজ খবর রাখত না। সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের জীবিকা নির্ভর করে আছে ভাগলপুর অঞ্চলের পাহাড়-জঙ্গল এলাকার জমি-জায়গায়। সাঁওতালরা জঙ্গল কেটে 'জমি হাসিল' করে আর পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ করে। কিন্তু দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। চাষীদের কড়া হারে কর আদায় করে ইংরেজ সরকার। কর না দেওয়ার কারণে জমিদাররা সাঁওতাল জাতিকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে। এর ফলে সাঁওতালরা জন্মভিটা থেকে পালিয়ে যায় ভিন্ন দেশে। দেশের মানুষ যাতে দেশেই থাকে তার জন্য বাবা তিলকা মাঝি আন্দোলন গড়ে তুলেছিল রাজস্ব আদায়কারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। এই সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন- ''শালগিরার ডাকে' তবু লিখেছিলাম, তিলকা মাঝিকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম, সেটুকুই মনে করি। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তিলকা মাঝির নামে।...ভাগলপুরে

আদ্যিকাল থেকে তিলকা মাঝি চৌক, বাজার, স্মৃতিস্তম্ভ, এসব আছে। ‘শালগিরার ডাকে’, ঔচিত্য বোধে লিখি।’[১২]

‘শালগিরার ডাকে’ উপন্যাসে দেখা যায় ১৭৭৪ সালে বানবন্যায় আদিবাসীদের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়। তখন বহু সাঁওতাল ছন্নছাড়া হয়। ছন্নছাড়া সাঁওতালরা তিলকা মাঝির ঘরে আশ্রয় নেয়। সেই সঙ্গে অন্যের ছেলেমেয়েরাও তিলকার সন্তান হয়ে উঠে। বন্যা ও কাজের অভাবে সাঁওতালরা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। বান-বন্যা হওয়ার আগে ওয়ারেন হেস্টিংস ফৌজ ও বাহিনীকে গ্রামের মধ্যে আক্রমণ করার আদেশ দেন। গ্রামে গ্রামে পুলিশ আর হাতে হাতে বন্দুক। ফৌজ বাহিনীরা সাঁওতাল মেয়ে-ছেলে-বাচ্চা-বুড়া যাকেই পায় তাকেই গুলি করে মেরে ফেলে। কোম্পানি বাহিনীর অত্যাচারে সাঁওতাল গ্রাম ছন্নছাড়া হয়ে যায়। তখন তারা পালিয়ে যায় পূর্ণিয়া, চম্পায়ন, সিংভূম, ধানবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, কয়লা খাদান প্রভৃতি স্থানে। ইংরেজের আতঙ্কে সাঁওতালরা যেখানে-সেখানে পালাতে থাকে। তাদের দলবদ্ধ জীবনসংগ্রাম তছনছ হতে থাকে। ইংরেজদের অত্যাচারে ছন্নছাড়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা ভাগলপুর ও রাজমহল অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাবা তিলকা মাঝির লড়াইয়ের পরে উনিশ শতকের মধ্যগগনে সাঁওতালরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় বিদ্রোহ করেছিল। ‘দামিন-ই-কো’ অঞ্চলের সাঁওতাল জাতির জীবন ছিল কৃষিনির্ভর। তারা ছোটোনাগপুর, ভাগলপুর, পালামৌ, সিংভূম, মানভূম, বীরভূম-প্রভৃতি স্থানে জমি হাসিল করে বসতি স্থাপন করে। অরণ্যভূমিতে আদিবাসী সাঁওতালরা জমি চাষকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে থাকে। সেই ‘দামিন-ই-কো’ অঞ্চলে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীরা প্রবেশ করে। ব্যবসায়ী ‘দিকু’রা নিরক্ষর সাঁওতালদের প্রতারণা করে। ব্যাপারীরা কেনারাম ও বেচারাম দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে। খরা-আকাল সময় ‘দিকু’রা চড়া হারে সাঁওতালদের সুদ দিত। নিরক্ষর জাতিকে টিপ সই করিয়ে

ব্যবসায়ীরা বেশি টাকার অঙ্ক বসিয়ে দিত। এইভাবেই সাঁওতালরা ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে গোলামে পরিণত হয়। তাদের জমি-জায়গা, ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত কিছু ব্যবসায়ীরা দখল করে নেয়। ব্যবসায়ীরা জোতদার-জমিদার হয়ে উঠে। তখন তারা সাঁওতালদের 'বেগার' খাটাত। সাঁওতালরা বংশানুক্রমিক 'বেগার' খাটতে থাকে কিন্তু ঋণ আর শোধ করতে পারে না। সেই সঙ্গে সাঁওতাল নারীদের উপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। ফলে সাঁওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠে। নানা স্থানে বিপর্যস্ত সময়ে ভগনাডিহির চুনা মুর্মুর ষাট বিঘা জমি জোতদার-জমিদারের হাতে চলে যায়। চুনা মুর্মুর চার ছেলে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব জোতদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। সিধু ভগনাডিহি গ্রামে সকল সাঁওতাল জাতিকে 'শাল ডালের গিরা' ডাকে 'হুলে'র আহ্বান করে। ৩০ শে জুন, ১৮৫৫ সালে ভগনাডিহির মহাসভাতে বহু দূর দূর থেকে হাজার হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক নিয়ে হাজির হয়। সেই দিন থেকেই 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত লাভ করে। তারা সেখান থেকে জোতদার-জমিদারকে হত্যা করতে শুরু করে। বারহেট বাজারের মহেশ দারোগাকে তারা নির্ম্মমভাবে হত্যা করে। সিউড়ি, রাজনগর, রামপুরহাট, নলহাটি, রাজমহল, ভাগলপুর, পাকুড়, মুর্শিদাবাদ- প্রভৃতি স্থানে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। জোতদার, জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা লাগাতার লড়াই করে। বিদ্রোহ দমনের জন্যে ইংরেজ সরকার সেনা বাহিনী নিয়োগ করে। আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আদিম অস্ত্রের লড়াই পরাজিত হয়। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয়। প্রায় বিশ-তিরিশ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। সিধুর ফাঁসি হয়েছিল বারহেট বাজারে। আর ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সালে ভগনাডিহি গ্রামে কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব পরবর্তী ভারতের বিদ্রোহীগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ভারতের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ এক গৌরবময় অধ্যায়। 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র পটভূমিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অরণ্য-

বহ্নি’(১৯৬৬) উপন্যাস রচনা করেছেন। তারাশঙ্কর বীরভূমের ভূমিপুত্র, তিনি দেখেছেন বীরভূমের নানা অঞ্চলে সাঁওতালরা বসবাস করে। সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন-

> ইতিহাস পড়ে একটি আদিম উন্নত জাতির বর্বর অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছু পাইনি। ভুলে যেতেই চেয়েছিলাম। এরা আজ নানা স্থানে এসে আমাদের সঙ্গে মিশেছে, গ্রামপ্রান্তে ঘর গড়েছে। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন অনেক হয়েছে। পুরুষ নারীর চরিত্র বদলেছে। এদের সঙ্গে মিশেছি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এরা আজও সরল আছে। তবু সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা মনে পড়লে সরে পিছিয়ে এসেছি খানিকটা।[১৩]

পার্বত্য অঞ্চলের ছোট ছোট ঘর বাড়ি মাটির দেওয়ালের আশেপাশে বিশাল বিশাল শালবন এবং লালমাটি। শালজঙ্গলের ভিতরে সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার অবস্থিত সাঁওতাল জীবনের ছবি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছেন। যে অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল সেই অঞ্চলের নানা স্থান তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার মনে পড়েছে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ সম্পর্কে নানা গল্প ও স্মৃতিকথা। তারাশঙ্কর বাল্যকালে তাঁর পিসিমার কাছে গল্প শুনেছেন। তিনি জানিয়েছেন- ‘সাঁওতাল হাঙ্গামার বিবরণ বাল্যবয়সে আমি শুনেছি আমার পিসিমার কাছে। আমার বাবার মামার বাড়ি সিউড়ির উত্তরে ময়ূরাক্ষীর ওপারে কানা ময়ূরাক্ষীর একেবারে উপরে, মহলপুর গ্রামে। পিসিমা আমার বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত পঁচানব্বুইয়ের কাছাকাছি।’[১৪] তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম যৌবনে বীরভূমের গোউরবের ভাণ্ডারী ঐতিহাসিক সিউড়ির শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগ্রহশালায় ‘সাঁওতাল বিদ্রোহে’র পাঁচালী বা ছড়া পড়েছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নে নায়ক সিধুকে দেখেছিলেন। স্বপ্নে সিধুর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা হয়। স্বপ্নভঙ্গের পরেও বহু বছর ধরে তিনি সিধুর স্বপ্নকে ভুলতে পারেননি। তারাশঙ্কর গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে সাঁওতাল বিদ্রোহের নানা তথ্য জোগাড় করেছেন। দুমকা থেকে পাকুড়-সাহেবগঞ্জ, কুলকুড়ি গ্রাম থেকে মামুদবাজার, সেখান থেকে আবদারপুরের প্রবীণ

নাগরিক ধ্বজু মল্লিকের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে তিনি হিরণপুরের হাটের রামচন্দ্রপুরে যান। রামচন্দ্রপুর থেকে চরণপুরে চলে যান, সেখানেই তারাশঙ্করের সঙ্গে নয়নপালের পরিচয় হয়। নয়ন পালের পট বর্ণনানুসারে তারাশঙ্কর সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। মধ্যযুগের কাব্যরীতিতে আধুনিক যুগের উপন্যাস উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘সমাচার সুধাবর্ষণ’, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’, ‘বেঙ্গল হরকরা’, ‘মর্নিং ক্রনিকাল’, ‘হিন্দু ইন্টেলিজন্সর’, ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’- ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রে উঠে আসা সাঁওতাল বিদ্রোহের তথ্যকে সংগ্রহ করে তিনি ‘অরণ্য-বহ্নি’ উপন্যাস রচনা করেছেন।

‘অরণ্য-বহ্নি’ উপন্যাসের স্থানকালে রয়েছে উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর ও গোটা সাঁওতাল পরগণা ও দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। এই উপন্যাসে দেখা যায় জোতদার ও জমিদারেরা অর্থনৈতিকভাবে সাঁওতালদের অত্যাচার করে। অশিক্ষিত সাঁওতাল কেনারাম-বেচারাম দাঁড়িপাল্লার রাজনীতি বুঝতে পারে না। জোতদার-জমিদারদের সুদের পরিমাণ সাঁওতালরা বংশ পরম্পরাগত ভাবে শোধ করতে থাকে। সাঁওতালরা পাহাড়-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করে, সেই চাষযোগ্য জমির উপরে ইংরেজ সরকারের লোভ। ফলে অসহায় চাষীদের উপরে অমানবিক কর প্রয়োগ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এর ফলে সাঁওতালরা একই স্থানে বেশি থাকতে পারেনি। তারা বারে বারে স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। যার কারণে তাদের বিশ্বাস ও বোঙ্গাবুরু, নাচ-গান ও উৎসব- অনুষ্ঠান সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয় সাঁওতালদের আর্থিক সংকট ও জাতিগত সংকট একাকার হয়ে যায়। সাঁওতাল জাতির অস্তিত্বের সংকট প্রখর হয়ে উঠে দেশান্তর যাত্রায়।

‘সাঁওতাল বিদ্রোহে’র সময় সাঁওতাল জাতির মাইগ্রেশনের নানা দিক তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী, তাঁর ‘সিধু কানুর ডাকে’ (১৯৮১) উপন্যাসে দেখা যায় দিকু জমিদার, মহাজন,

পেয়াদা-গোমস্তা, কোম্পানি সরকারের পুলিশের অত্যাচারে সাঁওতাল জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। সাঁওতাল যোদ্ধা বীর সিধু কানুর নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সাঁওতাল পরগণার ভগনাডিহি গ্রামে হাজার হাজার সাঁওতাল জমা হয়েছিল।[১৫] এই যুদ্ধে সামিল হয়েছিল মাইগ্রেডেট সাঁওতালরাও। যারা কাজের জন্য বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, মানভূম থেকে সাঁওতালরা এসেছে যুদ্ধ করার জন্য। শুধু দামিন-ই নয়, মানভূম, হাজারীবাগ, মালদা, পূর্ণিয়া, বর্ধমান, রানীগঞ্জ- সব স্থান থেকে সাঁওতালরা ফিরে এসেছিল যুদ্ধ করার জন্য।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের ভাগলপুরের বিদ্রোহের পর থেকে সাঁওতালরা আরও ছড়িয়ে পড়ে। ভগনাডিহি অঞ্চল ঘিরে আগুন ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে ধ্বংস ও গণ্যহত্যা হয়েছে। ছন্নছাড়া সাঁওতালরা নিজেদেরকে খুঁজে বেড়ায়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মঙ্গল ও বিশালী, তারা চন্দননালার পশ্চিম দিকে আশ্রয় নিয়েছিল সাঁওতাল গ্রামে। তাদের সঙ্গে হাড়মা মাঝি ছিল। সে ক্লান্ত হয়ে যায়। বহু দিন যাবৎ অনাহারে ছিল হাড়মা। হাড়মাদের জীবনসংগ্রাম শেষ হয় এই সময় পর্বে। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহের সময় বহু সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস হয়েছিল। এর ফলে রাজমহল, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর- অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা বহু দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছোটোনাগপুর মালভূমির 'হড়-মিতান' সামাজিক বিভিন্ন আদিবাসীরা দেশান্তরী হয়েছিল উত্তরবঙ্গ ও আসামে। ১৮৭১ সালে ইংরেজের চাপে আদিবাসীরা আসামে যায়। ১৮৯১ সালে আরও বেড়ে গেল সংখ্যাটা। আবার বহু মানুষ সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে, নদীয়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও যশোরেরে নীলকুঠি ও জমিদারদের পতিত জমি উদ্ধারের কাজে গিয়েছিল। দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময় বহু আদিবাসী মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে জমি বিনিময় করে জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, মালদা, আসাম, গোয়ালপাড়া, লখীমপুর ও কাছাড়, দরং,

ডিব্রুগড়- উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে পালিয়ে গিয়েছিল। ছোটোনাগপুর থেকে আসা যে সমস্ত আদিবাসীরা ছিল, তারা পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছোটোনাগপুরের মানুষ এই উত্তরবঙ্গে এসেও অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে অগ্রণ্য খঁচাকাঁন্দর গ্রামের জিতু সাঁওতাল, রাজশাহীর নগেন্দ্র মাহাতো, ভূষণ মাহাতো, সুরবালী মাহাতো প্রমুখ।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের দেশান্তরযাত্রার ছবি অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত কেওড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয় ১৯৪৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই তিনি কলকাতাতে আসেন। তিনি নানা স্থানে পড়াশোনা করেন, পড়াশোনা করতে করতে চাকরি করেছেন। তিনি কলকাতা থেকে নানা জেলাতে ঘুরেছেন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃজনশীল রচনার অনুপ্রেরণা। সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যমূলক ও বুদ্ধিমার্জিত প্রয়োগকৌশলই তাঁর আখ্যান ভুবন, নিয়মিত গবেষণামূলক চিন্তাই তাঁর গল্পবলার কথনশক্তি। অভিজিৎ সেন আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো 'অন্ধকারের নদী'(১৯৮৮), 'ছায়ার পাখি'(১৯৯৩), 'আধাঁর মহিষ'(১৯৯৩), 'হলুদ রঙের সূর্য' (১৯৯৬), 'মেঘের নদী' (২০০৭)- ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর 'ব্রাক্ষণ্য ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯৫), 'অভিজিৎ সেনের শ্রেষ্ঠ গল্প'(২০০৫), 'অভিজিৎ সেনের দশটি গল্প(২০০৮)– প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ আছে। তবে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়'(১৯৮৫)। 'রহু চণ্ডালের হাড়' তাঁর প্রথম উপন্যাস ১৯৯২ সালে 'Magic Bones' নামে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসের জন্যে তিনি 'বঙ্কিম' এবং 'শরৎস্মৃতি' পুরস্কার পান। যখন তিনি কলকাতা ছেড়ে বালুরঘাটে চলে যান, তখন 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসে শুধুমাত্র যাযাবরদের জীবনসংগ্রাম নয়, বাজিকর গোষ্ঠীর একশো দেড়শো

বছরের ঘোরাফেরার আখ্যান। বিস্তৃত অঞ্চলের সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ও সময়ের ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড দিক আবিষ্ট হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বালুরঘাট মহকুমার তপন থানায় চাকরির সূত্রে ছিলেন, এই সময় বাজিকরদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের সঙ্গে গভীরে মেলামেশা শুরু করেন ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে, বেশ কয়েক বছর কাছ থেকে দেখার পুঁজি সম্বল করে তিনি 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাস লেখা শুরু করেন। যাযাবর গোষ্ঠী বাজিকর জাতির জীবনসংগ্রাম উপস্থাপন করতে গিয়ে সাঁওতালদের প্রসঙ্গ এসেছে। ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন ছন্নছাড়া সাঁওতালদের ইতিহাস অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে সাঁওতালরা কোথা থেকে, কীভাবে এবং কী কারণে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে- তারই ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। সাঁওতালদের ইতিহাসে লক্ষ করা যায়, সাঁওতালরা ছোটোনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল পরগণায় বসবাস করত। ১৭৮৪ সালে বাবা তিলকা মাঝি তার দলবল নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই করেছিল। লড়াই করতে করতে সাঁওতালরা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। তবে এই ছন্নছাড়া, সাঁওতাল পরগণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যখন ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়, তখন থেকেই সাঁওতালরা ছন্নছাড়া হতে থাকে। ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, সুন্দরবন– আরও নানা স্থানে সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ে। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে উল্লেখিত উত্তরবঙ্গের মালদা ও দুই দিনাজপুরে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের বৃত্তান্ত। সাঁওতাল ও বাজিকর– দুই হলো নিম্নশ্রেণির জাতি। যাযাবর, অসহায়, গরিব, দুখি মানুষের মেলবন্ধনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে।

উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার চিত্র তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখনীতে আদিবাসী জীবনের সূত্রপাত ঘটে ভ্রমণমূলক অভিজ্ঞতা থেকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনের

নানা রূপরেখা লিপিবদ্ধ হয়েছে ডায়রি ও দিনলিপিতে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানুষের জটিল সমস্যা ও প্রকৃতি অনুভূতির সামগ্রিক জীবনবোধে। তিনি প্রকৃতিকে মুগ্ধময় দৃষ্টিভঙ্গিতে বারবার অনুভব করছেন এবং সেই সত্যানুভবে সঞ্চিত হয়েছে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত আদিবাসী জীবন। তাঁর ডায়রি, দিনলিপি ও ভ্রমণকাহিনিতে মানুষের অধিক প্রকৃতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়-

> প্রকৃতি-চেতনার যে অপার্থিব আলোয় তাঁর পথের পাঁচালী, আরণ্যকের মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি উদ্ভাসিত, ছোটগল্পে তাঁর প্রকাশ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মানুষের পরিচয় নিশ্চয় নগণ্য নয়, সর্ববিধ রচনাতেই তাঁর মানুষের প্রতি অপরিমেয় মমত্ববোধ ছবিটি গাঢ় রঙ্গে আঁকা, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কয়েকটি উপন্যাসে দেখি মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত এক সামগ্রিক রূপ। কিন্তু ছোটগল্পে প্রকৃতি প্রায়শই অনুপস্থিত, সেখানে আছে কেবল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, মানুষের- একান্তভাবে মানুষেরই 'মানবিক' পরিচয় সন্ধান সেখানে লেখকের অন্বিষ্ট।[১৬]

আদিবাসী জীবনের নানা ঘটনা তাঁর 'হে অরণ্য কথা কও'(১৯৪৮) দিনলিপিতে সংগৃহীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধলভূমগড়, সিংভূম, ঘাটশিলা অরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই সমস্ত প্রান্তিক অঞ্চলে তিনি লক্ষ্য করেছেন ধনুর্ধর বাস্কের মতো বহু সাঁওতাল স্কুল জীবনে পাড়ি দেয়। এদের শিক্ষা জীবনের চিত্র 'হে অরণ্য কথা কও'(১৯৪৮) দিনলিপিতে উল্লেখিত- 'ডাকবাংলোর চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলজট এনে দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারী স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, সুতরাং শাড়ি-ব্লাউজ পরে। সামান্য একটু ইংরেজিও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে, অনেকেই রাঁচি মিশনারি ফেরত।'[১৭] তিনি দেখেছেন আদিবাসীদের দারিদ্রতা, সেই নির্মম জীবন থেকে মুক্ত পেতে আদিবাসীরা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। সাঁওতালদের জীবনে একমুঠো ভাতের সঙ্গে তরকারি নয়, বরং অল্প নুন হলেই যথেষ্ট। 'হে অরণ্য কথা কও'(১৯৪৮) দিনলিপির স্মৃতি সঞ্চিত হয়েছে

‘কালচিতি’ গল্পে। স্বাধীনতা সমসাময়িক ও তার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রামের দলিল ‘কালচিতি’ গল্প। গল্পটি যুগান্তর পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ‘কালচিতি’ গল্পের গ্রামের নাম কালচিতি। সারোয়া পাহাড় পেরিয়ে কালচিতি গ্রাম পাওয়া যায়। সারোয়া পাহাড় থেকে টাটানগর ডালমা পাহাড় দেখা যায়। জামসেদপুর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টাটানগর পাহাড়। গল্পকথক জানিয়েছেন, তিনি যে স্থানে আছেন তার থেকে দশ মাইল দূরে কালচিতি গ্রাম। গল্পে টাটানগর, ডিবুডুংরি ও সারোয়া পাহাড়ের মতো প্রান্তিক এলায়ায় সাঁওতালদের বসতি। সভ্য সমাজ থেকে বহু দূরের পাহাড়ে এদের জীবন অতিবাহিত হয়।

বিভূতিভূষণের জীবন অতিবাহিত হয়েছে ভ্রমণে, তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সবসময় রোমান্টিক হয়ে ওঠেনি। তিনি দেখেছেন বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত বাঘ-ভাল্লুক-হাতি-সাপ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা আদিবাসী গ্রামগুলিতে। ফলত বেঁচে থাকার জন্যে আদিবাসীরা তীর-ধনুক দিয়ে বন্যপশুদের সঙ্গে লড়াই করে। নিত্যদিনের জীবনে আদিবাসীরা মাঝে মাঝে জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলে হিংস্র পশুর অত্যাচারে। বিভূতিভূষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল মাগডু গ্রামে, সেই গ্রামের বাসিন্দা লাঘন মাঝির একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায় ভাল্লুকের আক্রমণে। তারই বহিঃপ্রকাশ ‘শিকারী’ গল্পের মাগনিরাম চরিত্র। ‘শিকারী’ গল্প ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পের পটভূমি দেশের প্রান্তিক এলাকার শঙ্খনদী, মহানদী এবং শৈলমালা, মহাডাল, কাটচুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়চুরি ও চুকুরদি পাহাড়। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে পশুর উপদ্রব যেমন রয়েছে তেমন আর্থিক সংকটও আছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আদিবাসীরা সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করার পরেও তাদের অর্থনৈতিক দিক উন্নতি হয়নি। অরণ্যপ্রদেশে অবস্থিত সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থার করুণ পরিণতির স্বরূপ ‘শিকারী’ গল্প। বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করেছেন- ‘এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই

ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের।’[১৮] তিনি তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনাগুলিকে গল্পের ভিত্তিভূমিতে সাজিয়ে তুলেছেন।

স্বাধীনতার মধ্যকালীন সময়কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে সাঁওতালদের দেশান্তরের সমস্যা ও সংকট নানাভাবে এসেছে। ‘জয়যাত্রা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কমল মাঝির গল্প’ (১৯৫৬) এর পটভূমি শান্তিনিকেতনের আশেপাশের লালমাটির গ্রাম কালকেপুর ডাঙ্গা। বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের আশেপাশের অঞ্চলে সাঁওতালদের সমস্যা ও সংকটে পরিস্থিতি বেশ জটিল। গল্পের ঘটনাকাল ১৯৩১ সাল। সেই সময় তিনি সাহিত্য ও দেশসেবায় ব্যস্ত ছিলেন। তারাশঙ্কর যখন জেল থেকে ছাড়া পান, তখন কমল মাঝি নামে একজন সাঁওতাল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কমলের সঙ্গে তারাশঙ্করের পরিচয় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স থেকে। গল্প রচনার সময় কমল মাঝির বয়স নব্বই-এর মতো, অর্থাৎ কমলের মৃত্যুকাল। কমল মাঝি প্রায় সত্তর বছর বসবাস করেছে কালকেতু গ্রামে। অর্থাৎ সত্তর বছর আগে থেকেই সাঁওতালরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। জীবিকার আশায় তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল। এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সাঁওতালরা সমাজ ও সংস্কৃতি ধারা তারা বজায় রাখতে চায়। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সমাজের ধারাকে তারা রক্ষা করতে পারে না। রক্ষা করতে পারে না সাঁওতাল সমাজের সাংগঠনিক প্রণালী, অথচ সাঁওতাল সমাজে তার গুরুত্ব অপরিসীম। ফলত সাঁওতাল সমাজের আদিপ্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির চিত্র সংকটের মুখে। দেশান্তর যাত্রার কারণেই তারা তাদের অতীত ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে পারে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি প্রেমের গল্প’ পূজা সংখ্যার ‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। বীরভূমের পটভূমিতে গল্পের সময়কাল ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৬ সালে গল্প কথকের ভাই কংগ্রেসী লিডার ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পর

রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেল ও রাইস মিলের নানা কাজ করিয়েছেন সাঁওতাল শ্রমিকের মাধ্যমে। সাঁওতালদের নতুন গ্রামে রাস্তা-ঘাটের সমস্যা তিনি সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। সাঁওতাল মানুষের সঙ্গে তার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ বাঙালি ও সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যে মেলবন্ধনের চিত্র পাওয়া যায়। সাঁওতাল সমাজের নিয়ম-কানুন বিধির বিধান সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি বিধান দিয়েছেন যে সাঁওতাল সমাজের নারীকে মানসিক আঘাত যাতে না দেওয়া হয়। তারা গোষ্ঠীজীবনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে চায়। সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন সুখের হলেও আর্থিক দিক দিয়ে তারা খুবই দুর্বল। এই গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র ফুলমণি। অসহায় ও দরিদ্র ফুলমণি বেঁচে থাকার জন্য তাকে পুরুষের মতোই মাঠে-ঘাটে কলকারখানায় কাজ করতে হয়। ফুলমণিকে অর্থের জন্য নতুন পরিবেশে সংগ্রাম করতে হয়েছে বারে বারে। তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কাজ করতে হয়েছে। স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার সুখ পায়নি ফুলমণি। এই গল্পে এক অসহায় নারীর দেশান্তর যাত্রার ছবি অভিব্যক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে তারাশঙ্করের জীবনবোধ দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, তাঁর চিন্তার জগতে ধর্ম- বিশ্বাস ও যুক্তি বিচারের দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। তাঁর আত্মজীবনের নানা জিজ্ঞাসা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রে মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি মানুষের আদর্শ, বিশ্বাস, সংস্কার ও আবেগের সংঘর্ষের সত্যানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ‘সপ্তপদী’ উপন্যাসে ধর্ম চিন্তার বিবর্তন লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের মূলে আছে প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসী মনোভাবের সংশয়-দ্বন্দ্ব ও সংকটের দলিল। উপন্যাসের ঘটনাচক্রে ডাইনি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তারাশঙ্করের লেখনীতে ডাইনি প্রথাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের আখ্যান পাওয়া যায়। তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ‘ডাইনি’ গল্প। এছাড়া ছোটগল্প হিসেবে তাঁর 'ডাইনি' ও 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পও খুব পরিচিত।‘ডাইনি’ গল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও

তারাশঙ্করের একটা কথোপকথন পাওয়া যায় 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে। এক সমালোচকের মতে, তারাশঙ্কর তাঁর 'ডাইনি' গল্প নাকি ইউরোপ থেকে ধার করে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'দেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেশের পরিচয় কত সংকীর্ণ'। তাদের ধারণা ডাইনি মানেই ইউরোপ। কিন্তু দেশের মধ্যেই যে ডাইনি আছে, তা তারাশঙ্কর না পড়লে বোঝা যায় না। এই গল্প যে দেশের গল্প, তা স্বীকার করতেই হয়। 'সপ্তপদী' উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ ঘটনাকাল ১৯৩৬ সাল থেকে দুর্ভিক্ষ মহামারী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা উত্থান-পত্তনের সময় পেরিয়ে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত সাঁওতাল নারীর দেশান্তর যাত্রার চিত্র। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর কোল ঘেঁষে মেদিনীপুরের রাস্তা, যেখান থেকে পুরী যাওয়ার হাইরোড পাওয়া যায়, শালজঙ্গলের মাঝখানে গেরুয়া মাটির দেশে বীরাবতী-শিলাবতী-দ্বারকেশ্বর, বীরাই-শিলাই দ্বারকার মতো পাহাড়ি নদী অবস্থিত, উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য ভূমির প্রান্তভাগে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলের পাথুরে কাঁকুরে অঞ্চলের গোষ্ঠী মানুষের জীবনের মাঝে একখানি খ্রিস্টান মিশনারী। এই মিশনের পাগলা পাদরীর সাহায্যে সাঁওতাল নারী ঝুমকির জীবন বেঁচে যায়। অর্থাৎ ডাইনি সন্দেহে সাঁওতাল সমাজ থেকে ঝুমকিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অসহায় ঝুমকি বেঁচে থাকার জন্য পাগলা পাদরীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঝুমকি নিজের সমাজের মধ্যেই থাকতে চেয়েছে, কিন্তু সমাজের মানুষ তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভিটেমাটি ছেড়ে ঝুমকিকে পালিয়ে যেতে হয় অচেনা এক সংস্কৃতির জগতে। সেখানেই বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায় ঝুমকি।

সামাজিক বিন্যাস, গ্রামের গঠনগত দিক, বৃত্তি নির্ধারণ, বিবাহ ও অন্যান্য রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে সাঁওতাল সমাজ গঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার আসার পরেই সাঁওতাল সমাজের নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইংরেজের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল সাঁওতালদেরকে

ধর্মান্তরিত করা। বহু সাঁওতাল খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে সেই সমস্ত খ্রিস্টানরা তাদের আদিম সত্তা ভুলে যায় এবং আদিম রীতিনীতিকে তারা ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। সাঁওতাল সমাজের গ্রামের সাংগঠনিক, বিবাহ, আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে সাঁওতালদের জোট কিছুটা হলেও কমে আসে। জোটহীনতার সময়ে লড়াই ও মন্বন্তরের প্রভাবে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকট প্রখর হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের জন্য জন্মভিটা ত্যাগ করা সাঁওতাল জাতির চিত্র সুবোধ ঘোষ বারে বারে দেখিয়েছেন। ১৯০৯ সালে সুবোধ ঘোষের জন্ম হয় হারাজিবাগে। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল বহর গ্রাম, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ংকর বাস্তবতার প্রভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন তাঁর জীবনে বার বার ঘাত-প্রতিঘাত রূপে এসেছে। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে কাজের সন্ধানে দিন কাটাতেন। চাকরি করার সূত্রে তিনি হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, রাজগীর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন লক্ষ করেছেন এবং তাদের জীবনের কথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সময়ের পরিস্থিতিতে আদিবাসী জীবনের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-অবিশ্বাস শিকড়ের উপাদানই সুবোধ ঘোষের আখ্যান ভুবন। হাজারিবাগ অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের প্রতিক্রিয়া ‘শতকিয়া’(১৯৫৮) উপন্যাসে পাওয়া যায় মানভূম অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের সংস্কার, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। বন-জঙ্গলে অবস্থিত আদিবাসী জীবন ও পশু-পাখির জীবন একাকার হয়ে গেছে। যেখানে পশু-পাখি জন্তুজানোয়ার মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে মানুষ ও পশু আলাদা নয়, বরং উভয়ই একে অপরের পরিপূরক। মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই জর্জরিত। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ধর্মীয় রাজনৈতিক বেড়াজালের ফাঁদ পাতানো হয়। এই ফাঁদের কারিগর খ্রিস্টান মিশনারি। মিশনারিদের আকর্ষণীয় লোভে শিকার হয় অসহায় ওঁরাও, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি

আদিবাসীরা। আদিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের উপর আঘাত হানে খ্রিস্টান মিশনারিরা। মিশনারিদের কাছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে অত্যাচারিত হয়। বাবুরবাজার, গোবিন্দপুর, মানপুর, হারানগঞ্জ অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা খুব শোচনীয়। প্রান্ত এলাকাতেও মিশনারিরা ধর্ম প্রচার করতে থাকে সাধারণ মানুষকে অর্থের লোভ দেখিয়ে। অথচ তার বিপরীতে কানারানী, ডরানীরস্রোত, কপালবাবার থান, করমটি নাচ মতো বহু বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত মধুকপি অঞ্চল। তৎকালীন রাজনৈতিক সন্ত্রাস আদিবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। মিশনারিদের অত্যাচারে তাদের সামাজিক জীবনের কাঠামো বদল হতে থাকে। তারা অবহেলা করতে থাকে 'বোঙ্গা' বুরুর বিশ্বাসকে। তারা নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে তারা নিজেদের জন্মস্থান ত্যাগ করেছে। এভাবেই ধর্মের কারণে সাঁওতালরা দেশান্তরিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ সেন্ট কলম্বাস স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। সেখানে তিনি গবেষক ও দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষকে পেয়েছিলেন। তাঁর যখন মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তিনি কলকাতাতে আসেন ১৯৪০ সালে, তার পর একবারও হাজারিবাগ ফিরে যাননি। হাজারিবাগের জঙ্গল থেকে মহানগর অনেক দূরে, কলকাতাতে বসে তিনি স্মৃতিচারণ করেন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে। ভারতের আদিবাসী সমাজের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পের তাৎপর্য্য গভীরতর। গল্পে দেখা যায় একদিকে সিরিল টিগগা, ইম্যানুয়েল খালকো, জন বেসরা, রিচার্ড টুডু এবং ষ্টীফান হেরোর মতো কুচকুচে কালো চেহারার ওঁরাও, মুণ্ডা ও সাঁওতাল ছেলেরা মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করত। আর অন্যদিকে বিহারি-বাঙালি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় উচ্চবংশজাত ছাত্র। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত শিক্ষক ছিলেন বৈজনাথ শর্মা। যার কাছ থেকে গল্পকথক অনেক শিক্ষার্জন করেছেন। মিশনারি পাদরীদের অত্যাচারে আদিবাসীদের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে উঠে।

ছন্নছাড়া সাঁওতালরা জমি হারিয়ে বিকল্প জীবিকা অনুসন্ধানের মতো অবস্থাতে ছিল না। হঠাৎ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা, এই রকম মানসিকতা তাদের তৈরি হয়নি। রেল লাইন তৈরি করার সময় বেশি টাকা দিয়েও কুলি মজুর হিসাবে কাজ করতে তাদের অনিচ্ছা। বরং তারা কম মজুরি দিয়ে নিজেদের ভূমিতেই কাজ করতে বেশি আগ্রহী ছিল। অভাব-অনটনের সময়ে, যখন অন্যান্য আদিবাসী কুলি মজুরি কাজে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়, তখন সাঁওতালরা নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে রাজি হয়নি। তবুও অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের কাছে তারা পরিজিত হয়। স্বভূমিকে বিদায় জানিয়ে জীবিকার্জনের জন্যে তারা ঝরিয়া ও রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে অ-স্থায়ী বাসিন্দা হলেও পরবর্তীতে তারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে। গ্রাম জীবন থেকে কয়লাখনির জীবনে রূপান্তরিত সাঁওতাল সমাজের চিত্র শ্রী কালীপদ ঘটক তাঁর 'অরণ্য-কুহেলী'(১৩৫৬) উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রমিক জীবন নিয়ে এই আখ্যান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায়।

এই উপন্যাসে পটভূমিকায় অবস্থিত ঘুসরুকাটা গ্রাম, তরুণী পাহাড়, হলদিগড় পাহাড়, হলদিগড় গ্রাম ও হলদিগড়ের ইতিহাস। ভালুকপোতার টুয়াই মাঝি বিরোধী দলনেতা হিসাবে উত্থান লাভ করে এবং পঞ্চগ্রামের সালিশী সভার বিচার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে উপন্যাসের পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে ধানবাদ এলাকার কলিয়ারি খাদানে পরিণত হয়। কলিয়ারির খাদান থেকে কাজোড়ার কয়লা কুঠি, সেখান থেকে চরণপুর খাদানের শ্রমিক জীবনের রূপরেখা। উপন্যাসের স্থানকাল চরণপুরের খাদান থেকে পাথরডি খাদানে স্থানান্তর হয়, সেখান থেকে আবার মূল স্থান রামপুর মৌজায় ফিরে আসে, শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে দায়রা জজের আদালতে।

দেশান্তরিত মানুষের আশ্রয় কলিয়ারি খাদান, এই খাদান অঞ্চলের সাঁওতাল জীবন নিয়ে ছোট ছোট গল্প রচনা করেছেন গল্পকার রমাপদ চৌধুরী, তিনি পূর্বমেদিনীপুরের খড়গপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন, ছোট থেকেই তাঁকে নানা স্থানে যেতে হয়েছে। তাঁর বাবা ভারতীয় রেলে চাকরি করতেন, সেই সূত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থান বার বার ত্যাগ করে নিত্যনতুন স্থানে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মালভূমি ও অরণ্য অঞ্চলের বিলাসপুর, ছত্রিশগড়, রামগড়, লাপরা প্রভৃতি স্থানে তিনি বারে বারে ভ্রমণ করেছেন। ছোট থেকেই তিনি আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যখন তিনি বড় হয়ে কাজের সূত্রে নানা স্থানে গিয়েছেন, সেখানেও সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। তাঁর অভিজ্ঞতার অভিনব উপস্থাপন প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্পে। লেখক জীবনের খ্যাতি অর্জনের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবনের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাস্তব জীবনের ঘটনা যখন তিনি ইতিহাস ও মিথ হিসাবে কল্পনা করতে শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁর ছোটগল্প অসাধারণত্বে পরিণত হয়ে ওঠে। সাঁওতালদের দেশান্তরের প্রেক্ষাপটকে বার বার তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। আধুনিক যুগের প্রভাবে আদিবাসী জীবনের প্রাচীনত্ব ধ্বংসের মুখে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাস ও মিথ লুপ্ত হওয়ার মুখে। দেশান্তরিত সাঁওতাল জগতের অস্তিস্ত্ব, মিথও পুরাণের ইতিহাস নিয়েই রমাপদ চৌধুরীর গল্পবিশ্ব। তাঁর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী'(১৩৫৯) গল্পে লাটুয়া ওঝার বসতি জঙ্গলে, এই বসতির মধ্যে চলতে থাকে সাঁওতালদের প্রাচীনকালের বিশ্বাস বাঁচানোর মিথ্যা প্রয়াস। বৃদ্ধ ওঝার সংসারে স্ত্রী ও কন্যা, তিনজনের জীবনে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা লেখক তাঁর আখ্যানবিশ্বে গড়ে তুলেছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প হলো 'রেবেকা সোরেনের কবর'(১৩৬০), কারানপুরা কালোয়ারি অঞ্চলের খাদান, এই অঞ্চলে বীরহড়, হো, ভুমি, খাড়িয়া ও সাঁওতাল

জাতির জীবনই এই গল্পের প্রেক্ষাপট। এই গল্পে রেবাকা সরেন সাঁওতাল সমাজ থেকে পালিয়ে যায় ভালোবাসার টানে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে তার প্রেমিকের কাছ থেকে ভালোবাসার মর্যাদা পায়নি। জন্মভিটে ত্যাগ করে রেবেকা রঙিন জীবনের আশায় ছিল, কিন্তু দেশান্তর হওয়ার পরেও সুখের জীবন পায়নি। রমাপদ চৌধুরী কোলিয়ারি অঞ্চলের একরামপুর থানা, ময়নাগড়, বরকাডিহি, সোনাডি ও সোনাতুলসীর মতো গ্রামের পটভূমিতে রচনা করেছেন 'ঝুমরা বিবির মেলা' ও 'নারীরত্ন'(১৩৬২)গল্প। এই দুই গল্পে দেশান্তরের ছবি বিশেষভাবে ফুটে উঠেনি।

স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে ছ'য়ের দশকে সাঁওতাল পরগণায় বেশ কিছু আধুনিক প্রকল্প চালু করেছিল ভারত সরকার। এধরনের প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী মানুষ যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে। মূলত আদিবাসীরা বসবাস করে শহর থেকে বহু দূরের কোনো এক নির্জন পরিবেশে। এইরকম পরিবেশে অবস্থিত সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার ছবি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তিনি বাঙালির মানসভূগোলকে নগর ও শহরের জীবন থেকে বহু দূরে নিয়ে গেলেন। সমসাময়িক লেখক থেকে তিনি অনেক আলাদা ছিলেন। ভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশে তিনি তাঁর 'পঞ্চতপা'(১৯৫৮) উপন্যাস রচনা করেছেন। যেখানে পাঠক নতুন করে উপন্যাসের স্বাদ অনুভব করে। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘটনা, শহরকেন্দ্রিক ও নাগরিক জীবনের ঘটনাকে এড়িয়ে পাহাড়ের কিনারায় অবস্থিত পাথর, নদী ও ড্যামের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একদিকে প্রাচীন সভ্যতা অবসানের যন্ত্রণা অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে জীবনের উত্থান-পত্তনের কাহিনি সাজিয়েছেন-

> শুকনো মড়াইয়ের খাতকে নিয়ে নতুন করে আর এক যজ্ঞ চলছে, বুলডোজার-ক্রাশার-ডিনামাইট-চার্নিং মেশিন- কংক্রিট মিক্সার- বাকেট-কেজ-ক্রেন-ব্লাস্টিং-

> সাইরেন-ট্রাক- আর কোয়ার্টারের পৃথিবী, এবং চিফ এঞ্জিনিয়ার-ড্রাফটসম্যান-ওভারসিয়ার-কুলিকামিনের নতুন জগৎ এই যজ্ঞের আয়োজক।[১৭]

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সাঁওতাল জাতির শান্তসরল মনোভাব ও স্বভাব যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তাদের প্রতিবাদ, লড়াকু মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। লেখক উপলব্ধি করেছেন যে পাহাড়ে অবস্থিত সাঁওতালের সঙ্গে বাঙালি ঘেঁষা সাঁওতালদের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বাঙালি জাতির সংস্পর্শে সাঁওতাল জাতির একতার ভাঙন চিত্র ফুটে উঠেছে 'মরা মড়াই' নদীকে কেন্দ্র করে। এই নদীতে ড্যাম তৈরির জন্য সাঁওতালদের নোটিশ দেওয়া হয় সরকার থেকে। তাতে সাঁওতালদের অন্য জায়গায় যেতে বলা হয়। বিনিময়ে সরকার থেকে ঘর বাড়ি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবুও নদীকেন্দ্রিক সাঁওতালরা তাদের ভিটে-মাটি থেকে সরে যেতে অনাগ্রহী। কারণ যুগ-যুগান্তর থেকে সাঁওতাল জনজাতিকে সভ্য মানুষরা অবহেলার চোখে দেখেছে, সেই জন্যই সভ্য সমাজ থেকে তারা বরাবর বঞ্চিত হয়েছে। সাঁওতালরা এই স্বাভাবিক সত্যকথা মেনে নিতে পারে না। কারণ জমিদারের কাছে তারা ক্রীতদাসের মতো খেটে মরে। ফলে মহাজনের কাছ থেকে বিনিময় প্রথার জন্য বেঁকে বসে। বিনিময় প্রথার একটা দিক ছিল মাতৃভূমি ত্যাগ করা। যেখানে তারা অস্তিত্ব সংকটে ভুগেছে, অর্থাৎ তাদের 'মারাং বুরু'-এর পূজা কোথায় হবে? তাই তারা অন্য স্থানে যেতে চায় না। অথচ সরকারের নোটিশে বাধ্য হয়ে তারা অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে। আর সাময়িকভাবে তারা সিধু-কানুর মতো গর্জে উঠে। তাতেও দেখা যায় তাদের একতার অভাব, লড়াই করার মানসিকতার পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা। এই আত্মসমর্পণ মানসিকতার মধ্যেও দেশান্তর যাত্রার প্রভাব পড়েছিল পাগল সর্দারের। পাগল সর্দারকে দেখেই সাঁওতাল সমাজ পুরাতন বসতিকে ছিন্ন করে নতুন সমাজ ও বসতি স্থাপন করে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাতের দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব। এই সময়পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয় নির্বাচনে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বাঙালির পাশাপাশি সাঁওতাল জনজাতিকে নিয়ে আখ্যান রচনার প্রবণতা বেড়ে উঠে। শহর থেকে বহু দূরের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত সাঁওতাল জাতির জীবন নিয়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতা শহরের চারজন যুবকের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে উপন্যাসের ঘটনা নির্মিত হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমি নির্মিত হয়েছে ছোটনাগপুরের 'পালামৌ' অঞ্চলের ধলভূমগড় স্টেশন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ধলভূমগড় অঞ্চলে অধিকাংশ স্থানীয় লোক আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাও। এছাড়া আধা-বিহারী, আধা-বাঙালি ও পাইকারিও থাকে। এই স্টেশনের পাশেই একখানি সাদা চকচকে বাংলো বাড়ি, সেই বাড়িতেই শহরের চার যুবকের আশ্রয় স্থান। যেখানে মাছ, দুধ পাওয়া যায় না। চারিদিকে অরণ্য ঘেরা অথচ জঙ্গলে হিংস্র জন্তুজানোয়ার নেই। এককালীন মিলিটারিদের আস্তানা ছিল এই জঙ্গলে। স্টেশনের আশেপাশে অসমাপ্ত স্কুল, ইটখোলা, শিবমন্দির ও মধ্যবিত্ত বাড়িঘর। ছোট্ট একটি শহরের চারপাশে গ্রাম আর গ্রাম। শহর থেকে বহুদূরের জঙ্গল, কলকাতার মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের বৈচিত্রময় জীবন আখ্যায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের দেশান্তর যাত্রা খুব বেশি ফুটে উঠেনি।

সত্তর দশকে নতুন আর্থ-সামাজিক দিক উঠে এসেছে জনসমাজে। তার কারণ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে সব থেকে বড় বিদ্রোহ হয়েছিল। যা আসলে নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল দার্জিলিং জেলার ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসি দেওয়া- প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলের শ্রমিকের উপর সরকার, বনেদি জোতদার ও চা বাগানের মালিকরা প্রায় একশো বছরের মত অত্যাচার করে এসেছে। ফলে সাধারণ কৃষক সমাজ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও

লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি করে। চারু মজুমদার ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান নেতা। ১৯৬৭ সালের ২৪শে মে কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়াংদি সঙ্গে করে নকশালবাড়ি থানার অফিসার এস. মুখার্জী, নারায়ণ চৌধুরী ও বি. ভট্টাচার্য হাজির হয়েছিলেন ঝড়ঝাড়ু জোতে। পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করতেই বুড়াগঞ্জ, আজমাবাদ, শিবদোল্লাজোত ও বিজয়নগর চা- বাগান থেকে হাজার হাজার লোক বেরিয়ে এসে পুলিশকে ঘেরাও করে।[২০] উত্তেজিত এক যুবক সোনাম ওয়াংদিকে বুকে তীর মারে। ইন্সপেক্টর পরে মারা যায় ও দুই পুলিশ অফিসার আহত হয়। পুলিশ পিছু হটে। ২৫ তারিখে যখন কৃষক সভা হয়, তখন আসাম-ফ্রন্টিয়ার-রাইফেলসের দল ভ্যান দাঁড় করিয়ে সভার উদ্দেশ্য করে গুলি চালায়, সঙ্গে সঙ্গে সাত জন মহিলা ও দুই জন শিশুসহ মোট ১১জন মারা যায়। সেই দিন থেকেই ইতিহাসের পাতায় লাল রক্ত লেখা হয়- 'নকশালবাড়ি আন্দোলন'।[২১] তারপরে নকশালবাড়ির গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক আন্দোলনের গতিমুখ শহর কলকাতাতে আছড়ে পড়ে। কলকাতার দেওয়ালে লেখা হয় –'তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি/ নকশালবাড়ি নকশালবাড়ি।'[২২] যাকে বলে গ্রাম থেকে শহর ঘেরা শুরু হয়। কৃষকদের সংগ্রামবদ্ধ অধিকারের লড়াই ব্যাপক আকার ধারণ করে। নকশালবাড়ি আন্দোলন পশিচবঙ্গের সমস্ত জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে আসাম-বিহার-ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাসহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সত্তর দশককে 'মুক্তির দশক' বলা হয়। জঙ্গল সাঁওতাল, শান্তি মুণ্ডা সহ বহু আদিবাসী নকশাল আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আদিবাসীরা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছে। সত্তর দশকে সাঁওতাল জীবন নিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবন কীভাবে শুরু হয়েছে তা তিনি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন-

> প্রত্যক্ষভাবে আমার মা আনোয়ারা বেগমকে বাল্যেই লেখালেখি করতে দেখেছি। তিনের দশক থেকেই কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মায়ের কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প বেরিয়েছে। ...কাজেই, বাল্যেই আমার মধ্যে লেখালেখির প্রবণতাটা সঞ্চারিত হয়েছিল।[২৩]

বলা যেতে পারে পারিবারিক সূত্র ধরেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহিত্যচর্চার আঙ্গিনায় এসেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুর গ্রামে। ছোট থেকেই তিনি খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতেন। যিনি বাঁশি বাজিয়ে গ্রামের পর গ্রাম মাতিয়ে রাখতেন। যখন তিনি আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন 'সিরাজ মাস্টার' নামেই খ্যাত ছিলেন। নাচ-গান ও অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস। রুদ্রদেবের মেলাকে কেন্দ্র করে তিনি 'নিশিলতা' উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব উন্মোচিত হয়েছে। শুধু অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নয়, তিনি মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলিমের বিরোধ এবং চাষী ও মহাজনের সংঘাতকে কেন্দ্র করে 'জানমারি' উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। তাঁর গ্রামের পাশে ছোট দ্বারকা নদীর জলাভূমির জঙ্গলকে নিয়ে তিনি 'তৃণভূমি' (১৯৭০) উপন্যাস রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক বন-জঙ্গলের সহজ সরলতাকে সাঁওতালদের মধ্যে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। উপন্যাসের পটভূমি উর্বর মাটির পাশে নদীর আববাহিকা অঞ্চল। এই নদীর উৎপত্তিস্থল বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্বারকেশ্বর নদীর উপকূল জঙ্গলে উড়ো জাহাজের ঘাঁটি বানানো হয়েছিল। কিন্তু উড়োজাহাজ আসার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তখন জঙ্গলের মধ্যে বাস্তহারা আদিবাসী মানুষ এসেছিল খাদ্যের সন্ধানে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'তৃণভূমি' উপন্যাসে লিখেছেন- 'এত বোকা আর গোঁইয়ার এই লোকগুলো। এরা কতটুকু। যে বিরাট শক্তির আবির্ভাবে আজ তৃণভূমি আসন্ন, পৃথিবীর আরণ্য-আদিম জীবনকে সেই শক্তিই সভ্যতা আর সমৃদ্ধির পথে বিকশিত করে তুলেছিল একদা-যুগ যুগ ধরে তার কাজ এই।'[২৪]

এসকল অশিক্ষিত মানুষের জীবনে আসে শিক্ষার আলো। মিশনারী ও বাঙালি মানুষের সংস্পর্শে সাঁওতালরাও শিক্ষার আলো খুঁজে পায়। তারাও জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসায় সম্মুখীন হয়। ফলত সত্তর দশকে বাংলার রাজনৈতিক উত্তাপ তাদের জীবনেও আছড়ে পড়ে। উত্তাল সময়ের রাজনীতিতে আদিবাসীরাও জড়িয়ে পড়ে। এই রাজনীতির মূলে রয়েছে জমি-জায়গা। জমি ছাড়া ব্যবস্যা-বাণিজ্য করা সাঁওতালদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা জমিকে হারাতে চায় না। জমিকে কেন্দ্র করেই তাদের লড়াই, সংগ্রাম ও আন্দোলন। রাজনীতির কারণেই তারা এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেনি।

নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর বহু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার শ্রমিক, দিন মজুরি মানুষের প্রেক্ষাপটে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’(১৯৭৭), ‘দ্রৌপদী’(১৯৭৭) ও ‘অক্লান্ত কৌরব’(১৯৮০) রচনার কেন্দ্রভূমি জাগুলা, বাকুলি, চরসা জঙ্গল, পলতাকুড়ি, কদমখুঞা, পিয়াসোল- প্রভৃতি গ্রাম। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ গল্প সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন- ‘’অগ্নিগর্ভ’ বইয়ের ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ (প্রথম কাহিনীটি) একটি প্রতীক বার বার এসেছে। উত্তেজনা বা প্রবল ক্রোধে বসাই টুডু বাতাসের গলা মোচড়াচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে হাত দুটি ঘোরায়। সমগ্র কাহিনিটির সূত্র ও ভিত্তিভূমি মৈত্রেয় ঘটকের প্রবন্ধ ‘এগ্রিকালচারাল মিনিমাম ওয়েজ্ ইন্ ওয়েস্ট বেঙ্গল।’[২৫] আর ‘অক্লান্ত কৌরব’ উপন্যাসও ‘অগ্নিগর্ভে’ সংকলিত, ১৯৮০ সালে শারদীয়া ‘পরিবর্তন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা নিয়েই ‘দ্রৌপদী’ গল্পটি। ১৯৭৭ সালে ‘দ্রৌপদী’ গল্প প্রকাশ পায় শারদীয়া ‘পরিচয়’ পত্রিকায়। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের ক্ষোভ, আন্দোলন ও বিদ্রোহের ঐতিহাসিক চরিত্র দ্রৌপদী। নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিহীন চাষি ও আধা জমির চাষি হিসাবে যাদের পরিচয়, তারা হলেন

মেদি, লেপচা, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। জমিদার-জোতদারের ‘আধিয়ার’ ব্যবস্থার দ্বারা ভূমিহীন মানুষ শোষিত হতে থাকে। চা বাগানের মালিকরা কৃষকদের অমানুষিক অত্যাচার ও জমি থেকে উচ্ছেদ করে। তার বিরুদ্ধেই কৃষক সমাজের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। নকশালবাড়ি থেকে এই বিদ্রোহের পথ চলা শুরু হলেও সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম ভারতে আদিবাসীদের বসবাস, যেখানে তাদের জীবন নির্ভর করে থাকে কৃষি কাজের উপরে। সেখানে ভূমিহীন কৃষক ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত শোষিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন যাবত। অনাহার ও দারিদ্র্যে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সত্তর দশকে এই সমস্যা ও সংগ্রাম প্রখর হয়ে উঠে। কাল ও দেশের প্রতীক হয়ে উঠে দ্রৌপদী চরিত্র। দ্রৌপদী আদিবাসী নকশাল কর্মী, সে বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়ায় কাজের সূত্রে ঘুরে বেড়াত। স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারেনি আদিবাসী প্রতিবাদী মানুষরা। তারা অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত ও সুবিধাভোগী মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গল্পের দ্রৌপদী চরিত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মী নয়, শোষণ জর্জরিত ভারতের অস্তিত্ব। তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শুধুমাত্র সত্তর দশকের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ নয়, শোষণের ইতিহাসে দ্রৌপদীর প্রতিবাদ সার্বজনীন হয়ে উঠে।

নকশাল আন্দোলনের মতো আর এক অন্যতম আন্দোলন হলো ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত, ১৯২০ সালে ছোটোনাগপুরে উন্নতি সমাজ গঠিত হয়। এই সমাজের লিডার ছিলেন রেব জোয়েল লাকড়া। আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই সমাজের কর্মসূচী গঠিত হয়। এতে বহু অ-আদিবাসী মানুষ যোগদান করে। **১৯৩১** সালে কিষাণ সভা ও উন্নতি সমাজের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ নির্বাচন পরিকল্পনা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। তখন উন্নতি সমাজের অ-আদিবাসী পাল দোয়াল সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ক্যাথলিক সভা গঠিত হয়, এতে বহু আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষ যোগদান করে। এর পরেই **১৯৩৮** সালে ছোটোনাগপুরে আদিবাসী মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সম্মেলনে ঠিক হয় যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের লড়াই ঘোষণা করে দিকু'দের বিরুদ্ধে এবং আলাদা ভাবে আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে। দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতি পদে নিযুক্ত হন জয়পাল সিং। তার পরে ২১শে জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে জামসেদপুরে বিরাট আদিবাসী মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়- 'Jamshedpur Adivasi Mahasabha decided that thought the sabha would not lose its identity. It will extend its membership to the non-Adivasi and non-Adivasis interest, the Mahasabha was named as the Jharkhand Party.'[২৬] 'ঝাড়খণ্ড পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন জাস্টিন রিচার্ড, ১৯৪৯ সালেই জয়পাল সিং সভাপতি পদে যোগদান করেন। এখান থেকেই শুরু হয় আঞ্চলিক রাজনীতির পথ চলা। ঝাড়খণ্ড পার্টির আন্দোলন জোরালো হতে থাকে- 'Under the aegis of this organisation a movement known as the Jharkhand movement was launched and the Party pursued purely political programmes. The main aim of the party was statehood for Jharkhand within the Union of India.'[২৭] স্বাধীন ভারতে প্রথম ইলেকশন হয় ১৯৫২ সালে। বিরুদ্ধী দল হিসাবে ঝাড়খণ্ড পার্টি পরিচিত লাভ করে। ঝাড়খণ্ড পার্টি ১৯৫৫ সালে লিখিত ভাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী করে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড পার্টির অশোচনীয় ভাবে পতন ঘটে। তারপরে লতিত কুজুর, প্রেম কুজুর, মোসেস গুড়িয়া এবং পিয়ুস লাকড়া মিলে 'বীরসাসভা দল' নামে নতুন একটি দল গঠন করে। ১৯৬৭ সালে 'বীরসাসভা দল' গঠনের জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন জয়পাল সিং। তারা মূলত ছাত্র সংঘঠনের মতো করে কাজ করত। ঠিক তার দু-বছর পরে 'Hul Jharkhand' দল ১৯৬৯ সালে সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূম মোট পাঁচটা সিট পায়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে 'Sonat Santhal Samaj'(১৯৬৯)- সাঁওতাল নেতা শিবু সরেন ও 'Shivaji Samaj'(১৯৬৭)– এর নেতা বিনোদ বিহারী মাহাতো

দুইজন মিলে 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা' নামে রাজনৈতিক পার্টি শুরু করে। মার্কসবাদ বিশ্বাসী A.K.Roy ছিলেন 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'- এর Coorination Committe. তিন জন মিলে পার্টি চালাতে থাকেন, এই ধরণের চিন্তা ধারায়– 'The Morcha combined in its operatious element of agirarain radicalism and cultural revivalism.'[২৮] তারপর বেশ কিছু বছর পেরিয়ে 'All Jharkhand Student's Union'(AJSU) ১৯৮৬ সালের ঐতিহাসিক 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলন' শ্লোগান তোলে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০১ সাল মধ্যে রাজনীতির উত্থান-পত্তন হয়েছে বিহার রাজ্য ও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে। প্রায় প্রত্যেক দলই আদিবাসীদের জন্যে আলাদা ভাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত জয় লাভ হয় ২০০০ সালে,- 'The Indian nation state on the 15th of November 2000 gave birth to a deformed child, the 28th province of the Indian nation state, euphemistically called Jharkhand. Ironically it coincided with the birth anniversary of Birsha Munda,'[২৯]

দীর্ঘ বছরের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রভাবে সাঁওতাল জাতি আর্থিকভাবে দুর্বল হয়েছিল। আন্দোলন ও আর্থিক সংকটের কারণে এই সময়পর্বে বহু সাঁওতাল জাতি মাইগ্রেডেট হয়। তার রূপরেখা আব্দুল জব্বারের সাহিত্যে বিরাজমান। তিনি ছোটো বেলা থেকেই গ্রামে মানুষ হয়েছেন। তাঁর ভালো লাগত জমিতে চাষ করতে, পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরতে ও গাছে উঠে নারকেল পাড়তে। অর্থাৎ গ্রামজীবনের প্রতি আব্দুল জাব্বারের আকর্ষণ চিরকালের। গ্রামবাংলার গরিব মানুষের পাশে সারাজীবন থেকেছেন। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু গ্রামের মেহনতি, দরিদ্র, গরিব মানুষ। তাই তিনি তথ্যভিত্তিক রচনার মধ্যে বাস্তব জগতের চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করেন। তাঁর বিখ্যাত ও অন্যতম 'বাংলার চালচিত্র' গ্রন্থে খাঁটি বাংলার ভরপুর জীবন বাস্তব রূপে উপস্থাপন করেছেন। 'বাংলার চালচিত্র' লেখক গ্রামবাংলায়

বসবাসকারী সাঁওতাল জীবনকে এড়িয়ে যাননি। তিনি সাঁওতালদের নিয়ে রচনা করেছেন ‘মাতালের হাট’(১৯৭২) উপন্যাস। এই উপন্যাস সম্পর্কে আব্দুল জব্বার জানিয়েছেন-

> মাতালের হাট এর চরিত্রগুলো সবই আমার হাতে তৈরি- ঈশ্বরের নয়। বাস্তব জীবনের কাদামাটি দিয়ে গড়ে তোলা মানুষ আর তাদের কাহিনী- তার সঙ্গে যদি আয়নায় মুখ দেখার মতন দুনিয়ার হাটের এর- ওর মিল হয়ে যায় তবে তা অনভিপ্রেত। মিল তো হবেই, কেন না সাহিত্য বা উপন্যাস হলো জীবনের আয়না।[৩০]

আব্দুল জব্বারের মনন, চিন্তন ও কল্পনার স্বভাবসৃষ্টি ‘মাতালের হাট’ উপন্যাস। উপন্যাসের পরিধি ও বিষয়বৈচিত্র বাস্তব জীবনের পটভূমিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমি সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, ডুলং, তারাফেনী, শঙ্খ, কোয়েল, দামোদর, জহরশর্ণা প্রভৃতি নদনদীর উপকূল অঞ্চলের শাল, মহুল, কেঁদ, আটাড়, পড়াশি প্রভৃতি জঙ্গলঝোপ-ঘেরা সবুজ জনপদ। গুরুমহিষানি, কিরিবুরু, টেবো, পাওলা-দলমা, ঘাটশিলা, আটাকেশী, বাদাম পাহাড়ের সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের বাসস্থান। টাটানগর, রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সাঁওতাল জীবিকার আশায় শহরে, নগরে, পথে, ক্ষেত-খামারে ও খনিতে পেটের ক্ষুধার জন্য কাজ করতে যায়।[৩১] অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আদিবাসীরা স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালেও সাঁওতালরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সাঁওতালরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক- কোনো কিছুতেই উন্নতি করতে পারেনি। তারই প্রেক্ষাপটে সুশীল সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও উত্তর অনুসন্ধান করেছে শিক্ষিত বেকার যুবক রবি হাঁসদা, এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চরিত্র। জীবিকার তাগিদে সে কখনো কয়লা খাদানে কাজ করেছে, কখনো হুগলির ইতভাটাতে, আবার কখনো গ্রামের জমিতে। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে বারে বারে ঘুরতে হয়েছে তাকে। একদল ক্ষমতাশীল মানুষের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়েছে। রবি হাঁসদা ক্ষমতাশীল মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে বারে বারে স্থান ত্যাগ করেছে।

নির্দিষ্ট স্থানে তার জীবন অতিবাহিত হয়নি। তার চিন্তা চেতনায় যেমন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন চিন্তা জাগরিত হয়েছে, তেমনি 'তেভাগা আন্দোলন'ও প্রভাবিত হয়েছে। সর্বোপরি নকশাল আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে রবি। আধুনিক শিক্ষিত রবি হাঁসদার মস্তিষ্কে রাজনৈতিক জীবন দর্শন প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সময় সাঁওতাল জাতির চিন্তা-চেতনা নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন মানব চক্রবর্তী, তিনি সত্তর দশক থেকে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কথাসাহিত্য রচনা শুরু করেন আশির দশক থেকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কুশ', 'স্পৃশ্য-অপস্পৃশ্য', 'সন্তাপ' ও 'বোধিবৃক্ষের ছায়া'। উপন্যাস ছাড়াও তাঁর 'সমীপেষু', 'প্রতিকথন নিম-ডাইরি, 'স্যালা মাণ্ডার'– ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সৃষ্টির আঙ্গিনায় প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অনুভূতির স্বরূপ। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন- 'দুপুরে গাঁয়ের পর গাঁয়ের মানুষকে মকাইভাজা খেয়ে দিন কাটাতে দেখেছি। এসব কোন সভ্য দেশে হয় না। এটা ভারতবর্ষ, এক মহাচোরের দেশ, মাঝরাত্তিরে স্বাধীনতা পাওয়ার দেশ। পরিবার তন্ত্রের ফাউণ্ডেশনে গাঁথা এই দেশের চরিত্র, সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে অসংসদীয় ব্যক্তিতন্ত্রের রমরমা এই দেশের প্রাণবায়ু- এখানে আদিবাসীদের ন্যায্য দাবী শুনতে কেন্দ্রীয় সরকারের বয়ে গেছে।'[৩২] এই অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' (১৪০১) উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে জানিয়েছেন-

> 'সেইসব যুবক-যবতীকে, সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের প্রবাহিত রক্তধারা যাদের দেহে, বুকে যাদের 'তিলকা'-র জ্বেলে যাওয়া আগুন, চোখে 'বিরসা'-র স্বপ্ন, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও স্বধিকার অর্জনের লড়াইয়ে আজও আপোষহীন, ইস্পাতকঠিন...'।[৩৩]

আলোচিত উপন্যাসে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সাঁওতাল সমাজের সংস্কৃতি। যেখানে সংস্কৃতিকে একটার পর একটা বর্ণনা করা হয়েছে। সাঁওতালদের লোকশ্রুতি অনুসারে

সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব, হিহিড়ি-পিপিড়ি, সেঙ্গেল-হয়দা– ইত্যাদি আদিকাহিনি উল্লেখিত হয়েছে। উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধের রূপান্তর এবং বিষন্ন বাস্তববোধ অধিক ক্রিয়াশীল। বিহার রাজ্যের রাঁচি-ভাগলপুর অঞ্চলের মিহিজাম স্টেশনের আশেপাশের স্থান জামতাড়া, মধুপুর, ক্যাওটাজালি গ্রামে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের বসবাস। যেখানে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, নেই কোনো শিক্ষা অঙ্গন। পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য জমি কম থাকায় আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া জাতি। আর্থিক সংকটের কারণেই তারা সেই সমস্ত অঞ্চল ত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ও গান্ধীবাদী দর্শনের স্বরূপ ও দ্বন্দ্ব উৎঘাটিত হয়েছে 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের খণ্ড চিত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে উঠে এসেছে। তার জন্ম হয় অধুনা বাংলাদেশে ৭ই জুন ১৯৪৭ সালে। আগস্ট মাসে দেশ স্বাধীন হয়। তাঁর যখন খুব অল্প বয়স, তখন সেপ্টেম্বর মাসে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার চব্বিশ পরগণাতে আসেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট থেকেই কবিতা পড়তে ও লিখতে ভালোবাসতেন। তিনি ছোট থেকেই গ্রন্থকীট ছিলেন, অল্প বয়স থেকেই উপন্যাস পড়ে ফেলতে পারতেন। সেই সঙ্গে কবিতা লেখালেখি এবং কবিতার পত্রিকাগুলি সম্পাদনার কাজ করতে থাকেন। তিনি কবিতা নিয়েই সাহিত্যচর্চা করতেন কিন্তু হঠাৎ একদিন উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন– 'একটা ঘোরের মধ্যে ঘটে গেল সবকিছু। কবি হওয়াটাই ছিল আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একবার গদ্য লেখা শুরু করলে একের পর এক তাগিদ আসতে শুরু করে। গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম গদ্য, তারপর হঠাৎ একদিন চলে এলাম উপন্যাসে। এখন বুঝতে পারি উপন্যাসেই আমি সবচেয়ে বেশি স্বছন্দ।'[৩৪] তাই বলে এটা নয় যে, তিনি শুধু উপন্যাসই লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যসম্ভার বিশাল সমুদ্র- কবিতা, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, কাব্যনাট্য, স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণকাহিনি, রহস্য-গোয়েন্দা

উপন্যাস, ছোটো গল্প প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘সাইবেরিয়ার হাঁস’। প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। তিনি শহরকেন্দ্রিক জীবন থেকে পাঠককে নিয়ে গেলেন শাল মহুয়ার পাহাড়ি ঘেরা মনোরম পরিবেশে। এভাবেই তিনি লিখতে থাকেন ‘জঙ্গলের রাজা’(১৯৭৪-৭৫), ‘নদী-মাটি-অরণ্য’(১৯৮৪), ‘মহুলবনীর সেরেঞ’(১৯৮৪), ‘আশ্বিনের বিল’(১৯৮৯), ‘লালফিতে’(১৯৮৯), ‘শিকড়ের খোঁজে মানুষ’(১৯৯০), ‘কোটি কোটি বছরের পাড়ি’, ‘ঘোড়া’, ‘ম্যাজিক ডল’, ‘শঙ্খচিলের ডানা’(১৯৯৩), ‘ডানার দু পাশে পৃথিবী’, ‘শঙ্খসমুদ্র’, ‘চাঁদমারি’, ‘দু হাজার একশো’, ‘পিঞ্জরের টিয়া’(১৯৯৫), ‘একটি জরুরি ফাইল’(১৯৯৬), ‘খণ্ড-বিখণ্ড’(২০০৯), ‘দ্বৈরথ’(১৯১৪)– প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি সরকারি আমলা ছিলেন, তাই তাকে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি গ্রামবাংলার নানা স্থান দেখেছেন, তিনি অন্বেষণ করেছেন বিভিন্ন জাতির মানুষকে এবং তাদের জীবনকে। তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। সাঁওতালদের নানা রকম রীতিনীতি ও আনন্দ উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন। সর্বোপরি সাঁওতাল সম্পর্কে নানা লোককাহিনি ও গান সংগ্রহ করেছেন। সেই সমস্ত গানগুলি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সাঁওতাল সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ‘সাঁওতালি কবিতা’ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যে শুধু গ্রামে গ্রামে গিয়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এমনটা নয়। সেই সঙ্গে সাঁওতালদের উপরে লেখা-পত্র পাঠ করেছেন। তিনি মেদিনীপুরের সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘মহুলবনীর সেরেঞ’(১৯৮৪) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনচেতনা ও দ্বন্দ্বমূলক সমাজ প্রতীয়মান। তিনি জানিয়েছেন- ‘আমাকে যেচে মানুষের সমস্যা জানতে হয়নি, সমস্যা আমার কাছে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে নিম্নবিত্তের যে লড়াই তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। দক্ষিণ ছব্বিশ পরগণার যেমন জঙ্গল কেটে জমি তৈরির লড়াই দেখেছি, মেদিনীপুরে সাঁওতাল, মুণ্ডা-শবরদের অস্তিত্বের লড়াই দেখেছি।’[৩৫] তিনি সাঁওতাল জীবনের মাধুর্য্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের

রূপ-রস উপলব্ধি করেছেন। সাঁওতাল সংস্কৃতির তাত্ত্বিক দিক যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও প্রতিবিম্বিত করেছেন। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও লড়াই ইতিহাসের মূল্যবোধ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করেননি। তাঁর উপন্যাসে আদিবাসীদের রাজনৈতিক যুদ্ধ, জমি দখলের লড়াই ও অস্তিত্বের লড়াই আমরা দেখতে পায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরের গ্রামবাংলার রাজনীতির ইতিহাস নিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বৈরথ'(২০১৪) উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতি ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রভাব পড়ে আদিবাসী গ্রামগুলিতে। ফলে উপন্যাসে গোষ্ঠী জীবন চেতনায় গণবিদ্রোহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের শেষের দিকেও সাঁওতাল সমাজের বেশ পরিবর্তন ঘটেনি, বিশেষ করে শিক্ষার দিক থেকে। শিক্ষার অভাবেও সাঁওতালদের দেশান্তরের ছবি দেখা যায়। অশিক্ষিত সাঁওতাল সমাজের মানুষ গরিব মানুষকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এধরনের গ্রামবাংলার চিত্র কথাকার ভগীরথ মিশ্র তুলে ধরেছেন। গ্রামবাংলার আদিবাসীরা মহাজনদের কাছে শোষিত হয়। তাদের সহজ সরল জীবনে তারা দিনমজুর- খেতমজুর করে দিনযাপন করে। এই সম্পর্কে ভগীরথ মিশ্র জানিয়েছেন–

> আর তার যত নজর এইসব সাঁওতাল, খেড়িয়া, দিনমজুর খেতমজুরদের পাড়ায় পাড়ায়। এরা হলো বোবার জাত দাশু রায় আজীবন কাল ধরে চিনেছে এদের। সাদা কাগজে অক্লেশে টিপ দিয়ে দেয়, জলের মতো সোজা হিসেবটিকেও কেউ উল্টে পাল্টে দিলে এরা বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করে না।[৩৬]

ভগীরথ মিশ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের মতো বিশাল গ্রামটিতে বসে গ্রামের গল্প না লিখলে লেখকের কলম শুদ্ধি হয় না। তাই তিনি গ্রামের কথা ও গ্রামবাংলার বাস্তব রূপ বৈচিত্রকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় গ্রামের দরিদ্র্য আদিবাসী মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং

জীবন-যাপনের ইতিবৃত্ত আবিষ্ট। শোষিত, অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর কলমে লেখা হয়-

> শোষণ করার প্রবণতা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। যে প্রাণী কিংবা মানুষটি একেবারে দীনের চেয়ে দীন, সেও তার চেয়ে দুর্বল টিকে শোষণ করছে। এই শোষণ শৃঙ্খলা টির প্রসঙ্গ আমি আমার একাধিক লেখায় উত্থাপন করেছি। এর জবাব আমি খুঁজে চলেছি।[৩৭]

তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর সাড়া জাগানো 'মৃগয়া' উপন্যাসে। তিনি আদিবাসী লোধা জীবনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন 'তস্কর' উপন্যাসে। চা-বাগান অঞ্চলের শ্রমিক আড়কাঠির যন্ত্রণাময় জীবন নিয়ে তাঁর 'আড়কাঠি' উপন্যাস রচিত। ভগীরথ মিশ্র 'ডাইনি' প্রথার ভয়ংকর দিক তুলে ধরেছেন 'জানগুরু' (১৯৯৫) উপন্যাসে, যা রাঢ়ভূমির পটভূমিকায় রচিত। কংসাবতী, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, জয়পণ্ডা, গন্ধেশ্বরী, বিড়াই নদনদীর উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রাম, এই গ্রামেই বাউড়িদের বসবাস। তার পাশেই আদিবাসী সাঁওতালদের বসবাস। তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মূলে আছে ডাইনি বিদ্যাচর্চা। ডাইনি সন্দেহে সাঁওতাল নারীদের দেশান্তর হতে হয়েছে। স্বাধীন ভারতে সাঁওতালদের বহমান জীবনে প্রতিটি কুসংস্কার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রতীয়মান উপন্যাসের পাতায়।

বিশ-একুশ শতকের সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার জীবনচিত্র সাহিত্যিক নলিনী বেরার জীবন অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। নলিনী বেরার জন্মস্থান সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত বাছুর খোঁয়াড় গ্রাম। গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর অঞ্চল, তাঁর জন্ম ভিটার উত্তরে সাঁওতাল, ভুঁইয়া ও ভূমিজদের গ্রাম। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে আদিবাসী জনবসতি, তার দক্ষিণ প্রান্তে কুমোর, কামার ও ডোমদের বাসস্থান পেরিয়ে তপোবন জঙ্গলমহল, একেবারে উড়িষ্যা বর্ডার ধারে। নলিনী বেরা গ্রামের মানুষ হলেও তিনি সত্তর দশক থেকে শহরে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু গ্রামের জীবনকে তিনি ভুলে যেতে পারেননি।

তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের জীবন। ‘আমার কথা, সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম’ প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন-

> নদীর ওপারটা আমার স্বদেশ, নদীর এপার গোটাটাই আমার কাছে বিদেশ। এপারের লোক আমাদের কাছে ‘নদী পারের লোক। আর ‘নদীপারের লোক’ মানেই বিলেত- আমেরিকার লোক। এমনটাই ভাবা হত, এমনটাই বলা হত।[৩৮]

কারণ নদীপারের লোকদের বাবু ঘর ছিল। বাবুদের ছিল স্কুল-হাই স্কুল ও নানা কল। নদীপারের লোকদের যোগাযোগ ছিল হাওড়া-কলকাতার মানুষদের সঙ্গে। বিদেশি উচ্চশ্রেণি মানুষের কথা নয়, নিম্নশ্রেণি স্বদেশি অশিক্ষিত, দুর্বল, অসহায়, অস্বাস্থ্য মানুষই নলিনী বেরার সৃজনভাবনার অন্তর্বীজ। সেখানকার সুখ-দুঃখের সময়, ভালোবাসার অনুভব, রাগ-অভিমান ও ক্ষুধা-লালসার স্বরূপ এবং স্বভাব নলিনী বেরার গল্প-উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো ‘শবরচরিত’, ‘কুসুমতলা’, ‘অপৌরুষেয়’, ‘ফুলকুসুমা’, ‘দুই ভুবন’, ‘চোদ্দমাদল’-ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর বহু গল্প আছে। নলিনী বেরা লোকজ উপাদান নিয়ে মহাকাব্যিক ‘শবরচরিত’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন। শবর জীবনের পাশাপাশি সাঁওতাল জন-জীবন সম্পর্কেও রচনা করেছেন। কথাকার উপন্যাস রচনার কৌশল বিশ্লেষণ করেছেন, এই ভাবে-

> সেই পথের দেবতাকে জীবনের দেবতাকে প্রমাণ করে সেই গন্ধ সেই ‘নস্টালজিয়া’কে সম্বল করে, সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, দ্বীপের আপামর অধিবাসী আত্মীয় পরিজন ভূগোল ভূপ্রকৃতি আবহাওয়া জলবায়ু নদনদী পাহাড়-টিলা বন ডুংরি গাছ পালাসহ তাবৎ ভূখণ্ডকে যতটুকু পারি প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় খনন করে আবিষ্কার করতে চাই উপন্যাস রচনার অজুহাতে।[৩৯]

নলিনী বেরা গ্রাম্য জীবন থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে জীবন অভিজ্ঞতাকে গদ্য শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলি অন্য কেউ নয়, নিজের পরিচিত মানুষ

ছাড়া। তাঁর নিজের শিল্পী সত্তাতে নির্মাণ করেন আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশি মানুষগুলিকে। তাঁর মতে সব লেখার মধ্যেই লেখক নিজেকে উপস্থাপন করে থাকেন। ফলে প্রত্যেকটা লেখাই আত্মজীবনীমূলক, লেখার মধ্যে দিয়ে লেখক নিজেকে মেলে ধরতে চান। লেখককে অনেক বেশি সংবেদনশীল হতে হয়। নিজের লেখার প্রতি অনেক বেশি যত্নে থাকতে হয়। লেখার মধ্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা থাকা আবশ্যিক। আর সেই কারণেই নলিনী বেরা আদিবাসী ও নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য ও তত্ত্ব লেখেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসের পটভূমি সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। তাঁর গ্রামের বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত সাঁওতাল জীবনের ইতিকথায় আখ্যানের বিষয়বস্তু। তাঁদের বাড়িতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ কাজ করত, ফলে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছেন এবং শিখেছেন কিছু কিছু সাঁওতালি শব্দ ও ভাষা। লেখক যখন গল্পের কাহিনিকে বিন্যাস বিশ্লেষণ করেন, তখন মনে হয় নলিনী বেরা নিজের অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করছেন। সহজেই পাঠকের কাছে লেখক ধরা দিতে চান না। বাস্তবের কাহিনি আর কল্পনার কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠে গল্পভুবনে। নলিনী বেরা তাঁর 'শাল মহুলের প্রেম' উপন্যাসের 'যৌবন মেলার সন্ধানে' অংশে আড়বাঁশি মণ্ডলুর জীবনের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জাতির দেবদেবী, বুরুপূজা, পাহাড় পূজা, হদুড় দুর্গার বিবরণ ও দাঁশায় নাচ, শিকার পরব, বিশ্বাস-রীতিনীতি এবং শিলদা পরবের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও ঐতিহ্য শিল্পকৌশল স্পষ্ট হয়েছে। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে লেখকের দৃষ্টিকোণ দিয়েই সুনি সাঁওতালের জীবনদশা ও মর্মান্তিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সুনি সাঁওতালের বিয়ে হয়েছিল উড়িষ্যাতে, সেখানে তার চোখে ঝাঁটার কাঠি লাগিয়ে দিয়েছিল স্বামী। অসুস্থ সুনি কলকাতাতে চিকিৎসা করতে এসেছিল। সুনি সাঁওতালও একই স্থানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি। আর 'ঘবা, তিহা-র গল্প'-এর শিক্ষিত ছেলে বিশ্বেশ্বর

কখনো শহরে থেকেছে, আবার কখনো গ্রামে বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামেই তার জীবন অতিবাহিত হয়।

সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার কারণ আন্দোলন, লড়াই, সংগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়, ইংরেজ সরকার, জমিদার, জোতদার ও ক্ষমতাশীল মানুষরাই দায়ী নয়, এর জন্যে সাঁওতাল সমাজের মাতব্বরাও দায়ী। প্রত্যন্ত গ্রামের সাঁওতাল জীবনের বিধাতা বলতে গ্রামের মাতব্বর মানুষ ও ওঝা গুরু। এধরনের জীবন নিয়েই কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের সাহিত্য ভাবনা গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়া জেলার 'সিন্দিরি' গ্রামে কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের জন্ম। তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাবে পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেননি। ছোটো থেকেই বইয়ের প্রতি তিনি খুব যত্নবান ছিলেন। কিন্তু বই না থাকায় ক্লাসের মধ্যে তাঁর খুব অসহায় মনে হত। তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। তবুও তিনি অর্থের লোভে ব্যবসার কাজে মন দিতে পারেননি। তিনি ঘুরে ঘুরে গ্রামের মানুষকে দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন নিপীড়িত মানুষের জীবন। তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন অনাহার-অর্ধহার প্রান্তিক মানুষ, চালিওলা কুঁড়েঘর ও অনাদরে পড়ে থাকা শিশুগুলির প্রতি। ছোটবেলা থেকেই সৈকত রক্ষিতের পরিবারে অস্তিত্বের লড়াই ছিল দ্বিমুখী, -'ঘরেও লড়াই, বাইরেও লড়াই। ঘরে দরিদ্র-অভাব-অনটন-অশান্তির সঙ্গে যুদ্ধ। আর বাইরে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণে নগণ্য জীব হওয়ায় বাবুসমাজের দাপট থেকে নিজেদের রক্ষা করার লড়াই।'[৪০] সৈকত রক্ষিত মানবজীবনের দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি গরিব মানুষদের কাছ থেকে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছেন। তাঁর চলমান জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে অবস্থিত মানুষের জীবনসংগ্রাম নিয়ে তিনি বিখ্যাত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আকরিক', 'হাড়িক', 'ধূলা উড়ানি', 'মহামাস' ইত্যাদি উপন্যাস। উপন্যাসের পাশাপাশি বহু গল্পও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হলো 'আরামচেয়ার',

‘জন্মভূমি বধ্যভূমি’, ‘উঠোরে পুতা জাগোরে পুতা’, ‘মাড়াইকল’ এবং ‘উত্তরকথা’। তাঁর গল্পে প্রান্তিক মানুষের বিপন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা গ্রথিত হয়েছে। চারপাশের পরিমণ্ডলে অবস্থিত মানুষের সুখদুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, কলহ, হিংস্রতা, ঈর্ষা ও শ্রমজীবনের কথা তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মূলে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি জানিয়েছেন-

> গার্হস্থ্য-বলয়ের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে, এমন কত-কত ঘরে দাওয়ায় দড়ির খাটে যখনি বসেছি, মন আহ্লাদিত হয়েছে। মনে হয়েছে- আমার লেখক জীবন ধন্য এখানে। অবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার সূত্রে আমি তো এদেরই চিনি। দারিদ্রকে চিনিয়ে মায়ের মতো করে, অপমানকে নিয়েছি বাবার আদরে, বঞ্চনাকে চিনেছি আকৃষ্ট বলে। এই চেতনা আমার চোখ খুলে দিয়ে আমার মধ্যে যৎসামান্য হলেও মানবিক চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ও সহমর্মিতা এনে দিয়েছি, যা বই পড়ে পাইনি।[৪১]

বাস্তব পরিমণ্ডলের মানুষ ও সমাজের উঁচু-নিচু স্তরের ভেদাভেদ দেখে সৈকত রক্ষিতের চেতনায় জন্ম হয়েছে গল্প-উপন্যাসের ভাবনা। শিল্প সাহিত্যে সময় ও সমাজের অবস্থানকে লোকায়ত জীবনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর অভিযানপ্রবণ ও ভ্রাম্যমাণ জীবনের বহিঃপ্রকাশ বিবর্তনময় কথাসাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলে নিম্নশ্রেণির মানুষ, তিনি জানিয়েছেন- ‘আমি লিখি মূলত ‘সাবঅলটার্ন’দের নিয়ে। মফস্বল শহর, গ্রাম ও গ্রামজীবন আমার লেখায় উপজীব্য। এবং সেটা পুরুলিয়া।’[৪২] পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-টাটা ও চাণ্ডিল অঞ্চলে আখের চাষ হয়। প্রায় সব গ্রামে আখের ব্যবসা করা হয়। জোতদার মহাজনরা যুগ যুগ ধরে গুড়ের ব্যবসা করে। মহাজনদের শ্রমিক বলতে আদিবাসী সাঁওতালরা, যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল ও করুণ। মহাজনের বাড়িতে কাজ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সৈকত রক্ষিতের ‘মাড়াই কল’- গল্পেও দেখা যায়, গ্রামবাংলার আদিবাসী সাঁওতালরা মহাজনদের বাড়িতে কাজ করে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

টিলা ও পাহাড়ের মাঝখানে রাঙামাটি গ্রাম। মাত্র কুড়ি-বাইশটি ঘর, শ-দেড়েক আদিবাসী সাঁওতালদের বসবাস। লোকালয় থেকে বহুদূরের জঙ্গলে চৌকো চৌকো ঘরবাড়ি, এক ঘরের চাল আরেক ঘরে লেগে আছে। এখানকার সাঁওতালরা অন্যের ঘরে দাসত্ব করে। পাথর যুক্ত মাটিতে চাষবাস কম হয়, নিজস্ব জমি জায়গা খুম কম মানুষের আছে। ধান চাষ করে এদের জীবন অতিবাহিত হয়। এছাড়া সাঁওতালরা মুরগি, ভেড়া, ছাগল ও শুয়োর ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। রাঙামাটি গ্রাম থেকে বহুদূরে মানবাজার হাট, সেখানেই তারা বাজারহাট করে। রাঙামাটি গ্রামের মানুষ ও তাদের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে 'রাঙামাটি' গল্প। এই গল্পে দেখা যায় আদিবাসী মানুষ নিজেদের স্বজাতির মানুষকেই তাড়িয়ে দেয়। কালী, বনমালী ও সঞ্চারী অন্ধকার রাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় এক অজানা ঠিকানায়।

শাল জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা জারাটাঁড় গ্রাম, গ্রামের চারেপাশে বনবাদাড়, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুব কম। এই গ্রামে সাঁওতালদের বসবাস। প্রাকৃতিক কারণে গ্রামে চাষের ফলন ফলে না, ফলত সাঁওতালরা চিন্তিত। যে চিন্তার মূলে আছে ডাইনি বিশ্বাস, তাই অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের অমানবিক অত্যাচার ও রাজনীতি নিয়েই সৈকত রক্ষিতের 'ছল' গল্প। এই গল্পে দেখা যায় কালিন্দীর মতো নারী চরিত্রের বিবর্তন, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে গ্রাম ছাড়তে হয় তাকে।

প্রকৃতির উদার পরিবেশে আদিবাসী সাঁওতাল-শবর-মুণ্ডা-ভূমিজদের বসবাস। বান্দোয়ান বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গল পাহাড়ি অঞ্চলে পাকা সড়কের অভাব, উঁচু-নিচু জমি, টিপি, ডুংরি ও শস্যহীন ডাঙ্গা জমির উপরে লুকাপানি গ্রাম। এই গ্রামের বিধবা নারী যশোমণি মুর্মুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'যশোমণি মুর্মু' গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র যশোমণি মুর্মুও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষও তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সৈকত রক্ষিত গ্রামজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক তুলে

ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন- '...আগামী দিনে আর কোথাওই নিরীহ শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত মানুষের ডানা মেলার জায়গা থাকবে না, দু-দণ্ড শান্তির আশ্রয় তাঁরা পাবেন না কোথাও। বরং অযোগ্য-অশিক্ষিত-বর্বরদের হাতে পড়ে চরম হেনস্থা সহ্য করতে হবে।'[৪৭] বর্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আদিবাসী জীবন ধ্বংসের মুখে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ ঘটক, সুবোধ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আব্দুল জব্বার, মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ লেখকরা সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তরযাত্রার দলিলের গভীরে আলোকপাত করেছেন। দেশান্তর যাত্রার জীবনে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আসলে বিশেষ ভূখণ্ড ও সময়কালের। সাঁওতাল জীবনের সামগ্রিক দিক ফুটে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে। কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে ঝাড়খণ্ড ও বিহার রাজ্যের কোলিয়ারি অঞ্চলের খাদান, পাহাড়ি অঞ্চল, ভাগলপুর, রাজমহল, দেওঘর, জামসেদপুর, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার জীবন চিত্র। বেঁচে থাকার জন্যে তারা এক রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেয়। বেঁচে থাকার জন্যে তারা উড়িষ্যা, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আসাম, ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ- নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে সাঁওতালরা কর্মসংস্থানের শর্তে দেশান্তরিত হয়। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মালদা, দুই দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার দিকগুলি সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে।

তথ্যসূত্র:

১। হোতা, দিব্যেন্দু (সম্পা.), সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২২

২। তদেব

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

৪। তদেব

৫। তদেব

৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০

৮। তদেব

৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৩

১২। দেবী, মহাশ্বেতা, *ভূমিকার পরিবর্তে,* রচনা সমগ্র, একাদশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *অরণ্য-বহ্নি,* তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ২৬৮

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৭

১৫। দেবী, মহাশ্বেতা, *সিধু কানুর ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩১

১৬। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১১৯-১২০

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *হে অরণ্য কথা কও,* বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৬৬৩

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮৩

১৯। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, *ভূমিকা,* দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪

২০। ভট্টাচার্য, অমর, *নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন,* নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ- ৩০শে জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা- ৭৪

২১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৫

২২। তদেব

২৩। মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১

২৪। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *তৃণভূমি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১৩০

২৫। দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ৪৭৯

২৬। Vidyarathi, L.P. Aspects of Tribal Leadership in Chhotanagpur, Leadership in India, Asia Publishing House, Bombay, 1967, p- 136-37.

২৭। Mishra, R.N, Regionalism and State Politics in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1984, p- 136.

২৮। Sarini and Birsa Johar, op cit, p- 31.

২৯। Munda, Ram Dayal and Bosu Mullick, S, *The Jharkhand Movement,* IWGIA Document no-108, Copenhagen, 2003, p- xvi

৩০। জব্বার, আব্দুল, *মাতালের হাট,* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫

৩২। আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০),* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৮ই আগস্ট, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১১৮৬

৩৩। চক্রবর্তী, মানব, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- উৎসর্গ

৩৪। দাশ, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত), *কবিসম্মেলন পত্রিকা,* দশমবর্ষ নবম সংখ্যা মে ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৮

৩৫। তদেব

৩৬। মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে'জ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ২১৭

৩৭। মিশ্র, ভগীরথ, নির্বাচিত গল্প, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২৩

৩৮। আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০),* ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৮ই আগস্ট, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১১৯৭

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৯৮

৪০। আরশি নগর, *সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা,* বইমেলা ২০২০ পৃষ্ঠা- ৭

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

৪২। রক্ষিত, সৈকত, *লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম,* সম্পাদনা, অরূপ পলমল, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, ডাভ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৯

৪৩। আরশি নগর, *সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা,* বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা- ৮-৯

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)

উপন্যাসের গঠনরূপ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের নিজস্ব ‘জীবনদর্শন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এটা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে ঔপন্যাসিকের কাছে সব থেকে বড় বিষয় হলো জীবনের সমস্ত দিকগুলি অনুসন্ধান করা। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঔপন্যাসিক নিজেকে মেলে ধরেন। জীবন ও জগতের ধ্যানধারণাকে ঔপন্যাসিক সুবিস্তৃতভাবে আখ্যানে উপস্থাপন করেন। কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ও সময়-কাল এবং রচনাশৈলী সচেতন-অসচেতন ভাবে লেখক প্রকাশ করেন উপন্যাসের পাতায় পাতায়। এখানে শুধুমাত্র জীবনের সামগ্রিক খোঁজা নয়, জীবন সম্পর্কে লেখকের জীবনদর্শন ও বক্তব্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১] যে কোনো বিষয়ের প্রতি লেখক সহজেই বক্তব্য ও মন্তব্য করতে পারেন না। লেখক তখনই বক্তব্য ও মন্তব্য দিতে পারেন, যখন লেখকের জীবনদর্শন তৈরি হয়। লেখকের জীবনদর্শন নির্মাণ হয় ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা, সমাজ-সভ্যতার আদিকল্প ও ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করে। সাঁওতালদের সম্বন্ধে বাঙালি লেখকদের আদিকল্প ও ইতিহাসচেতনা কীভাবে এসেছে? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় ইতিহাস চর্চায়। ভারতে ইংরেজ আসার আগে অতীতের সন-তারিখ দ্বারা বর্ষপঞ্জী ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইতিহাসবিদ্যার প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইংরেজ আসার ফলে। আধুনিক ইতিহাসচেতনার মূলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব যতটা আছে, তার থেকে বেশি আছে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার হাতিয়ারে।[২] ইংরেজ শাসনব্যবস্থার ইতিহাস বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা অনেকাংশে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির অনুসন্ধান খুঁজে পান নাগরিক কলকাতার তাত্ত্বিকরা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে বলেছেন–

> সাঁওতাল উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙামাটি সাঁওতালের লোলিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন।...কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের

উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। ...ক্যালকাটা রিভিয়ু পত্রের কোনো ইংরেজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন।[৩]

'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় সাঁওতালদের সম্বন্ধে লেখালেখি হয়। মূলত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল বলেই সাঁওতাল জনজাতিকে 'অসভ্য', 'বর্বর', 'জংলি' আখ্যা দেওয়া হয়। যে বিদ্রোহের নাম 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'(১৮৫৫)। এই বিদ্রোহের সময় থেকেই সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে একটু একটু করে ধারণা লাভ করতে শুরু করে বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা। এই ধারণা থেকেই বাঙালি লেখকরা নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অন্বেষণ করেছেন সাঁওতাল জীবনকে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিবিধ' গ্রন্থে বলেছেন-

যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী। আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না- সাঁওতাল না নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণা শুধু একার ছিল না, উনিশ শতক জুড়েই এই রকম মানসিকতা ও মনোভাব তৈরি হয়েছে। মূলত দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় উনিশ শতক থেকেই। এক, বাঙালি সমাজ সাঁওতাল জাতিকে দেখেছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে। তবে ওই সময়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকরে'- সাঁওতালরা 'যে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না',[৫] 'সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক',[৬] 'তাঁহারা অসভ্য সাঁওতালদিগের ভয়ানক অত্যাচার হইতে এ দেশে ভীরুস্বভাব, নির্দোষ লোকদিগকে রক্ষা করিবেন না, কি আশ্চার্য!'[৭] এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখা হয়। শুধু তাই নয়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া', 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাতেও প্রমাণ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মানসিকতা বিশ শতকের সাহিত্যেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বনফুল তাঁর 'বুধনী' গল্পে জানিয়েছেন– 'অসভ্য বিলটু জংলি বুধনীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন ভঙ্গিতে তাহার প্রণয়

প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম বিহারী সভ্য লোক, বর্বর বনদম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই। ...তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নেই।'[৮] কিংবা- 'বনে জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত।'[৯] এই গল্পে বনফুল ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন বলেই গল্প রচনা করতে পেরেছেন। বনফুল লজ্জায় নিজেকে সভ্যজাতি বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু অসভ্য, জংলি, বর্বর জাতি বন-জঙ্গলে বিরাজ করার মধ্যেও ঋণাত্মক চিন্তাভাবনা রয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাংলা অভিধানগুলিতেও সাঁওতাল জাতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আখ্যায়িত হয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে সাঁওতাল শব্দের অর্থ হলো- 'পর্ব্বতবাসী অসভ্য আদিম জাতিবিশেষ', (ইহাদের পুরুষ 'মাঝি', স্ত্রীলোক 'মাঝেন'(মাঝিনী)।[১০] একবিংশ শতাব্দীর 'অভিনব বাঙ্গালা অভিধানে'ও লেখা হয়– 'সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসী; অসভ্যজাতিবিশেষ'।[১১] মধ্যবিত্ত বাঙালির চিন্তাধারা ইংরেজদের চিন্তাধারা থেকে একেবারেই পৃথক, তা কিন্তু নয়। বরং বলা ভালো ইংরেজদের চিন্তাধারাকে বাঙালিরা অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। সাঁওতাল সম্পর্কে ইংরেজদের বর্বর ধারণা থেকে উনিশ, বিশ ও একুশ শতকীয় বাঙালিরা বেরোতে পারেনি। এখানে বাঙালি জাতি বলতে উচ্চশ্রেণির হিন্দু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নগর কলকাতাতে যারা বসবাস করছে তাদের কথায় বলা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়, গ্রামবাংলার নিম্নশ্রেণির হিন্দু বাঙালি, জোতদার-জমিদার প্রভৃতি অ-আদিবাসী মানুষও রয়েছে।

নেতিবাচক ধারণার সমান্তরালে আরেক ধারণা তৈরি হয়েছে, যারা ওই সময়ের ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী বাঙালি ছিলেন, তারা সাঁওতালদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। ইতিবাচক মনোভাব ও মানসিকতা নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষজীবনে সাঁওতালদের সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন- 'বড়লোকের মাটিতে খাওয়া

অপেক্ষা এ সব লোকের কুটিরে খাইতে আমার ভালো লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।'[১২] বিদ্যাসাগর ভীষণভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছেন আরণ্যক সাঁওতালদের সহজ সরল জীবনের প্রতি। তেমনভাবেই মুগ্ধ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি জানিয়েছেন- '...সাঁওতাল-সত্যপরতায় যারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি।'[১৩]

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে বিশ শতক থেকে, তবে স্বাধীনতার পরে সাঁওতাল জনজাতি সম্বন্ধে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতাল সমাজকে কেন্দ্র করে শ্রীকালীপদ ঘটকের 'অরণ্য-কুহেলী' (১৯৪৯) উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবজীবনের প্রেমচেতনা থেকেই 'অরণ্য-কুহেলী' উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের গ্রাম্য জীবনের জটিল চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনির একভাগে আছে রক্ষণশীল সমাজপতি, অন্যপ্রান্তে সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম। তার মধ্যবর্তী অংশে ইংরেজদের লোভ-লালসার প্রতিচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন নিয়ম-কানুনের কাছে ব্যক্তি প্রেমের করুণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, রাগ-বিদ্বেষ, মান-অভিমান, দুঃখকষ্ট ও হতাশাময় জীবনসংগ্রামের প্রতিক্রিয়া নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই উপন্যাসের সূত্রপাত সাঁওতালদের বিয়েকে কেন্দ্র করে। বিয়ের রীতিনীতি নিয়ে সাঁওতাল সমাজের নিয়ম অপরিসীম। সমাজের নিয়ম কানুন ও বিধির বিধান অমান্য করা অসম্ভব। সাঁওতাল পাড়ার সর্দ্দার ও রামপুরহাট মৌজার প্রধান রাবণ মাঝি পঞ্চগ্রামের বিধি লঙ্ঘন করে। রাবণ মাঝির অপরাধ তার মেয়ে দুলালীর সঙ্গে মোহনের বিয়ের আয়োজন করা। অথচ পারিবারিক সূত্রে ছোটবেলাতেই দুলালীর সঙ্গে টুংরা মাঝির বিয়ে ঠিক হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই টুংরা মাঝির দলবল মোহনের বিয়েকে আটকে দেয়। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু

হয় তীরের লড়াই। অবশেষে উভয় পক্ষের সালিশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পঞ্চগ্রামের মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দুলালীর পাত্র নির্বাচনের জন্যে তীর-ধনুকের লড়াই-ই একমাত্র পথ। এতে পরীক্ষা করা হয় পুরুষের শক্তিকে। সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন প্রথানুসারে বিজয়ী তীরন্দাজের সঙ্গেই পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কালীপদ ঘটক সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম জীবনকে প্রকাশ করেছেন অভিনব ধারাতে। প্রেমমূলক উপন্যাস রচনায় নতুন রীতিতে কাহিনি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা। এই আখ্যানে সাঁওতাল সমাজের রাজনীতির ভয়াবহ দিক যেমন করে রয়েছে, তেমনি প্রেমের আবেগঘন আত্মপ্রকাশ পরিপূর্ণ রূপে বিন্যস্ত। মোহন ও দুলালীর প্রেমপর্ব শুরু হয় ‘কুলাডাঙ্গার’ হাট থেকে। এই হাটেই উভয়ের প্রেম হয়েছিল চোখের পলকেই। তাদের প্রেমকে সার্থক করার জন্য আয়োজন করা হয়েছে আনুষ্ঠানিক বিবাহ রীতি। এই বিবাহ থেকেই শুরু হয় সমস্যা, যে সমস্যার সমাধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাচীন পন্থা। যেখানে দেখা যায় তীর-নিক্ষেপের পরীক্ষার আগেই মোহন পরাজয় স্বীকার করে। তীর-নিক্ষেপে সে পাল্লা দিতে পারবে না টুংরা মাঝির সঙ্গে। টুংরা মাঝি সাহসী ও বুদ্ধিহীন পুরুষ, তার রাগ বিদ্বেষ মনোভাব দুর্ভাগ্যের নির্দেশক। প্রাণের ভয় নেই, বরং বাঘকে শিকার করে টুংরা মাঝি গৌরবের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার বিপরীতে প্রেমিক মোহনের অক্ষমতা, যা সাঁওতাল সমাজে বীরোচিত সম্মান নয়। ফলত, বিয়ের আগে সমাজের নিষেধকে অবমাননা করে মোহন আর দুলালীর রোমান্টিক হৃদয়বোধ ঘনীভূত হয় গৌধূলি লগ্নে। কালো পাথরের উপরে বসে মোহন আড়বাঁশী বাজায় আর দুলালী গান করে, এভাবেই তাদের সময় অতিবাহিত হয়। মায়াময় পরিবেশে নায়ক-নায়িকার ভাবাবেগ মনে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠে একে-অপরকে হারানোর ভয়। কিন্তু মৃত্যুর ভয় নিয়ে প্রেমকে জয় করা অসম্ভব, বরং প্রেমে হার না মানা মানসিকতায় প্রেমের সারবস্তু। এই মন-মানসিকতায় দুলালী পালিয়ে যায় মোহনের হাত ধরে। দুর্দিনে যাকে ভরসা করা যায়,

তারই সঙ্গে দুলালী পালিয়ে যায় গ্রাম ছেড়ে। বাড়ির মান-সম্মান ভুলে এক অচেনা দেশের পথিক দুলালী।

মোহন ও দুলালী পালিয়ে যাওয়ায় এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। 'পঞ্চগেরামী' সাঁওতালরা জড়ো হয় বিচার সভায়। আসলে সাঁওতালদের বিধির বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলাকে অন্যায় ভাবে লঙ্ঘন করলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তির যাবতীয় বিধি প্রয়োগ করে 'পঞ্চগেরামী' সভা। এই সভায় রাবণ মাঝির মান-সম্মান বিচ্যুতি ঘটে, সাঁওতাল মেয়ে পালিয়ে গেলে- তা খুব নিচু চোখে দেখা হয়। মোহন ও দুলালীকে খুঁজে বার করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারপর দুলালীকে কানা, খোঁড়া ও কুৎসিত রোগগ্রস্থ অকর্ম্ম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাঁওতাল সমাজের মানুষ গ্রহণ করবে না মোহন মাঝির ছোঁয়া জল। তাকে উচ্ছেদ করা হয় জমি-জায়গা থেকে। তার ঘর বাড়িকে ধ্বংস করে দেয় পঞ্চগ্রামের মানুষ।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের স্থান-কাল পরিবর্তন করেছেন। নতুন স্থানে নর-নারীর জীবন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রেম-ভালোবাসার নতুন পরীক্ষা শুরু হয় এই পর্বে। মোহন আর দুলালী ধানবাদ এলাকার কলিয়ারির খাদানে পালিয়ে গিয়ে নতুন সংসার স্থাপন করে। মালগাড়ীর বোঝাই দেওয়া, ট্রাম লাইন থেকে টব গাড়ী খালাস করা এবং খাদানের মালকাটার কাজ করে মোহন। অন্যদিকে খাদানের উপরে ঝুড়ি মাথায় করে কামিনদের সঙ্গে কাজ করে দুলালী। ফলে সারা দিন দু'জনের দেখা হয় না। দুলালীর মন চঞ্চল হয়ে উঠে, কাজের প্রতি মন বসাতে পারে না। সংসারের অভাব অনটন মেটানোর চেষ্টা, তবুও দুলালীর শূন্যময় জীবন। নূতন জগতের সঙ্গে দুলালী মানিয়ে নিতে পারে না। কলিয়ারি অঞ্চলে চারিদিকে পাহাড় আর কয়লার ধোঁয়া। এই আবদ্ধ পরিবেশে এক টানা বসবাস করা তার পক্ষে জটিল হয়ে উঠে। তার অতীত স্মৃতিতে ধরা পড়ে সাঁওতাল পরগণার সবুজ মাঠ, মুক্ত আকাশ, ভুট্টা ক্ষেত, মহুয়ার

বন, রকমারি ফুলের গন্ধ ও ঝকঝকে সাঁওতাল পল্লীর সৌন্দর্য। অথচ এই কলিয়ারির আকাশে বাতাসে কয়লার কালি, নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়। বাধ্য হয়ে দুলালী দেশান্তরিত হয়েছে, মোহনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে শুধুমাত্র প্রেমের জন্য। সে সমাজের চোখে অপরাধী হলেও প্রেমধর্ম মতে অপরাধী নয়। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে দুলালী। তার মেয়ে সন্তানের সঙ্গেই সারাদিন কেটে যায়, সন্ধ্যার সময় মোহন ফিরে আসে। ভয় ও আতঙ্কের সংসার তাদের, ভয়ের কারণ রাবণ মাঝি ও তার লোকজন কলিয়ারির খাদানে হানা দেয়। ফলে কাজোড়ার কয়লাকুঠিতে মোহন ও দুলালীর সংসার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তারা বাধ্য হয়ে কাজোড়ার কুঠি থেকে চরণপুর খাদানে পালিয়ে যায়।

চরণপুর খাদানে নায়ক-নায়িকার নতুন অভিজ্ঞতা হয়, শুধু প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে সংসার করা যায় না। সংসার করতে হলে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। চরণপুর খাদানের মালিক ইংরেজ সরকার। কোম্পানির কর্মচারীরা টমাস সাহেবের ভয়ে তটস্থ, তার অভদ্র চোখরাঙানি ও বদমেজাজী রুক্ষ রূপে শোষিত শ্রমিকরা আতঙ্কে থাকে। সাহেবের কয়েকজন কুলিকামিন আছে, যারা কুকর্মের সঙ্গে যুক্ত। কলিয়ারি কামিনদের থেকেই অল্প বয়সী মেয়েদের সঙ্গে টমাস রাত্রিযাপন করে। টাকার লোভ দেখিয়ে টমাস বহু নারীর জীবন নরক করে তুলেছে। এই ধরনের কাজে সহযোগিতা করে টমাস সাহেবের চামচা বাউরি কামিন। চরণপুরে দুলালী ও মোহনের জীবন স্বছন্দেই চলছিল। কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় মোহন আড়বাঁশি বাজায়, আর মাদলের তালে কুলিকামিনরা নাচ-গান করে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ছিরিপুরের হাটতলায় ছাতাপরব, তারই আনন্দে মেতে থাকে শ্রমিক মানুষ। অথচ দুলালীর মন মেজাজ ভালো নেই, কারণ বাউড়ি কামিন নানা ভাবে প্রলোভন দেখায়। টমাস সাহেবের নজর পড়ে মোহনের সুন্দরী স্ত্রী দুলালীর উপরে। সে বার বার দুলালীকে জোর করতে থাকে কুকর্মের জন্যে, কিন্তু দুলালী সাঁওতালি মেয়ে, সে টাকা পয়সার লোভে এই সমস্ত কুকর্ম কাজ করে না।

দুলালীর কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও টমাস দুলালীকে ছাড়ে না, দুলালী জান-প্রাণ দিতে রাজি কিন্তু মান-সম্মান ইজ্জত দিতে রাজি নয়। অথচ শয়তান টমাস সাহেব মোহনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। খাদানের পশ্চিম প্রান্তে পিলার কাটিং কাজে মোহনের ডাক পড়ে। কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে মোহনও কাজ করতে রাজি হয়। পরিকল্পিতভাবে দুলালীর কাছ থেকে মোহনকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এর বিনিময়ে ভদ্র ব্যবহার ও মোটা টাকার পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। টমাস সাহেবের চক্রান্ত মোহনের মগজে ধরা পড়ে না। যদিও মোহন বুদ্ধিহীন ছেলে নয়, বরং সাহসী ও বাস্তববাদী। টমাসের সুব্যবহারের ভিতরে লোভ লালসার প্রতিচ্ছবি চাপা থাকে না। টমাস সাহেবের চর বাউড়ি বুড়ির সঙ্গে দুলালীর কথোপকথনে মোহনের সন্দেহ হয়। দুলালীর জবানীতে মোহন সবই জেনে যায়। মোহনের মন মেজাজ উগ্র হয়ে উঠে, উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকে। সাঁওতাল মেয়ের উপরে নজর রাখলে তার পরিণাম কী হতে পারে? তা ঔপন্যাসিক মোহন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। মোহনের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। ইংরেজ সাহেব ভাবতেও পারেনি দুলালী সহজেই রাজি হবে। দুলালীর ঘরে টমাস সাহেবের প্রবেশ এবং মোহনের মুখোমুখি। টমাসের উপরে মোহন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর দাঁত, ঠোঁট থেকে টমাসের রক্ত বেরোয়। তাকে মেরে দিয়ে মোহন আর দুলালী চরণপুর খাদান থেকে পাথরডি খাদানে পালিয়ে যায়।

পাথরডিতে দুই বছরের সংসার জীবন, দুলালীর কোলে সন্তান। মোহনের আদর যত্নে ও প্রেম-ভালোবাসায় দুলালীর সুখের সংসার। দুঃখকষ্ট, আঘাত অতিক্রম করে তারা মধুময় জীবন অতিবাহিত করে। তাদের ছন্নছাড়া জীবনে সন্তানই নতুনতর আকর্ষণ। আত্মীয় স্বজনহীন জীবনে আনন্দের ধারা এসেছিল সংসারে। পলাতক জীবনে ছোট একটি সোনার সংসার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সাজানো সংসারে মোহনের খামখেয়ালি জীবন শুরু হয়। প্রেম এবং সংসার জগৎ এক নয়, সংসারের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুলালী। যে পুরুষের হাত ধরে নতুন

পৃথিবীতে পাড়ি দিয়েছিল দুলালী, সেই পুরুষই বিশ্বাসঘাতক। দেশ ছাড়া দুলালী ক্রমাগত দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে। পাথরডিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটে। প্রেম-ভালোবাসার প্রতি উভয়ের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। দুলালীও নিজের প্রেমের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। দুলালীর জীবনে ভূতের মতো উপস্থিত হয় সুন্দরা নামে এক অবিবাহিত নারী। তাকে কেন্দ্র করে মোহন ও দুলালীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। সুন্দরা চালাক চতুর নারী, চটকদার চেহারার জোরে কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে। যৌবনের ফাঁদে ফেলে পুরুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। সুন্দরার স্বভাব চরিত্র পাথরডির পুরুষরা জানে, তবুও শরীরের টানে বেহায়া সুন্দরার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ। মটুকধারী সিং এর সঙ্গে সুন্দরার উঠাবসা। কোম্পানির এক হিন্দুস্থানী কর্মচারী মটুকধারী সিং, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে গামছা আর পিতলের ভোজপুরী লাঠি নিয়ে সব সময় থাকে এই ভয়ানক লোক। সুন্দরার জন্যে বহু টাকা খরচ করে, অথচ তার বিয়ে করা স্ত্রী নয়। তবুও সুন্দরা মোহনের সঙ্গে প্রেম করে। মোহন সুন্দরার বাসায় যাওয়া আসা করে, পথে ঘাটে তাদের আলাপচারিতা, বটতলার দোকানে পান খাওয়া এবং রাত্রি দশটার সময় ট্রেনে করে মোহন ও সুন্দরা পালিয়ে যায় রথ উৎসবে। এই ঘটনা জানতে পারে দুলালী, ফলে মোহনের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে চায় না। সন্তানকে কোলে নিয়ে দুলালী কান্নায় দুঃখে কষ্টে রাত্রিযাপন করে। দুলালীর কোথাও আশ্রয় নেই, ভিটেমাটিহীন জীবনে এক যন্ত্রণাময় নারীর জীবন হাহাকারে পরিপূর্ণ। মোহনের হাত ধরে এসেছিল যে সমাজ থেকে, দুলালী ফিরে যেতে পারে না সেই সমাজে। সুন্দরার মতো দুশ্চরিত্র নারীই নষ্ট করে দুলালীর সংসার। সুন্দরার কাছ থেকে মোহনকে উদ্ধার করা দুলালীর কর্তব্য। রথপরবের দিনে দুলালী মেলাতে যায় মোহনের খোঁজে। ভিড়ের ভিতরে মোহনকে কোথাও খুঁজে পায় না। সে তাকিয়ে থাকে ঠাকুর দেবতার দিকে। সাঁওতালরাও বাঙালিদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাঙালি ঠাকুরকে পুজো

করে। তারাও কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতাকে আরাধনা করে। দুলালীও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে মোহনের জন্যে। ঠাকুরের কৃপায় দুলালী মোহনকে দেখতে পায় নাগরদোলায়। সুন্দরা মোহনের কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে টাকা পয়সা লুটে নেয়। সুযোগ সন্ধানী সুন্দরা মোহনকে অস্বীকার করে। দুলালী তার স্বামীর আচরণে দুঃখে ও রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ভয়ানক ভুল থেকে রীতিমত শিক্ষা পাওয়ার পর মোহন প্রতিজ্ঞা করে জীবনে এই সমস্ত কুকর্ম, দুশ্চরিত্র নারীর সঙ্গে মেলামেশা করবে না।

ঔপন্যাসিক কালীপদ ঘটক গ্রামের ঘটনাকে আবার গ্রামেই ফিরে নিলেন। শুরু হয় প্রেমের অন্তিম পর্যায়ের নাটকীয় অংশ। মোহনের সঙ্গে দুলালীর মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে, দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গ স্মৃতিপটে দুলালী বৃদ্ধ বাবার অভাব অনুভব করে। ফেলে আসা বন্ধু আত্মীয় স্বজনের আলোকময় জীবনে ফিরে যেতে চায় দুলালী। মোহনের স্বার্থপর স্বভাব, বিকৃতি মনোভাব থেকে দুলালীর দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। দুলালীর মানসিক চেতনা নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত। বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বাসবোধের অভাব মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। কিন্তু দুলালী মনুষ্যত্বের সীমাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। সে জানে সাঁওতাল সমাজের চোখে অপরাধী, সমাজ তাকে ক্ষমা করে দিলেও মোহনকে সহজেই ছাড়বে না। এই আশঙ্কা থাকার কারণে দুলালী মোহনকে ছাড়ার সাহসিকতা দেখাতে পারে না। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার পরেও সমাজের কথা ভেবে মোহনহীন হতে চায় না দুলালী। কিন্তু সমাজের জোর জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। সাঁওতাল সমাজের মানুষ তাদের তাড়া করে বেড়ায়। উত্তেজিত পঞ্চুগেরামীর লোকজন দুলালীকে ধরে নিয়ে আসে রামপুর গ্রামে। সালিশি সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দুলালীর দ্বিতীয় বিবাহ হবে। সাঁওতাল সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ প্রায় হয়ে থাকে, এটাকে সাঙা বিয়ে বলে। সাঙা রীতিতে দুলালীর সঙ্গে নুলোর বিয়ে হয়।

সাঁওতাল পল্লীর পশ্চিম দিকে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে দুলালীর বসবাস। সে সমাজের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করেছে বলে সমাজের লোক জোর করে দুলালীকে বিয়ে দেয় কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ নুলোর সঙ্গে। বিয়ের আগে সাঁওতাল নারীর স্খলন এক বড় অপরাধ এবং এই অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। কুৎসিৎ রোগগ্রস্থ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গের বোঝা সারা জীবন বইতে হবে প্রায়শ্চিত্ত রূপে। বিয়ের নামে সমাজের অত্যাচার আর জুলুম দুলালীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শাস্তির নামে রীতিমত অবহেলা, আঘাত, শাসন, অত্যাচার মুখ বোঝে সহ্য করার নারী নয় দুলালী। সে তার সন্তানের দিকে চেয়ে থাকে আর মোহনের কথা ভাবে। দুলালী জানে সমস্ত মান অভিমান ফেলে দিয়ে মোহন ফিরে আসবে। মোহনও দুলালীর অভাব বুঝতে পারে, তাকে ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। মোহন মাঝি দুলালীকে পাওয়ার আশায় ঘুসরুকাটা, রামপুরহাট বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। অন্যদিকে রাতের বেলায় ঝকঝকে একখানা টাঙ্গি দিয়ে টুংরা মাঝি নুলো মাঝিকে খুন করে ফেলে। খুনি সন্দেহে দুলালীকে আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ। আদালতেই বিচার হয় নুলোকে কে খুন করে? আদালতে উপন্যাসের নাটকীয় রূপ উৎঘাটিত হয়েছে। আসলে দুলালীকে আসামী ও দোষী প্রমাণিত করার আগেই মোহন নিজেকে খুনি বলে দাবি করে। মোহন নিজেকে খুনি বলে দাবি করাতেই টুংরা মাঝির ক্ষোভ বেরিয়ে আসে- ‘ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এক ঝড়েলীর রাত, কাঁদরের ধারে ধারে টাঙ্গি হাতে উঠলুম গিয়ে দুলালীর কুড়ের সামনে; নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তখন নুলো মাঝি চালাঘরে পড়ে, চুপি চুপি ঐ টাঙ্গি দিয়ে দিলুম বেটার গলাটাকে একেবারে দু-ফাঁক ক’রে।’[১৪] আদালতের বিচারে টুংরা মাঝি দাগী-আসামী ও দোষী প্রমাণিত হয়। জর্জ সাহেবের নির্দেশে পুলিশ টুংরা মাঝিকে জেলে নিয়ে যায়। আর মোহন মাঝি ও দুলালীর মিলন হয়। সুখের ভালোবাসা ও সংসার তারা ফিরে পায়।

এই উপন্যাসে দুয়ালী ও মোহনের প্রেম জীবন আখ্যায়িত হলেও সাঁওতাল জীবনের অতি প্রাচীন পরম্পরা ‘শিকার’ উৎসবও অস্বীকার করা হয়নি। সাঁওতাল সমাজে রেওয়াজ আছে

বছরের কোনো এক সময়ে বনজঙ্গলে জন্তুজানোয়ার শিকার করার। পাহাড়ের চারিদিকে শালগাছের বনজঙ্গল, গাছপালা দিয়ে ঘেরা জঙ্গলে সংকীর্ণ রাস্তায় বাঘ খুব কম আসে, ছোট জঙ্গলে ভালুক, হেঁড়োল বা চিতা বাঘ দেখা যায়। তরুণী পাহাড়ের পাশেই আছে হলদিগড়ের পাহাড়, সেখানেই সাঁওতালরা বহু বাঘ শিকার করে। পাহাড়গোড়ায় প্রকাণ্ড ঝিঙেফুলি বাঘের গর্জন শোনা যায়। বাঘের কবলে বহু গরু ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। এই অঞ্চলের তিরিশ জন চৌকিদার আর কুড়ি জন সাঁওতাল মিলে শিকারে নেমে পড়েছিল। ইন্সপেক্টার সাহেব, ছোট দারোগা, পুলিশ ও সর্দারের বন্দুকের আওয়াজ এবং সাঁওতালদের বাজনার শব্দে হলদিগড় পাহাড়ে শিকার উৎসবে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। পাহাড়ের চারিদিকে লক্ষ্য করে ইন্সপেক্টর তার দলবল নিয়ে বাঘকে ঘেরাও করে। সর্দারের বন্দুকের গুলি চৌকিদার সাঁওতালের শরীরে লাগে। রক্তাক্ত সাঁওতাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় সাঁওতালরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পাহাড়ের নিচে সমস্ত সাঁওতাল জমায়েত হয়। মানুষ মারা প্রতিশোধ তাদের নিতেই হবে। তীর ধনুক নিয়ে উত্তেজিত সাঁওতালরা ইন্সপেক্টরের দলবলকে খুঁজে পায় না। হতাশ হয়ে সাঁওতালরা বাড়ি ফিরে এসে খবর পায় হাসপাতালেই চৌকিদার সাঁওতালের মৃত্যু হয়।

ভালুকপোতার টুংরা মাঝি ভয়ানক শিকারী। শিকারের কাজে সাহসিকতা ও অসাধারণ দক্ষতা তার, কাঁড়ধনুকের ব্যবহার খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রয়োগ করে। শিকারের গান গেয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে শিকারীরা। বিজয়ী বীরের মতো ঘনজঙ্গলে বাঘকে শিকার করে টুংরা মাঝি। বাঘের থাবায় টুংরা মাঝিও কিছুটা জখম হয়, মরতে মরতে বেঁচে যায়। পাহাড়তলির লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ভালুকপোতার টুংরা মাঝি ঝিঙেফুলি বাঘকে শিকার করে নায়ক হয়ে উঠে। তার গলায় ফুলের মালা লাগিয়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিজয়োৎসব পালিত হলো।

সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সংঘর্ষ ‘অরণ্য-কুহেলী’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। ‘অরণ্য-কুহেলী’ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে নর-নারীর বঞ্চিত জীবনের বেদনা। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সীমাহীন সংঘাত, সমাজের সংকীর্ণ অত্যাচার সামাজিকরূপেই প্রতীয়মান। গণ্ডীবদ্ধ মনুষ্যত্ব কল্যাণের জন্য নর-নারীর ব্যক্তিগত বাসনা উপেক্ষিত হয়নি। সহানুভূতির দৃষ্টিতেই সমাজের বিচার পদ্ধতি স্বীকার্য, তবুও ব্যক্তিমনের ভাবসত্য রূপায়িত। মনন ও মনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে নায়ক-নায়িকা। মননের অপেক্ষা মনের প্রাধান্য অধিক, ফলত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে আবেগ ও হৃদয়ের গ্লানি। ঔপন্যাসিক প্রেমের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাঁওতাল সমাজের সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষমতাবান সাঁওতাল সমাজের কাঠামোকে বিরোধীতা করার মানসিকতা ব্যক্তি মানুষের নেই। সেই কারণেই মোহন ও দুলালী সমাজ থেকে বহু দূরে পালিয়ে যায়। সাহসিক সিদ্ধান্ত ও হৃদয়ের আবেগের দ্বারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালিয়ে যাওয়াই প্রেমিক-প্রেমিকার অস্তিত্ব। স্থানিক পটভূমি যে ভাবে পরিবর্তন হয়েছে, সেই ভাবেই সুখ দুঃখের চিত্রও বদলেছে। সুখের আশায় সংসার করা অথচ সুখহীন জীবন, সংসারের প্রতি অনীহা অথচ সেখান থেকে বেরনোর পথ নেই। দুলালীর বেদনাময় জীবনে সংসারের দায়িত্ববোধ, সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং সংসারের অভাব, অনটনের বিরুদ্ধে লড়াই বারবার ফুঠে উঠেছে। বিনিময়ে খামখেয়ালি আচরণ, পরকীয়া প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, ভারসাম্যহীন জীবনের পরিচয় দিয়েছে মোহন। পুরুষ চরিত্রে সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল ও অর্থপূর্ণ জীবনের চিত্র অনুপস্থিত। মোহন চরিত্র একরৈখিক নয়, কিংবা টাইপও চরিত্রও নয়, বরং সে বাস্তবের জটিল চরিত্র। যেমন স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পরকীয়া করেছে, তেমনি স্ত্রীকে হারিয়ে অনুভব করেছে একাকিত্ব। সে তার স্ত্রীকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, লড়াই করেছে মাতব্বর টমাস সাহেবের বিরুদ্ধে। সে রক্ষা করেছে সংসারের মান-সম্মান। দুলালীকে বাঁচানোর জন্যে আদালতে মোহন নিজেকে দোষী স্বীকার করে, কিন্তু টুংরা মাঝির হটকারিতায় মোহন

নির্দোষ প্রমাণিত হয়। খুনি টুংরা মাঝির জেল হয়। টুংরা মাঝি টাইপ চরিত্র, খলচরিত্র হিসাবেই তার পরিচয়। বিবেকহীন টুংরা মাঝি বাঘ কিংবা মানুষ হত্যা করতেও ভয় না। আদালতের বিচার পদ্ধতির প্রতি সমাজপতিদের কোনো রকম হিংসা প্রতিক্রিয়া নেই। অর্থাৎ সাঁওতাল সমাজের বিচার পদ্ধতির গুরুত্ব কিছুটা হলেও কমে গেছে, পঞ্চগ্রামের সালিশি সভার বদলে আদালতের বিচারই মানুষের ভরসা ও বিশ্বাস।

কালীপদ ঘটক সাঁওতাল সমাজের যাবতীয় নিয়ম-নীতি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। ঔপন্যাসিক 'অরণ্য-কুহেলী' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজ ও সাঁওতাল নর-নারীর প্রেমে জটিল সমস্যা অঙ্কন করেছেন। নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক চাইতে সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজ নির্ধারণ করে কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। সমাজের সিদ্ধান্তটাই প্রেমের সারবস্তু নির্ভর করে। 'কথা দিলে কথা রাখতে হয়'- কথা না রাখলে সমাজ যে কঠিন একটা বস্তু, তা পরিষ্কার হয়। সাঁওতালদের প্রাচীন প্রথা, সমাজের একতা, জোট, বিধি-বিধান তুলে ধরাটাও একটা বিরাট দিক। সমাজের বিরুদ্ধে গেলে তার শাস্তি যে ভয়ংকর হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার এবং সারা জীবন সুখে থাকার আশায় মোহন ও দুলালী সাঁওতাল সমাজকে অস্বীকার করে পৃথিবীর নানান স্থানে পালিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথাও তারা সুখ খুঁজে পায়নি। আসলে মানুষের ভালোবাসা দীর্ঘ সময়ের, অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় পূর্ণতার জন্য। মধুর প্রেমের গভীরতা সর্বকালীন স্থায়ী থাকে। সমাজ যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই বাধাকে কাটিয়ে নর-নারীর প্রেম মধুরমিলনে সমাপ্তি হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান কোনো মতেই বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর উপন্যাস ভাবনা সময় ও পরিবেশ বিশেষ আবহে গঠিত। সময়-পরিবেশের আদলে স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতাল জীবনের অন্ধকাররূপ তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথা চালু রয়েছে। ডাইনির মতো সাংঘাতিক কুসংস্কার নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সপ্তপদী'(১৯৫৮) উপন্যাস রচনা করেছেন। জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাচীন আমলের মানুষদের বংশধর ছিল। এই অঞ্চলে বাউরি, বাগদি, মেটে, মাল, খয়রা ও সাঁওতালদের বসবাস। উত্তর ভারতের সিংহ, রায় প্রভৃতি ছত্রীরা সামন্তযুগে প্রধান হয়ে উঠেছিল। সেখানে এক একটি পরিবার এক একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। মামলা মোকদ্দমা ও ফৌজদারি সব সময় লেগে থাকত। অর্ধনগ্ন কালো রঙের মানুষ উজ্জ্বল বর্ণের মানুষের সাথে মিশে গিয়েছিল। ভাঙ্গা দেয়াল, মাটির উঠোন, জীর্ণ খড়ের চাল দিয়েই তাদের ঘরবাড়ি বানানো। বাড়ির মেয়েরা রান্নাবান্না করে, জল বয়ে আনে, ধান মেলে দেওয়া তাদের নিত্যদিনের কাজ। এই সমস্ত কালো রঙের মেয়েরা উঠান পরিষ্কার ও বাসন মাজার কাজ করে। আর পুরুষরা বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, মাঠে গরু চরায়। জঙ্গলে জঙ্গলে পুরুষের দল শিকারে যায়, সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে। টাঙ্গী, বল্লম, ধনুক, কাড় প্রভৃতি শিকারের হাতিয়ার। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভাল্লুক শিকার করে পুরুষের দল আনন্দে মেতে ওঠে। তারা বরা ও ভাল্লুক শিকারে বেশি আনন্দ পেত। তবে তারা বাঘের সঙ্গে লড়াই করত না। বন্দুকওয়ালা শিকারীদের খবর দিত। এরা মোটা চালের ভাত আর শিকারের মাংস রান্না করে আনন্দে দিনযাপন করে। সন্ধ্যার সময় সাঁওতালরা মাদলের তালে নাচে গানে ফূর্তিতে জীবনযাপন করে। পাঠান মোঘল আমলেও নিবিড় জঙ্গলে এদের বসতি ছিল। কিন্তু যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সময় থেকেই আদিবাসীদের জীবনে সংগ্রাম শুরু হয়। কোম্পানির জোর জুলুম শাসনে জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে আদিবাসীরা।

আদিবাসীদের বসতি থেকে বেশ দূরে সমতলভূমি, সেখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, প্রভৃতি জাতির ঘর বাড়ি ছিল। জঙ্গলের লড়াই তারাও কমবেশি জানত কিন্তু জঙ্গলের সৌন্দর্য সম্পর্কে

তাদের বিশেষ ধারণা ছিল না। আদিবাসীদের জীবনযাপনের ধারা সম্পর্কেও তারা খুব বেশি সচেতন ছিল না। শাল জঙ্গলের বিশেষ আকর্ষণ শাল ফুল, সেই সঙ্গে পলাশ ও মহুয়া ফুল। আদিবাসীরা পলাশ ফুলের গুড়ো দিয়ে কাপড় রং করে এবং মহুয়া ফুল দিয়ে চোলাই তৈরি করে। মাঝে মাঝে প্রশাসনের লোকজন টহল দিত, কিন্তু ধরতে পারতো না। ধরা পড়ে গেলে জেল যেতে হত।

জঙ্গলের ভিতরে রয়েছে একটি গ্রাম। সেখানে রয়েছে তিনটা ঘর এবং একটা বাংলো বাড়ি। একটি বাড়িতে থাকে যোসেফ আর সিন্ধু। যোসেফ বহুদিন আগেই খ্রিস্টান হয়েছে, কিন্তু সিন্ধু খ্রিস্টান হয়নি বলে তাদের বিয়ে হয়নি। দু'জনে ভালোবেসে সাঁওতাল সমাজ থেকে পালিয়ে এসেছে এই ঘন অরণ্য ঘেরা জঙ্গলে। এবং তারা আশ্রয় নিয়েছে পাগলা পাদ্রীর কাছে। পাগলা পাদ্রীর কাছে আরও একজন আশ্রয় নিয়েছে, তার নাম হচ্ছে ঝুমকি, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিল তিনবার, দুর্ভাগ্যবশত তার তিন স্বামীই অল্প দিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর থেকেই সাঁওতাল সমাজের সন্দেহ বাড়তে থাকে। সমাজ তাকে ডাইনি অপবাদ দেয়। সমাজের মোড়ল মাতব্বরা ঝুমকিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। অনেক কষ্ট করে পাগলা পাদরী ঝুমকিকে সাঁওতাল সমাজ থেকে রক্ষা করেছিল। পাগলা পাদরী সাঁওতাল সমাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঝুমকি সাঁওতাল গ্রামে যাবে না। ফাদারের বাড়িতে কাজকর্ম করবে। তবুও ঝুমকি ভয়ে ভয়ে থাকে। সাঁওতাল সমাজের মানুষজন তাকে দেখলেই পালিয়ে যেত। ফাদার ঝুমকিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেও ডাইনি অপবাদ থেকে বাঁচাতে পারেনি। সাঁওতাল সমাজের নারী পুরুষ ঝুমকিকে মানুষের চোখে দেখত না। পাগলা পাদরির কথাতে তার প্রমাণ মেলে- 'উরা বলে মাঝি, জাত আমার নেই, তবে মানুষ তো বটি। তুইও মানুষ আমিও মানুষ। ওই মেয়েটাও মানুষ।'[১৫] পাগলা পাদরীর ঘরে যখন লাল সিং বাবাসাহেব বিড়বিড় করত, তখন ঝুমকির মনে হত লাল সিং মন্ত্র পড়ছে। মন্ত্রতন্ত্রের ভয়ে

ঝুমকি জঙ্গলে পালিয়ে যেত। দিনের বেলা খরগোশ সজারুর মত চুপ করে বসে থাকত ঝুমকি। জঙ্গলে সারাদিন থাকার পরে ভয় কাটিয়ে উঠত, তারপর ঝুমকি আনন্দে গান গেয়ে বাড়ি ফিরে আসত। এভাবেই ঝুমকি বেঁচে থাকে, সাঁওতাল সমাজের মানুষের কাছে, এক অপবিত্র মানুষরূপেই চিহ্নিত হয় ঝুমকি।

ডাইনি সমস্যা সাঁওতাল সমাজের এক ভয়ংকর প্রথা। এই প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজদের প্রতিবাদ ছিল বরাবর। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ আমল থেকে বর্তমান সময়ের পালাবদলকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসে সাঁওতালদের ভয়ংকর প্রথা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সাঁওতাল জনজাতির বিবাহ রীতিনীতিও আছে। এই বিবাহ রীতি তাঁর 'সংকেত'(১৯৬৪) উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের কথক চরিত্র উমানাথ মুখোপাধ্যায়। উমানাথের সাথে আলাপ হয় ঘাটবলারামপুরের নারায়ণ গোস্বামীর। নারায়ণ বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী নয়, সে একজন সাধারণ মানুষ। নারায়ণের অপর নাম দুখিরাম, এই উপন্যাস আসলে দুখিরামের উপাখ্যান। সংসারে দুখিরামের শেষ নেই, কোটি কোটি দুখিরাম, অসংখ্য কোটি দুখিরাম সুখে দুঃখে জীবনের নানাপ্রান্তে ছুটে বেড়ায়। দুখিরাম ঘটাবলরামপুরের ছেলে, গোঁসাই বাড়িতে তার জন্ম। তার যখন আট বছর বয়স, তখন তার মা-বাবা মারা যায়, সেই থেকেই নারায়ণ দুখিরাম হয়ে ওঠে। আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তার জীবনে আনন্দের মুহূর্ত খুঁজে পাওয়া যায়। নারায়ণ আদিবাসী জীবন সম্পর্কে আপ্লুত হয়ে উঠে। নারায়ণকে বরণ করার জন্যে পঁচিশ-তিরিশ আদিবাসী জোয়ান হাতে হুঁকো কাঁধে গামছা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। নারাণের দাদুর সঙ্গে আদিবাসী বিপিন মোড়লের হার্দিক সম্পর্ক রয়েছে। এদের মাধ্যমেই সাঁওতাল সমাজের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে উপন্যাসে। সাঁওতাল সমাজে বিয়ের নানা রীতিনীতি রয়েছে। ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র সাঁওতালদের বিয়ের একটা রীতির প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যা করেছেন। একটা বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার পরে উভয় পক্ষের কথাবার্তা হয় কিন্তু পাকাপাকি কথা

হয় না। বরপক্ষের লোকজন কলেশনাথ চড়ক মেলা থেকেই পাত্রীকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায়। তখন গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, উভয় পক্ষের মাঝিদের লড়াই হয়। তারপর বর-পাত্রী উপস্থিত হয়, বিচারে উভয় পক্ষেই রাজি হয় এবং তাদের বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রামের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। ‘সংকেত’ উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের বিয়ের প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা নেই। এই বিয়ের সংকেত থেকে বোঝা যায় আদিবাসীদের প্রাচীন সংস্কৃতি। আসলে এই সংস্কৃতি প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক সমস্যা থাকার পরেও মানুষের আনন্দই জীবনের সারবস্তু।

সাঁওতালদের জীবন ও জগত সম্পর্কে ‘আমার কালের কথা’ (১৯৫১) গ্রন্থে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- ’সাঁওতালেরা আসত দল বেঁধে, তারা নাচত; বাঁশী মাদল বাজাত, দু-পয়সা চার পয়সা বিদায় পেত অন্দরের আঁচল ভরে মুড়ি মই মুড়কি। এসব এই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পেত।’[১৬] ইংরেজরা সাঁওতালদের শোষণ ও অত্যাচার করেছে খুব নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) উপন্যাস রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে প্রথম সাঁওতালদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই উপন্যাসে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহে’র কথা বিশেষ কিছু নেই কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতিকথা রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অহীন্দ্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জীবনকে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন তারা কালো দেখতে অথচ মসৃণ। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে কারণ সাঁওতালরা ‘আদিমবর্বর’ জাতি। তারা শান্ত নিরীহ জাতি। তারা সরল ‘বর্বর’ জাতি, শান্তভাবে জীবনযাপন করে, এদের কোনো স্বার্থপরতা নেই। আবার এই উপন্যাসের বিমলবাবুর চোখে সাঁওতালরা ‘বর্বর’, ‘অপদার্থ’ ও ভীরুজাতি। বিমলবাবুর মত উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে সাঁওতালরা খুব নিচু জাত ও দুর্বল প্রকৃতির।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বহু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন করে ভেবেছেন, তাই তাঁর উপন্যাসে এসেছে নতুন চিন্তাধারা । তিনি 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন –

> এর ভৌগোলিক পটভূমি সংকীর্ণ। এর পতন অবলীলায় একটি অংশ সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর মধ্যে ভারতবর্ষের অতীতকালের সেই আর্য-অনার্য সংঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে এবং তারই মধ্যে ভাবীকালের একটি প্রচণ্ড সংঘাতের সম্ভাবনাকে যেন অনুমান করা যায়। যার ভিত্তি আছে ও নাই এর চিরন্তন দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৭]

তিনি নতুনভাবে ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইতিহাসের বদলে উপন্যাস লিখলেন। 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ইতিহাস ও সাহিত্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথা লিপিবদ্ধ করলেন 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাসে। লক্ষ্যণীয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা পূর্ববর্তী 'কালিন্দী' উপন্যাসের মতো স্বাধীনতা পরবর্তী 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসে 'আদিমববর', 'বর্বর', 'অপদার্থ', 'ভীরুজাতি, 'নিচু জাত' ও 'দুর্বল প্রকৃতি'র জাত বলে সাঁওতালদের বিশেষ উল্লেখ করেননি।

'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের জীবনবোধ ও সাহিত্যসৃষ্টির পরিকল্পনার মূলে রয়েছে ইতিহাসের উপাদান। কারণ 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র নানা চিত্র যখন তাঁর রচনায় স্থান পায়, তখন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মহানভাবনা বহু পূর্ব থেকেই রোপিত আছে। তিনি বীরভূমের সাঁওতালদের ছোট থেকেই দেখেছেন। তাদের জীবনধারা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। সাঁওতাল সম্পর্কে তাঁর সুদক্ষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও 'দামিনি-কো' অঞ্চলের সাঁওতালদের পর্যবেক্ষণ করেছেন নতুনভাবে। সাঁওতাল জীবনের বৈচিত্রময় ঘটনা তাঁর রচনায়, কারণ বীরভূমের লালমাটি থেকে সাঁওতাল পরগণার অরণ্যভূমির মাটি লাল ও রুক্ষ। অবশ্য

তৎকালীন সাঁওতাল পরগণা বীরভূম জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবাবী আমলের বসতিহীন অঞ্চল পরিবর্তন হয়ে উঠে ইস্ট ইণ্ডিয়ার সময় থেকে-

> 'গ্রামগুলি সবই প্রায় মাটির দেওয়াল, খড়ো চাল এবং খাপরার চালের বাড়ি-ঘরের গ্রাম। হাজারখানা ঘরের মধ্যে দশখানা পাকা বাড়ি। তাও সব ইদানিং তৈরি হচ্ছে। নবাবী অমলে রাজমহলের ছিল নবাবী মহল; বড় ব্যবস্যাদারদের পাকা বাড়ি।'[১৮]

হিন্দু ব্যবসায়ী এবং মুসলিম রাজাদের পাশাপাশি জায়গীর-তালুকদার-নায়েবদের ছোটখাটো ইটের বাড়ি ছিল। এছাড়া কিছু মন্দির ও মসজিদ রয়েছে। তার বাইরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাটির বাড়ি, চারিদিকে শালজঙ্গল ও বড় বড় পাথর। সাঁওতাল পরগণার পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসতি। বনজঙ্গলে নানান পাখির আনাগোনা, সঙ্গে হরিণ, হেঁড়োল, নেকড়ে, হায়েনা, চিতাবাঘ, গুলবাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। সাঁওতালরা পাহাড়ের উপরে বসবাস করে যেমন, তেমনি পাহাড়ের নিচে আবাদী 'ডামিন' বা জব্দি' অঞ্চলেও তাদের গ্রাম। তারা দল বেঁধে কাঁড় তীর, লম্বা মোটা বাঁশের ধনুক, বল্লম হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার মাঝে যদি দিকুদের সঙ্গে দেখা হয়। আর সেই দিকুরা যদি সাঁওতালদেরকে পুঁতির মালা, রূপাদস্তার গহনা কিংবা সুতোর 'চাবকি' দেয়, তাহলে তারা খুব খুশি হয়। আরও বেশি খুশি হয় যখন তারা দু-চার সের নুন পায়। সাঁওতালদের নুনের বড় অভাব। খাওয়ার জন্য নুন ছাড়া কিছুই কিনতে পারে না। বিদায় নেবার সময় সাঁওতালরা হাতে হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে– 'জোহার, জোহর মাঝি হে! বলে। (– অর্থাৎ নমস্কার, নমস্কার মাঝিমশাই') কাঁধে ধনুকটা ঝুলিয়ে কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশিটা টেনে নিয়ে পাঁচ-সাতজন সাঁওতাল সুর তুলে গান করে।[১৯] তারা কোনো মানুষকে ভয় করে না। সাঁওতালরা বন-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুককে মেরে খাদ্য সংগ্রহ করে। সাঁওতালরা চুরি করে না, ভিক্ষাও করে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল পুরুষদের চরিত্র এবং নিত্যদিনের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত যেমন

জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি মেয়েদের সাজসজ্জা আর শারীরিক সৌন্দর্যও বর্ণনা করেছেন-

> মেয়েরা কষ্ঠিপাথরে খোদাই-করা সুঠামগঠন নারীমূর্তি। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটে না, সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা খোঁপা বাঁধে। খোঁপা থাকে জিজির গাঁথা কাঁটা ফুল। কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানে থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুজে রাখে। মেয়েদের যদি কিছু উপহার দিতে চান তবে রঙিন উজ্জ্বল ফুল দেবেন। আর এদের পরনে দুপ্রস্থ সাঁওতালী তাঁতেবোনা মোটা সুতোর কাপড়; রঙিন; একপ্রস্থ কোমর থেকে নীচের দিকে, অপর প্রস্থটাকে কোমরে একপ্রান্ত গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমরে আঁটসাঁট করে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা। রঙিন ফুলের সঙ্গে পুঁতির মালা আর একলাফি আড়াই হাত লম্বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় যদি দিতে পারেন তবে তো কথাই নেই। তবে ভাববেন না সে আপনার প্রেমে পড়বে; সে শুধু ফিক ফিক করে হাসবে এবং বলবে-দিকু তু বড় ভালো!- তু বড় ভালো![২০]

সাঁওতাল নারীর রূপ বর্ণনার পাশাপাশি সাঁওতাল পুরুষদের চেহারা ও চাল-চলন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক লিখেছেন- ‘এরা অরণ্য মানুষ, কালো রঙ, পরনে মাত্র একলাফি কাপড়, মাথায় বাবরি চুল; তাতে ফুল গোঁজে, কানে পুঁতির মালা গলায় পরে হীরে-মণিমাণিক্যের কণ্ঠহার পরার উপভোগ করে।’[২১]

ইতিহাস ও সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই ‘অরণ্য-বহ্নি’ উপন্যাসের আলোচনা-সমালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, ইতিহাসের আড়ালে থাকা সাঁওতাল জীবনের বিশ্বাসও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে বিশ্বাসের মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজের কাঠামো গঠিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে অরণ্য ও প্রকৃতি। সাঁওতালদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্রোহের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই বিশ্বাস অলৌকিক বিশ্বাস, তবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় বিশ্বাস থেকে ভিন্ন। অবশ্য তারাশঙ্কর উভয়ই বিশ্বাসকেই অনুসরণ করেছেন। উপন্যাস শুরু হয় মধ্যযুগীয় পট বর্ণনার পদ্ধতিতে। এই উপন্যাসের কথনশৈলী নয়ন পালের পট বর্ণনায়। পট বর্ণনার

মধ্যেই রয়েছে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রথম পর্বে যেখানে হাঙ্গামা ছিল না, সেখানে সাঁওতালরা বনজঙ্গল কেটে জমি তৈরি করে। সাঁওতালরা শক্তিশালী হয়ে উঠছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে, ঠিক তখনই তাদের উপরে শুরু হয় ইংরেজ-জোতদার-জমিদার-দারোগা-নায়েবদের অত্যাচার। সহজ সরল সাঁওতাল নারীরাও বাদ পড়েনি তাদের অমানবিক অত্যাচার থেকে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতাল নারীদের প্রতিবাদ-লড়াই-সংগ্রামও লক্ষ্য করার বিষয়। আর এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী ব্যতিক্রমী, তিনি সাঁওতাল জীবনের মূলে নারীদের ভূমিকা গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

ইংরেজরা কীভাবে নারীদের উপর অত্যাচার চালাত? তার দু'দিক রয়েছে। এক, সরাসরি নারীদের উপর আক্রমণ করে ধর্ষণ করা হত। দুই, জোর করে নয়, বরং ধর্মের আড়ালে শারীরিক নির্যাতন। অথচ সাঁওতাল সমাজে নারীর স্থান উপরে। বিশেষ কিছু বিধি ছাড়া সাঁওতাল সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রক্ষিত। স্বাভাবিকভাবেই নারী নির্যাতনে সাঁওতাল সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। আর এই নারী নির্যাতনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে। একদিকে প্রকৃতির ভয়ঙ্করতা আর অন্যদিকে ইংরেজদের শয়তানি কার্যকলাপ। ভগনাডিহি এলাকায় চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও শোষণ। ১৮৫৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। পিঠে বন্দুক, কোমরে পিস্তল, বুকে বেল্ট ঝোলানো বারুদ গুলি, কাঁধে ঝোলানো খাবার, মদের বোতল ও জলের বোতলের থলি নিয়ে ঝড়ের রাতে ডিউই সাহেব ঘোড়া করে রওনা দিয়েছিল। ঝড়বৃষ্টির রাতে অসহায় ও ক্ষুধার্ত ডিউইক সাহেব ঝড়ের রাতে আশ্রয়ের সন্ধানে ছটপট করছিল। অন্ধকার রাতে সাহেব একখানা ছোট ঘরের মতো দেখতে পায়। সে জোরে লাথি মেরে দরজা খুলে দেয়। তখন সে দেখতে পায়-

> একটি প্রদীপ একটি হাতের আড়াল দিয়ে বাঁচিয়ে যে ডিউইর সামনে দাঁড়াল, তাকে দেখে ডিউই হতবাক হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। ...টিকালো নাক, বড় বড় চোখ- এদেশের আশ্চর্য সুন্দর, একটু শ্যামলা ফরসা রঙ (তাদের দেশের মেয়ের মতো ফ্যাক-ফ্যাকে সাদা নয়), কপালে সিঁদুরের টিপ; মেয়েটি বললে-কে তুমি? কি চাই?[২২]

সিঁন্দুর মাখা পাথর পূজা করা ভৈরবীর মতো বর্বর জাতির কাছে ডিউই সাহেব আশ্রয় নেয়। সাঁওতাল নারী ডিউইক সাহেবকে আম ও গুড়ের মিষ্টি খেতে দেয়। ডিউইক সাহেব লক্ষ্য করে, মেয়েটির মধ্যে কোনো জড়তা নেই, লজ্জা নেই। সাঁওতাল মেয়েদের সম্পর্কে ডিউইকের ধারণা-

> মেয়েটা সাহেব দেখে ভয় করে না, সংকোচ করে না, অসংকোচে এমনভাবে কথার জবাব দিয়ে গেল! আশ্চর্য! এদেশের সন্টাল মেয়েগুলো মাথায় কাপড় ঢাকা দেয় না, সামনাসামনি কথাবার্তা বলে-লজ্জা করে না, হাসে, কিন্তু তারা বুনো জাত, অসভ্য জাত, তাদের স্বাস্থ্য আছে, যৌবন আছে-তারা লোভনীয় কিন্তু অত্যন্ত কোমল মিষ্ট।[২৩]

ভৈরবীর লোভনীয় যৌবন দেখে ডেভিল ডিউইকের মতলব পাল্টে যায়। ভৈরবীকে ধর্ষণ করার পরিকল্পনা করে সে। ভৈরবী একাই থাকে, ফলে সাহেবের ভয় নেই। ডিউইক সাহেব পরিকল্পনা মাফিক ভৈরবীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে-

> ডেভিল ডিউই তখন হরিণীর পিঠে ঝাঁপ দেওয়া চিতাবাঘের মতো তার বুকে চেপে বসে তার মুখে তার হাতের থাবা চাপা দিয়ে বলে ওঠল-চিল্লাও মাৎ, চিল্লাও মাৎ!- তারপর হেসে উঠল।
>
> এরপর খানিকক্ষণ একটা ধস্তাধ্বস্তি। আঁচড়ে কামড়ে মেয়েটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। ডেভিল ডিউইর কামার্ত তাতে যেন শতগুণে বেড়ে গেল। সে-ও তাকে আঘাত করলে, ঘুষি মারলে। মুখে কপালে।
>
> বাঘের সঙ্গে হরিণী কতক্ষণ লড়বে? হতচেতন হয়ে গেল হরিণী। বাঘ এবার তাকে মুখে ধরে হেঁচড় দিয়ে তুললে সেই চালায়।
>
> লণ্ঠনটা জ্বলছিল একধারে। ডিউই সেটাকে মাথি মেরে ফেলে দিলে- লণ্ঠনটা উল্টে পড়ল পাথরের উঠোনে। দপ্ করে উঠে ভিতরের প্রদীপটা নিভে গেল।[২৪]

কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে সন্ন্যাসী ভৈরবীকে ধর্ষণ করার সময়েই ভগনাডিহি গ্রামের ‘জহর সর্ণায়’ বাজ পড়ে। যা সাঁওতালদের বিপদ সংকেত। সাঁওতালদের ‘দেবতা’ থাকে শালগাছের নিচে অবস্থিত ‘জাহের থানে’। এই বিশ্বাস সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত। বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় প্রকৃতির সংকেত থেকেই। বাজপড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারাশঙ্করের, ‘১৯৬৫ সনে বর্ষার সময় কালীঘাটের মন্দিরের কলসচূড়ায় হয়েছিল; যার জন্য এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আধুনিকতার তীর্থস্থল কলকাতায় পরদিন লোকের ভিড়ের অন্ত ছিল না। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল উর্ধ্বদৃষ্টি উদ্‌গ্রীব মানুষদের, শুধু উদ্‌গ্রীবই বা কেন, তাদের মুখে চোখে উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। হায় কি হলো! কি অপরাধ হলো! এবং তাঁর জন্য একটা বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেছে।’[২৫] শহর ও নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন পরিবেশে যখন তিনি উত্থাপন করলেন, তখন সেই বাস্তব আরেক বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের ‘বোঙ্গা’ বিশ্বাস জাতিগত পরিচয়। তাদের উপাসনার কেন্দ্রস্থল ‘জাহের থান’। বাজ পড়া যেমন অলৌকিক বিশ্বাস, তেমনি বাস্তবে সাঁওতাল সমাজ সংকটের মুখে। নায়ক সিধু চরিত্র, সাঁওতালদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। কেননা গ্রামের সকল মানুষ সিধুকে সর্দার হিসাবে মানে। দেবতার আশীর্বাদ পেয়ে সিধু সর্দার উপলব্ধি করতে পারে যে, দিকুরা কীভাবে সাঁওতালদের কাছে থেকে কেনারাম ও বেচারামের মাধ্যমে টাকা আদায় করে। মানুষের দাম হলো মাত্র দশটাকা, আজীবন খেটে শোধ করতে পারে না। সুদের উপর সুদ চলতে থাকে সারা জীবন। তার উপর কেনারাম ভকত ও মহেশ দারোগার অত্যাচার। বারহেটে বাজারে সাঁওতাল মেয়েদের উপরে অত্যাচার বাড়তে থাকে। ইংরেজরা রুকনী-টুকনী-মানকীর মুখ বেঁধে অপহরণ করে। ঝড়ের রাতে লাল ও বিশু বাঁধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের গুলিতে কিছু করতে পারে না। এই খবর শুনে চুনার মাঝি অজ্ঞান হয়ে মারা যায়। সিধু ঠাকুর সেই ‘জহরকর্ণায়’ প্রতিজ্ঞা করে, সে তিনজন নারীকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংরেজ

সরকার ও জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেয় বীর সিধু-কানু, তারা শালপাতার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বার্তা পাঠায়-

> দিকুদের কাছে কেউ যেন টাকা ধান ধার না নেয়। তারা মানুষ না-বাঘ। তারা খেয়ে নেবে। মির খাজনা কোন সাঁওতাল যেন মহিষের হালে আট আনা আর গরুর হালে চার আনায় বেশি না দেয়। ...সব সাঁওতাল যেন আপন আপন ধনুক শক্ত করে। কাঁড় গুলি শানিয়ে রাখে। নতুন কাঁড় তৈরী রাখে। বোঙ্গা কথা বলবেন। শিগগির কথা বলবেন।[২৬]

সাঁওতালদের 'মারাং বোঙ্গা'র ঘুম ভেঙ্গেছে। তাদের ধারণা, এই দেশ ইংরেজের নয়- এই দেশ সাঁওতালদের। দেশের মাটি ও জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্যে তারা দল বেঁধে বিদ্রোহ করতে বেরিয়ে পড়ে। সেই দিন সিধু সকলকে বলেছিল-

> ভীম মাঝি, সেই ভীম মাঝি বড় ভালো লোক। সাহসী মানুষ; সত্যিকারের মানুষ। সেই লোককে জেলে পুড়েছে। মনে পড়েছে হাড়মা মাঝিকে। হাড়মা মাঝি বলেছিল– আমাদের জান গেল মান গেল জমীন গেল, সায়েব, জীবন গেল– সাঁওতালদের জীবনভোরের নফর হয়ে গেল। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের সেই অপমান। মনে পড়ছে মহিন্দর ভকতের টাকায় বাঁধাপড়া মাঝিদের। মনে পড়ছে বাপ চুনার মাঝির মৃত্যুর কথা।[২৭]

পাহাড় জঙ্গল বনবাদাড়, নদীনালা, মাঠঘাট, খেতখামার, গাছপালা, জন্তুজানোয়ার, পশুপাখি সব কিছু ইংরেজরা দখল করে। ইংরেজের অত্যাচারে নিপীড়িত সাঁওতাল গোষ্ঠী নিঃশেষিত হয়ে যায়, যার কারণে সাঁওতালরা-

> উত্তরে ভাগলপুর রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূমে ময়ূরাক্ষী উত্তর নদী পর্যন্ত– পুর্বে মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর কাঁদী থেকে রামপুরহাট নারায়াণপুর হয়ে গনপুর তিলকুড়ি বিষ্ণুপুর আব্দারপুর কাপিষ্ঠা বাজনগর আমজোড়া ঘাট থেকে পশ্চিমের দেওঘরের ধার পর্যন্ত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল আমজোড়া ঘাট থেকে সুদীর্ঘ দিনের শোষণের অত্যাচারে ঘৃণার জন্য পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভের ইতিহাসে অমোঘ বিধানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গারের মতো আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল গলিত লাভার মতো।[২৮]

ধামসা-মাদলের শব্দে হাজার হাজার সাঁওতালরা বিদ্রোহ শুরু করে বারহেট বাজার থেকে। বারহেট বাজারে প্রথমে টার্গেট হয় মহেশ দারোগা ও কেনারাম ভকত। তারা মহেশ দারোগা ও কেনারাম ভকতকে মা চণ্ডীর কাছে পশুর মতো বলি দেয়। সাঁওতালরা সেই রক্ত দিয়েই টিকা পড়েছিল। তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তাদের তীর ধনুকে বহু জমিদার-জোতদারের প্রাণহানি হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন সাঁওতাল নারীরা বিদ্রোহিনী-বীরাঙ্গনা। সাঁওতাল নারীর শক্তি ক্রমশ জমাট হতে থাকে। ধর্ষিত ভৈরবী ইংরেজের বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। তার অতীত স্মৃতি স্মরণে আসে। তখন সে মা কালীর কালো মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। কৃষ্ণ চতুর্দশীতে ভৈরবী ডিউই সাহেবকে শিকার করার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ভৈরবী মাথার যন্ত্রণায় জঙ্গলের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন তার পাশে দেখে লাল মাঝি ও রুকনীকে। তারপরে মানকীকে পাওয়া যায়, সে সাহেবকে খুন করে বেরিয়ে আসে-

> প্রতিহিংসায় জর্জর সাঁওতাল জোয়না- তার হাতে কাঁপেনি, বুক কাঁপেনি। কুকুরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে দিয়েছিল। আর্ত চিৎকার করে কুকুরটা ছটপট করছিল। অত্যাচারিতা সাঁওতাল মেয়ে সদ্য একটা খুন করে এসেছে– তার মাথায় খুন ঘুরছে- বুকে তার আগুণ জ্বলছে-।[২৯]

ইংরেজ জাতি নারীদেহ উপভোগের লোভে মারা যায়। তার মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি নেই। তিনজন নারী পাহাড়ের মধ্যে প্রায় তিন মাস থাকে। মাঝে মাঝে ভৈরবী উন্মাদ হয়ে যায়। ভৈরবীর মধ্যে এক নতুন মানসিকতা আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮৫৫ সালের সন্ন্যাসিনী চরম অত্যাচার-দুর্গতিতে সতীত্ব বুকের অন্তরের গভীরতম বিশ্বাসে ভৈরবী সিধুকে বার্তা শুনিয়ে দেয়- ‘আমাকে একটা মুণ্ড এনে দিতে পারবি? একটা সাদা মানুষ জানোয়ার! পারবি না? এই চক্র তোদের দিব আমি। তোদের কেউ রুখতে পারবে না। তোদের দেশ তোদের হবে। তোরা দু

ভাই হবি রাজা শুভোবাবু।'[৩০] প্রতিবাদের আবহাওয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১২৬২ সাল ১২ই শ্রাবণ, সংবাদ প্রভাকরের ৫৩০০ সংখ্যায় বলা হয়-

> অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দি সাহবেরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্য জাতিদিগের তিনজনে স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহার কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণ করতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করে।[৩১]

সাঁওতালদের ভয়ে বহু ইংরেজ পালিয়ে যায়। আর তিনজনের নারী শক্তি আরও বেড়ে যায়। তারা এক সঙ্গে উচ্চারণ করে- 'এই দেশ আমাদের।' তারা সিধু-কানুর পাশে থাকতে চায়। রুকনী বলে-

> আমি তুমার চাকরানী শুভোবাবু। ফুলের চাকরানী। শুধু আমাকে তুমার চাকর কর শুভোবাবু, সিপাই কর। তুমি লড়াই করবে, আমি তুমার সাতে থাকব। টাঙ্গি লিব, ধেনুক কাঁড় লিব- লড়ব আমি তোমার পাশে দাঁড়ায়ে।[৩২]

তারা বিদ্রোহিনী নারী। বেঁচে থাকার জন্যে অধিকারের লড়াইয়ে সাঁওতাল নারীর ভূমিকা অপরিসীম। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন ইংরেজ সরকার, জোতদার, জমিদার ও মজুতদারের স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী স্বর।

সাঁওতালদের ভয়ে ইংরেজরা পালিয়ে গিয়ে নতুন করে যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করে। সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে অন্ধবিশ্বাস এবং রণ-কৌশলের অভাবে। সেই বিজয়ার দশমীর দিনে সাঁওতালরা তাদের দেবতাকে পুজো দিয়ে যুদ্ধ করেছিল। আর ইংরেজ সরকারের সিপাহীরা বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করেছিল, অথচ তাতে গুলি ছিল না। কোম্পানির কৌশলটা সাঁওতালরা বুঝতে পারেনি। তারা মাদল বাজিয়ে বন-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে আর কোম্পানির সিপাহীরা পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। ফাঁকা মাঠে ইংরেজ সরকার গুলি চালাতে শুরু করে। এক সঙ্গে হাজার হাজার বন্দুক গর্জে উঠে। এতে হাজার হাজার সাঁওতালদের রক্ত গঙ্গা বয়ে যায়। বীরযোদ্ধা কানুর কপালে গুলি লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কানুর মৃত্যু হয়। আর সিধুর গুলি লাগে কাঁধের

হাতে, সিধু বেঁচে যায়। সিধু এক জায়গায় আশ্রয় নিল আর রুকনী বনে-জঙ্গলেই রয়ে যায়। ফলে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর সিধু উন্মাদ হয়ে উঠে। সাঁওতালদের কথা ভেবে সিধু দিশেহারা, সে কী করবে- কিছুই ভেবে পায় না। তার তখন রুকনীকে মনে পড়তে থাকে। রুকনীকে পাওয়ার জন্য দুর্বল শরীর নিয়ে সিধু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর ইংরেজরা টের পেয়েছিল যে সিধু বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তাদের গোয়েন্দা ছিল সাঁওতাল মেয়ে। সেই দিন সিধু শুনতে পেয়েছিল অবিকল রুকনীর মতো সাঁওতাল মেয়ের ডাক। সেই ডাকের সাড়া দিতে গিয়ে সিধু কোম্পানির সিপাহীর কাছে ধরা পড়ে। তারপর কোম্পানির সিপাহীরা সিধুকে নিয়ে যায় ভগনাডিহিতে। সেখানেই সিধুকে ফাঁসি দেওয়া হয়-

> সিধুকে ফাঁসি দিলে কোম্পানি ভগনাডিহিতে ওদের গ্রামে সকল লোকের সামনে। তখন লোককে মোটামুটি কোম্পানি ক্ষমা করেছে। ফুল তখন গ্রামে ফিরেছে। তাদের সামনেই ফাঁসি হলো তার গাছের ডালে ঝুলিয়ে। সিধু এতটুকু ভয় করেনি। বলেছিল- হেরেছি। ফাঁসি দিছিস দে। নিলম ফাঁসি। ফুল, কাঁদিস নাই। রুকনীকে পেলে বলিস-। না, না কিছু না। কিছু বলতে হবে না। দে ফাঁসি দে।[৩৩]

তার সাত দিন পর রুকনী ফিরে এসেছিল। বনে জঙ্গলে ফুল-ফল খেয়ে বেঁচে ছিল সে। রুকনী এখানে এসে সব কিছু জানতে পারে। তার প্রিয় মানুষকে মহুলগাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। বৈশাখ মাসে রুকনী ঝড়ের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেকে মুক্তি করে রুকনী।

রুকনী-টুকনী হলো সিধু-কানুর শক্তি। একজন মনোরঞ্জিনী আর একজন উৎসাহদায়িনী। সিধু ও রুকনীর প্রেমের মধ্যেও নাটকীয় বিবর্তন রয়েছে। তাদের সম্পর্ক মধুর মিলনে সমাপ্ত হত। মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদ হয়। সিধু মুর্মুর ফাঁসি হওয়ার কিছুদিন পরে রুকনী গিয়েছিল ভাগনাডিহি গ্রামে, সেখানেই জানতে প্রেমিকের জীবন কাহিনি। দুঃখে কষ্টে

বেদনায় রুকনী প্রেমিকের জন্যে আত্মহত্যা করে। এই উপন্যাস সমাপ্তি ঘটে করুণ রসে। এই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন অবস্থায় নর-নারীর মানসিকতা চিত্রিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যধরনের শিল্পী। তাঁর জীবনদৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত যুক্তিশীল। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর মানসিকতা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু দূরে থাকেন। তাই তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে–

> আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা, আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনে ছবি হয়েছে অপরূপ– কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি– বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ।[৩৪]

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহত্তর ঘটনা নিয়ে উপন্যাস সাজাতে চেয়েছেন, শুধু তাই নয় বাঙালির রোমান্টিকতাকেও তিনি প্রাধান্য দেননি। আর সেই কারণেই সাঁওতাল কিংবা আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেননি। তিনি 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'কে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যরকম ভাবে–

> নীল বিদ্রোহ, সাওঁতাল বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে গণবিদ্রোহ। কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ। মূলত ব্রিটিশ শাসন-উচ্ছেদ এসব বিদ্রোহের আদর্শ ছিল না। ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেলে তারই বিরুদ্ধে এইসব গণ-বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এসব বিদ্রোহের যে প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে ঐতিহ্য হিসাবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান কিন্তু সাহিত্যে এসব বিক্ষিপ্ত।[৩৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ব্রিটিশ শাসন-উচ্ছেদের বিদ্রোহ নয়। বিশেষ কিছু অঞ্চলে অবস্থিত সাঁওতালরা সাময়িক আক্রোশ প্রকাশ করেছিল। তবুও তাঁর 'দর্পণ' (১৯৪৫) উপন্যাসে সাঁওতালদের প্রসঙ্গ এসেছে। যাযাবরের মতো সংসার পেতেছে

সাঁওতাল নর-নারী। তারা বসবাস করে কুঁড়ে ঘরে। ফাঁকা মাটিতে তারা রান্না-বান্না করে। সেখানেই মাদল বাজিয়ে গান-বাজনা করে নারী-পুরুষ মিলে। কিন্তু এদের জীবনে একটা মূল্যবোধ রয়েছে। যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন-

> ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিসম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না, দলের যে প্রধান সে সম্মান দলেরই দান, দলের ইচ্ছা হয়েছে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, প্রধান সম্মানীয়া- সভ্য জগতের স্বাধীকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্যা মাত্র।[৩৬]

আদিবাসী সাঁওতাল জীবনকে তিনি বাঙালি জীবন থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল জনজাতির স্বাধীনতা-বোধকে। সাঁওতাল নর-নারী অনেক বেশি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। সাঁওতালদের নিয়ে তিনি বিশেষ কিছু লিখতে চাইলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত ‘তেইশ বছর আগে পরে’(১৯৫৩) উপন্যাসে। সাঁওতালদের নাম না করে সাঁওতাল জীবন-যাত্রা বর্ণনা করেছেন অপ্রত্যক্ষ ভাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল নামের বদলে আদিবাসী নাম ব্যবহার করেছেন। ‘তেইশ বছর আগে পরে’ উপন্যাসে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন আদিবাসী সংগ্রামের একতাকে।

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের বৈচিত্র্যের দিক যেমন উঠে এসেছে, তেমনি সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হলো ‘শতকিয়া’(১৯৫৮)। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা উত্তর পর্ব পর্যন্ত। বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চলের আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির দিগ দিগন্ত এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। আদিবাসী জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা নয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সুবোধ ঘোষের লেখনীতে আদিবাসী বিশ্বাস, সংস্কার, আচার আচরণ, রীতিনীতি এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ রূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘তিলাঞ্জলি’তে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক উপজীব্য বিষয়। কিন্তু ‘শতকিয়া’ উপন্যাসে আদিবাসী বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর

লড়াই। গোটা উপন্যাস জুড়ে আদিবাসীদের জীবন ও জগতে খ্রিস্টান মিশনারিদের অত্যাচার ও শোষণের প্রতিক্রিয়া উন্মোচিত হয়েছে। মানভূম অঞ্চলের মধুকুপি গ্রামের বাসিন্দা দাশু ঘুরামি। দাশু ও মুরলীর সংসার জীবন শুরু হয় বিশ্বাস ভালোবাসায়। মুরলীর জীবনে সিস্টার দিদির আগমন, যার ফলস্বরূপ দাশুর প্রতি অবিশ্বাস ও অবহেলা জেগে উঠে মুরলীর। অথচ দাশুর বিশ্বাস বেঁচে রয়েছে কপালবাবা, কানারানী কিংবা ডরানী স্রোতে। মুরলী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে আর দাশু তার বিশ্বাস ও ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারে না। বনজঙ্গলের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ভালোবাসা। জঙ্গলেও রাজনীতির নানা চিত্র পাওয়া যায়। কপালবাবার জঙ্গল, চিত্রপুরের জঙ্গল, দামোদর নদীর ধারে মিঠুয়া ঘাসী বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, বনবিড়াল, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার শিকার করার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। শিকারী মিঠুয়া ঘাসীর মৃত দেহ পাওয়া যায় কপালবাবা জঙ্গলে। পুলিশ সাহেবদের তাবু জঙ্গলের ভিতরে ছিল, পুলিশের সঙ্গে চারজন সাঁওতাল কুলি ছিল। গাছের লতাপাতা দিয়ে রক্ত মাখা মিঠুয়ার দেহ ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গোবিন্দপুর থানায়। সাঁওতালরা কুলির কাজ করে দিনযাপন করে। পুলিশ সাহেবদের অধীনে সাঁওতালদের কর্ম জগত এই উপন্যাসে উল্লেখিত। আদিবাসী লোকজীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনা 'শতকিয়া' উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সাঁওতাল জীবনের পূর্ণাঙ্গরূপ অনুপস্থিত। হাজারিবাগ অঞ্চলের সমগ্র আদিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের আখ্যান 'শতকিয়া' উপন্যাস। ক্ষমতাবান মানুষের কাছে বারে বারে অত্যাচারিত, শোষিত, নির্যাতিত আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই অম্লান হয়ে থাকে। তাদের জীবনসংগ্রাম ও বাস্তববোধ ক্ষীণ হয়ে যায়নি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা উপন্যাসে জীবন ধারার অন্যতম ঔপন্যাসিক হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'পঞ্চতপা'(১৯৫৮) উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা অনন্য ও স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিক যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তার

মূলে নিহিত আছে আখ্যান রচনার সুকৌশল বিন্যাস। একদিকে সাঁওতাল জাতির প্রাচীন সভ্যতা বিলুপ্তির পথে অন্যদিকে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি। আবার তারই মাঝে রোমান্টিক প্রেমের অন্তর্মগ্ন কাহিনি উপস্থিত হয়েছে দুটি জাতির পারস্পরিক ভাবনার যোগসূত্রে। বাঙালি ও সাঁওতাল নর-নারীর জীবনসত্য ভিন্ন কথনে গ্রথিত। ঔপন্যাসিক খুব কৌশলে বাঙালি প্রেমকে ব্যক্ত করার জন্যে অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম। উপন্যাসের মূলে আছে দুইজন পুরুষ চরিত্র ড্রাফমেন্ট নরেন চৌধুরী ও চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। আর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সান্ত্বনা, ওভারসিয়ার অবনীবাবুর মেয়ে। অবনীবাবুর বাড়িতে নরেনের যাতায়াত এবং তার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এক সঙ্গে গল্প, খাওয়া-দাওয়া ও হাসি ঠাট্টা করা তাদের নিত্যদিনের কর্ম। পাহাড়ের উপরে কিংবা নদীর ধারে বারে বারে ঘুরতে যাওয়া তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। নরেন মনে মনে সান্ত্বনাকে ভালোবাসে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। সান্ত্বনার বাবাও মনে মনে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে নরেনের সঙ্গে। সান্ত্বনাও নরেনকে পছন্দ করে তবুও নরেনের বন্ধু বাদল গাঙ্গুলির প্রতি সান্ত্বনার আকর্ষণ। বাদল গাঙ্গুলির প্রেমিকা নীলা, তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও সান্ত্বনার মন বাদলের প্রতি। শেষ পর্যন্ত সে নীলার কাছে ধরা দেয়। তারপর নীলা কলকাতা চলে যায় বাদলকে ছেড়ে। এখানেই বাদলের সঙ্গে সান্ত্বনার ঝামেলা হয়। কেননা বাদল সান্ত্বনাকে নয়, নীলাকে ভালোবাসে।

সান্ত্বনার প্রেম বিবর্তনে সাঁওতাল নর-নারীর অনুষঙ্গ এসেছে বারেবারে। চাঁদমণির বাবা পাগল সর্দার, জগমাঝি। তার ঘর ছাড়া বউ ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। স্বামী ছেড়ে পালানো মেয়ে ফুলমণি, পরপুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। আর তাতেই সাঁওতাল সমাজের আপত্তি। পালানো মেয়ের সঙ্গে সংসার করলে সাঁওতাল সমাজ সম্মানের চোখে দেখে না। গ্রামের লোক জগমাঝি পদ থেকে সর্দারকে পদচ্যুত করে। উলটো দিকে হোপুন হলো মাঝির ছেলে। স্বাভাবিকভাবেই মাঝির ছেলের সঙ্গে পাগল সর্দারের মেয়ে নিয়ে ঝামেলা হয়। উভয় পক্ষেই

এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না। হোপুন জোয়ান ছেলে, কালো পাথরকোঁদা বুকচিতানো ছেলে। কম কথা বলে কিন্তু দুই চোখ দিয়ে চেয়ে থাকে। চাঁদমণি ও হোপুনের বিয়ে হয়নি, অথচ বহু দিন আগেই বিয়ে হয়ে যেত। দুই পক্ষের অমতে বিয়ে আটকে থাকে, তবুও বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে উঠেছিল কিন্তু হোপুনের আলাদা ঘরবাড়ি নেই, রোজগার নেই, বিয়ে করলে কী করে সংসার চালাবে- এই সমস্ত কথা ভেবে পাগল সর্দার তার মেয়েকে বিয়ে দেয়নি। পাগল সর্দার হোপুনকে খুব স্নেহ করে। চাঁদমণি ও হোপুন একসঙ্গে কাজ করে। পুরুষরা মাটি কাটে, পাথর ভাঙে। আর মেয়েরা সেগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। কুলিকামিন মানুষের মুক্ত জীবনযাপন সান্ত্বনাকে বারবার আকৃষ্ট করে। চাঁদমণি মেয়েটা ভয়ানক দুষ্টু, কাজকর্মে মন নেই, কেবল হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি করে। সেই জন্যে তার বাবা হোপুনের সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেয়। হোপুনকে সকলেই সম্মান-সমীহ করে, শুধু চাঁদমণি ছাড়া। সেই কারণেই জোর করে হোপুন ওকে বেশি বেশি কাজ দেয়, কাজের চাপে মেয়ে বাবার কাছে নালিশ করে। সান্ত্বনা দেখে- 'হোপুনের দীর্ঘায়ত পাথুরে মূর্তিটি চোখে ভাসল একবার। আর যৌবনোচ্ছল চাঁদমণির মূর্তিও। হঠাৎ নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো সান্ত্বনা।'[৩৭] সান্ত্বনা সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গেও আলাপের চেষ্টা করেছে বহুবার। তবে চাঁদমণি সান্ত্বনাকে বিশেষ পরোয়া করে না। সান্ত্বনা তাদের প্রেমের দিক-দিগন্ত দেখেছে। সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম যে মুক্ত মনের প্রেম আর তার বিপরীতে সান্ত্বনার মনে বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেম মুক্তহীন। সান্ত্বনা বারবার মুক্ত প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে নিজেও পাহাড়ের উপরে সাঁওতাল নারীর মতো আচরণ করতে থাকে।

সান্ত্বনা ড্যামের মধ্যে সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখে কুলিকামিনদের জীবনসংগ্রাম। সে বার বার আকৃষ্ট হয় সাঁওতাল জীবনের কষ্টকর খাটুনি দেখে। সেখানেও রোমান্টিকতা খুঁজে পায় সান্ত্বনা- 'নিবিড় মমতায় সেই দূরের দিকে দৃষ্টি পড়ে রইল।- ওই মানুষদের রীতি আলাদা।

নারী-পুরুষ এক সঙ্গে কাজ করে। ঘরেবাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি। ওদের এই আনন্দ, এই বিনিময়টুকু বিশেষ করে স্পর্শ করে তাকে। লোভের বিষ ছড়িয়ে কলুষিত করা যেমন জঘণ্য অপরাধ, নিস্পৃহ অনুশাসনের ভ্রূকুটিতে তাকে ব্যাহত করাও তার থেকে কম নিষ্ঠুর নয়।’[৩৮] সাঁওতালদের মধ্যে জাত-পাতের ভেদাভেদ দেখতে পায় না। অথচ তার সঙ্গে নরেনের সম্পর্ক মাসি পছন্দ করে না। কারণ, নরেন তাদের জাতের নয়। তার প্রভাব সান্ত্বনার মধ্যেও কিছুটা পড়েছে। তবুও সাঁওতাল জীবনকে দেখে বারবার আত্মগত প্রশ্নে হতচকিত হয়েছে সান্ত্বনা।

‘বাদনা পরবে’র দিনে দূর থেকে চাঁদমণি চেয়ে চেয়ে দেখে সান্ত্বনাকে। আর সেই সময় সান্ত্বনা হোপুনকে লক্ষ্য করে। তাতে সান্ত্বনা তাদের ভালোবাসার বন্ধন খুঁজে পায়নি। ওদের মুখভাব খুব সুবিধার মনে হয়নি সান্ত্বনার। তার কিছু দিন পরেই চাঁদমণি পালিয়ে যায় বাহাদূরের সঙ্গে। বাহাদূর কাজ করে রণবীর ঘোষের কাছে। রণবীর ঘোষ ভদ্র মানুষ নয়, মেয়েদের মান-সম্মান-ইজ্জত নিয়ে খেলা করে। ঘোষের কারণে তিনজন মেয়েকে বিগড়ে দিয়ে বিরাট গণ্ডগোল হয়েছিল ড্যামের পাহাড়ে। সিধু-কানুর যুগে তিনটি মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে, বিরাট বড় বিদ্রোহ হয়েছিল। আর এখন বাহাদুর জমাদার একটা সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে গেছে, তবুও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কেননা চাঁদমণি নিজের ইচ্ছায় পালিয়েছে হোপুনকে ছেড়ে। অন্যজাতির সঙ্গে পালিয়েছে চাঁদমণি, স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতাল সমাজ মেনে নেয়নি। সমাজের মানুষ পাগল সরদারকে ‘বিটলাহা’ সাব্যস্ত করে। সাধারণত বিটলাহা হলে দোষী পালিয়ে যায় প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাগল সর্দার। বিটলাহা থেকে হোপুনেই পাগল সর্দারকে বাঁচায়।

তার কিছু দিন পরে চাঁদমণি সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন সান্ত্বনা লক্ষ্য করে- ‘...কালোর ওপর আলগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, ঢলঢলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার, তার নিচে যেন কালো

দীঘির ছায়া। চকচকে মুখে পুরুষ নির্যাতনের রুক্ষতা, আর...আর...মেয়েটা একলা নয় এখন... ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।'[৩৯] চাঁদমণি বাহাদুরের সঙ্গে পালিয়ে যায়নি, ঘোষবাবু তাকে পালিয়ে নিয়ে গেছে। ঘোষবাবু চাঁদমণিকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রতিদিন অত্যাচার করে। সান্ত্বনা উপলব্ধি করে- 'কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, কেন আদিম ঈর্ষায় বাদনা উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুঝতে পারছে, শাল মহুয়ার ধারে কোন্ প্রতীক্ষায় জিপ দাঁড়িয়ে থাকত রনবীর ঘোষ।'[৪০] তারপর কিছুদিন বাদেই চাঁদমণি ও বাহাদুরের দু'টি লাশ পড়ে থাকে ড্যামের পাশে। আর অন্যদিকে রূপসী কন্যা ঝরণার সঙ্গে পালিয়ে যায় রণবীর ঘোষ। কিছু দিন পরেই হোপুনও ড্যামের কাজে পাথর চাপায় মারা যায়। অসহায় একাকী পাগল সর্দারও প্রতিশোধ নেয় স্ত্রী ফুলমণির কাছে। শিকারের দিনে সে ফুলমণিকে তীর দিয়ে হত্যা করে। এভাবেই ড্যামের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

সান্ত্বনার প্রেমচেতনার মূলে সাঁওতাল নর-নারী সম্পর্কের নানা স্মৃতি লুকিয়ে রয়েছে। সান্ত্বনা প্রেমের কথা ভাবলেই চাঁদমণির কথা মনে পড়ে। চাঁদমণি আর হোপুনের নিভৃত-বিনোদনের ছাপ চেষ্টা করেও মন থেকে ভুলতে পারে না সান্ত্বনা। তার সঙ্গে নরেনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার পিছনেও চাঁদমণি ও হোপুনের প্রেমকে দেখানো হয়েছে। সে নরেনকে নিয়ে যায় পাহাড়ের উপরে। সান্ত্বনা মনে মনে আগে থেকেই ঠিক করে রাখে নরেনের সঙ্গে কী করবে! সান্ত্বনা মনে মনে নরেনকে কামনা করে। তার সঙ্গে সে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হতে চায়। নরেনকে নিয়ে বাদনা উৎসবের রাতের বিনিদ্র শয্যায় সান্ত্বনা নিজেকে পাথরের বুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাদনা উৎসবের দিনেও সান্ত্বনা নরেনকে সুযোগ দিয়েছিল। পাহাড়ের পরিবেশে সান্ত্বনা উজাড় করে দিয়েছে এক যুবকের সামনে। সান্ত্বনার মানসিক পরিবর্তনের

মূলে রয়েছে হোপুন আর চাঁদমণির প্রেম- 'সান্ত্বনা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাঁকের মুখে সেই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওধারে একদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বাঙ্গে শির-শির করে উঠল কেমন। ...অমোঘ আকর্ষণ একটা। ...আড়াল পেরিয়ে সেই ঢালু পাথর। যেখানে ওরা বসেছিল। বসে আর ছিল কোথায়! চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর ওর মুখের ওপর, বুকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেক দিনের একটা বিস্মৃতিবিলম্ব অস্বস্তি ভিতর থেকে যেন নড়েচড়ে উঠেছে আবার। যেমন উঠেছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে।'[৪১] নরেন তাকে লক্ষ্য করেছে, যখন সান্ত্বনা বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে থমকে যায়। পাথরের মধ্যে সান্ত্বনা বসে পড়ে, সেখানেই নরেনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। সান্ত্বনার যৌবন জীবনের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। নরেনও তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে বেরতে পারেনি সান্ত্বনা। সান্ত্বনা নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভালোবাসার মানুষ বাদলকে পায়নি।

এই উপন্যাসে সাঁওতাল নর-নারীর অন্তর্গত রাগ, ক্রোধ ও বিক্ষোভ যেমন আছে, তেমনি লুকিয়ে আছে অন্তরের জ্বালা-যন্ত্রণা। অন্যদিকে দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে সান্ত্বনার জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব গড়ে উঠে। গোপন প্রবৃত্তি নিরোধের নিয়মে সান্ত্বনা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক চাহিদা পূরণের কামনা, আর অন্য পুরুষের সঙ্গে মনের মিলনে বদ্ধপরিকর। সান্ত্বনার যৌবনে আবেগ উচ্ছ্বাস একটা সময় শান্ত হয়ে উঠে। সান্ত্বনার জীবনে শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন হয়েছে ঘটনা ও সময়ের পরম্পরায়। পুরুষের প্রতি তার জৈবিক ও আত্মিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ উভয় দিকই প্রকাশ পেয়েছে।

সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের বিষয়কে সামনে রেখে বেশ কিছু জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিল সত্তর দশকে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত

'অরণ্যের দিনরাত্রি', এই চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭০ সালে। কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে এই চলচ্চিত্র বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই অবলম্বনে এই চলচ্চিত্র আলোচিত-আলোড়িত হয়েছিল। সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেও উপস্থাপন ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলত সাহিত্যের বিষয়বস্তু যখন চলচ্চিত্রে প্রকাশিত হয়, তখন আলাদা একটা কাঠামো ও বয়ান হয়ে উঠে। সেই কারণেই 'অরণ্যের দিনরাত্রি' চলচ্চিত্র সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন- 'নির্লিপ্তভাবে এ ছবি দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজে এবং আমার কয়েকজন বন্ধু এই উপন্যাসের আসল চরিত্র।'[৪২] লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে। উপন্যাসের আখ্যান ও বয়ান উত্তম পুরুষে রচিত, যেখানে লেখকের সত্তা চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সঞ্জয়, শেখর, অসীম ও রবি। স্পোর্টসম্যান রবি চৌধুরী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। অসীম মল্লিকদের চার্টার্ড একাউন্টেন্সি ফার্ম রয়েছে। সঞ্জয় ব্যানার্জি লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। শেখর সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস অনার্সের ছাত্র ছিল। চার যুবকের পর্যবেক্ষণে উপন্যাসের উপাদান নির্মিত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের সূত্রপাত। এক দিকে বাঙালি সমাজ, শহরকেন্দ্রিক জীবন। অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজ, গ্রাম কেন্দ্রিক জীবন। শহরের আদব-কায়দার বিপরীতে অরণ্য ঘেরা জঙ্গলের সংস্কৃতি। শহরের উচ্চবংশজাত ও সম্পত্তি অধিকারী যুবকদের আনন্দ ফূর্তি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি জঙ্গলে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণি মানুষের খাদ্য সংকটের বাস্তব চিত্রও উঠে এসেছে। বিপরীত দুই সমাজ ও সংস্কৃতির মিলনস্থল অরণ্য ঘেরা জঙ্গল। একদিকে বাঙালি নর-নারীর প্রেম ভালোবাসা, অন্যদিকে সাঁওতাল নারীর সঙ্গে বাঙালি পুরুষের সম্পর্ক। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায় দুই ভিন্ন জাতের প্রেম ভালোবাসার স্বরূপ আলাদা। এই ক্ষেত্রে সমাজ ও

পরিবেশের গুরুত্ব বিশেষ লক্ষণীয়। শহরকেন্দ্রিক বাঙালি মানুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বেশ জটিল। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি মনের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কলকাতার পরিবেশে যে ভাবে নর-নারীরা সম্পর্কে লিপ্ত হয়, অরণ্য ঘেরা পরিবেশে সেই রকম নয়। নর-নারীর প্রেম নিবেদনের জন্য মুক্ত পরিবেশের ভূমিকা যথেষ্ট। বনজঙ্গল ঘেরা নিরিবিলি জায়গায় শহরের যুবক বনভোজনের আয়োজন করে। সেই সময়ে দুটি মহিলার খিলখিল হাসি শোনা যায়। শেখর পরম স্বস্তিতে চোখের পলকেই চিনতে পারে তার কলেজ জীবনের জয়া বান্ধবীকে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছে। বর্তমানে তার বিয়ে হয়েছে, এই অরণ্য ঘেরা জঙ্গলেও তাদের বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে তারা এখানে ঘুরতে আসে। সেই সূত্রে আচমকাই দেখা হয়ে যায় শেখর ও জয়ার। বারান্দায় বসে জয়ার উদাসীনতা শেখরকে নিস্তব্ধ করে দেয়। এই সময় বাংলোর আলো জ্বলেনি, ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। গোধূলি লগ্নে পাশাপাশি দুজন বসে আছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক, জোৎস্না রাত, এক একটা পাতার সরসরানী শব্দ। কলকাতার বাইরে একেবারে নিরিবিলি স্থানে দুজনের আলাপচারিতা। কলেজ জীবনের বান্ধবীকে পেয়ে শেখরের মন মেজাজ খুশিতে ভরে উঠে। কলেজে বহু বার জয়ার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে শেখর, কিন্তু সফল হতে পারেনি। কলেজ জীবনের দুর্দান্ত শেখর জঙ্গলে এসে শান্ত হয়ে উঠে। জয়ার হাত ধরে শেখর জানতে চায় স্বামী মারা যাওয়ার গল্প। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল জয়া, তবুও তার বর আত্মহত্যা করেছিল। সুখের সংসারে একটা ফুটফুটে সন্তান ছিল, টাকা পয়সার অভাব ছিল না। ভালোবেসে বিয়ে হওয়ার পরেও বর তাকে তুচ্ছ করে দেয়, যার উত্তর আজীবন খুঁজে বেড়ায় জয়া। শেখরের সামনে তার জীবনের ব্যর্থতা ব্যক্ত করে। বিধবা নারীর কোলে শেখর মাথা রাখে, এতে জয়ার আপত্তি নেই। জীবনের আনন্দময় সময়ের সাক্ষী থাকে এই জঙ্গল জীবন। যেন বহু বছরের সম্পর্ক ছিল তাদের। তিন বছর বিধবা জীবন পার করার পরেও শরীরের প্রতি বিশেষ টান নেই। অথচ শেখর মেয়েদের

শরীরকে শরীর হিসাবেই ব্যবহার করত। এই প্রথম বার মেয়েদের কোলে বহুক্ষণ মাথা রাখে শেখর। প্রেম ভালোবাসা ছাড়াও শরীরের নিজস্ব দাবি থাকে, কিন্তু সেটা একটা বয়সে। জয়ার বয়স সাতাশ, কম বয়সের নারীর মতো ছটফটানি নেই, সন্তান হওয়ার পর নারীর শারীরিক পরিবর্তন আসে। শরীর নয়, বরং হৃদয়ের রহস্য জানার ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। তবুও মৃত মানুষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না জয়া। ছেলেমানুষী আচরণ করে শেখর, জয়াও তার সুখটা নিতে চায়। জয়া তার অতীত জীবনকে ভুলে যেতে চায়।

জয়ার ছোট বোন অপর্ণা ছিপছিপে চেহারা, কমলা রঙের শাড়ি পরেছে। বয়স কুড়ি একুশের নারীর চোখে মুখে সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে সরলতা ও সাবলীলতা। তার কোনো রকম লজ্জা কিংবা আড়ষ্ঠতা নেই।অপর্ণার সঙ্গে অনুরাধার আশ্চর্য রকম মিল পাওয়া যায়। ফলে অপর্ণাকে দেখলেই অনুরাধার কথা মনে পড়ে সঞ্জয়ের। শ্যামনগরের জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশ্বাস। লম্বা শরীর, অটুট স্বাস্থ্য, বয়স প্রায় বাহান্ন বছর। ওয়েলফেয়ার অফিসার সঞ্জয়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা থাকার কথা নয়, কিন্তু ছাত্রজীবনে সঞ্জয়ের কাকার সঙ্গে মিঃ বিশ্বাস বিলেতের এক ফ্ল্যাটে থাকত। সেই সূত্রেই সঞ্জয় মিঃ বিশ্বাসের বাড়িতে যাওয়া আসা করে। সন্ধ্যার সময় মিঃ বিশ্বাস নিজের জীবনের গল্প বলত। যুবক বয়সে সে কতটা দুর্ধর্ষ ছিল, এই সমস্ত গল্প বলে সে নিজেকে যুবক বলে প্রমাণ করতে চায়। গল্প বলার রসিকতাবোধ তার অসাধারণ ছিল। শুধু তাই নয়, শেখরও অনুরাধাকে দেখার জন্য মিঃ বিশ্বাসের বাড়িতে যেত। অনুরাধার চঞ্চল দুটি চোখ, কথায় কথায় ইংরেজি বলার ক্ষমতা রাখে। সে অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে, বাবার সঙ্গে টেনিস খেলতে পারে। অনুরাধার সঙ্গে কথা বলার মতো সাহস ছিল না সঞ্জয়ের, কিন্তু অনুরাধাকে দেখার দারুণ এক বাসনা ছিল। সেই কারণেই মিঃ বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে সঞ্জয় অনুরাধাকে এক ঝলক দেখে খুশি হয়ে উঠতো।

রতন আচার্য মামুদপুরের যোগেন আচার্যের ছেলে। হিন্দুস্তান পাকিস্তান হওয়ার পরে যাযাবর হয়ে শহরে এসেছিল, লেখাপড়া বিশেষ কিছু করতে পারেনি। গায়ের রং ফর্সা, ময়লা খাকি প্যান্ট ও গেঞ্জি পড়ে থাকে, বেশ সবল চেহারা। বয়লার দারুণ গরমে কাজ করতে তার মুখের রংটাও জ্বলে গেছে। মজুরের কাজে তার কোনো গ্লানি নেই। একদিন একটা ছোটখাট দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গা ঠিক নয়, শ্রমিকের দল প্রতিবাদ করেছিল মালিকের বিরুদ্ধে, তাই মিঃ বিশ্বাস রতনকে পছন্দ করে না। ইউনিয়নের লোকগুলোর সঙ্গে রতনের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই কারণেই রতন নেতা হয়ে উঠেছে। কতগুলি রাজনৈতিক দল তাদেরকে সাপোর্ট করেছে দাঙ্গা করার জন্য। মিঃ বিশ্বাসের মতে শ্রমিক শ্রেণির মানুষ কাজ করে না শুধু ইউনিয়ন আর ভোট নিয়ে কারসাজি করে। মিঃ বিশ্বাস রিপোর্ট তৈরি করে সমস্ত বদমাশের দলগুলোকে ছাটাই করার জন্য। রাতের বেলায় ইউনিয়নের লোকগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। দাঙ্গার উত্তেজনা রয়েছে শ্রমিকের সঙ্গে মালিকপক্ষের। শ্রমিক আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়া হয়। ভিখুরাম স্বীকার করে, বড় সাহেবের লোক একরামকে আড়াইশো টাকা দেয় মারামারি করার জন্যে। দু'দলকে উসকানো হয়, তাদের ইউনিয়ন যাতে ভেঙে যায়। তারা যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেই কারণেই দলাদলি মারামারি চক্রান্তকারী ব্যক্তি ছিল মিঃ বিশ্বাস। কোম্পানির লোকগুলো ছাঁটাই করবার জন্য এবং শ্রমিক-মজদুর ঐক্য নষ্ট করার জন্য এধরনের দলাদলি ঘটে। একমাত্র রতনের চেষ্টাতে শ্রমিক-মজদুর ইউনিয়নকে বাঁচানোর চেষ্টা চলে। সত্তর দশকে শ্রমিক মজুরদের জীবনের ছবি ছোট একটি ঘটনার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এরই মাঝে অনুরাধা মেমসাহেবের দুর্ভাবনা ও উত্তেজনা ভুলে গিয়ে সঞ্জয় তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। অনুরাধার সঙ্গে একদিনও গাঢ়স্বরে কথা বলেনি তবুও তাকে দেখার লোভে সঞ্জয় তার নিজের মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়ার

আশায় সঞ্জয়ের জঙ্গল ভ্রমণ, সেখানেও সঞ্জয়ের স্মৃতিতে সত্তর দশকের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে।

সন্ধ্যার আগের মুহূর্তে অসীম ও অপর্ণা জঙ্গলের ভিতরে ঘুরতে যায়। ফুল, ফল, গাছপালা নানা বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা হয়। হঠাৎ করে অসীম ভালোবাসার কথা বলে, অপর্ণাও খুশিতে আপ্লুত হয়ে উঠে। কিন্তু এই ভালোবাসা প্রেমিক-প্রেমিকার পর্যায়ের নয়, সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। যেমন করে ফুল কিংবা চিকেন মৌমিনকে ভালোবাসা যায়। জঙ্গলে বেড়াতে এসেই তাদের পরিচয়, এই পরিচয় যে ভালোবাসার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা অপর্ণা ভাবতে পারেনি। তবুও অপর্ণা অসীমের কথাতে খুশি হয়। অপর্ণার সঙ্গে অসীমের এগারো বারো বছরের তফাৎ, অপর্ণার ছেলেমানুষ আচরণে অসীমের ভরসা হয় না। অথচ অপর্ণা সব কিছু বুঝে যায়। ভালোবাসা এমন জিনিস যাকে না পেলে বুকের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি করে। অসীমের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা নেই, মেয়েদের ভালোবাসতে তার ভয় করে। তবুও এই অন্ধকারে অসীমের কোনো ভয় নেই। অন্ধকার জোৎস্না রাতে দু'জন নর-নারীর অস্পষ্ট শরীর পাশাপাশি বসে আছে। অপর্ণা ছটফটে মেয়ে, সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছে। গাঢ়স্বরে কথা বলার সাহস নেই অসীমের, চঞ্চল হয়ে উঠে। বনের মধ্যে অপর্ণাকে একা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠে। অপর্ণার সঙ্গে শারীরিক মিলনের জন্যে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। মাত্র দুদিনের পরিচয় হলেও অসীম অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে, অপর্ণার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। অসীমের আলিঙ্গনে অপর্ণা শিহরণ বোধ করে না। তবুও তাকে বাধা দেয় না।

উপন্যাসে দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি পুরুষের সাথে অশিক্ষিত সাঁওতাল নারীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু কীভাবে এই সম্পর্ক তৈরি হয়? বাঙালি পুরুষের কাছে নিম্নশ্রেণির সাঁওতাল নারী গুরুত্ব পেল কী করে? এর পিছনে সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের গুরুত্ব রয়েছে। ধলভূমগড় স্টেশনে চারজন যুবকের চোখে ধরা পড়ে আদিবাসী

সাঁওতাল নারী, যারা কিনা গত কয়েকদিন ধরে কিছুই খেতে পায়নি। এখানেই বাঙালি যুবকদের সঙ্গে সাঁওতাল নারীদের পরিচয় হয়। চারজন যুবকের চিন্তাচেতনা ও জীবন অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা সকলেই বন্ধু। জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় নিমগাছের তলায় চালাঘর, সেখানেই বহু নারীপুরুষ বসে আছে। জঙ্গলের মধ্যে সুরাপানের আসর, আদিবাসীদের মহুয়ার রস খোঁজার অপেক্ষায় চার বন্ধু। জঙ্গলের ভিতরে বিক্রয়ের অনুমতি সরকারের। বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গানো, কাউন্টারেই লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। চারজন অ-আদিবাসীদের দেখে জঙ্গলের মানুষজন আতঙ্কে তটস্থ, পুলিশ ভেবে সবাই পালানোর চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে যুবতী মেয়ে তার পুরুষ সঙ্গীকে টেনে তোলে। শহরের চার যুবক এই ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত নয়। সভ্যসমাজের কাছে অস্পৃশ্য, ছোটলোকদের জায়গায় শহরের চার যুবক ঘোরাঘুরি করে। চার বন্ধু বুঝতে পারে বাবু সেজে তাদেরকে ভয় দেখানোর কোনো অর্থ নেই, বরং তারা সাধারণভাবে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে বেশি মজা পাবে। রবি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে, মুরগির মাংস নিয়ে লখার সঙ্গে ঝামেলা বাঁধে। হতচকিত লখাও মাথা নিচু করে থাকে। শহর ও গ্রামের আচরণ এক নয়, জঙ্গলের মধ্যে শহরের মতো আচরণ করে রবি। সে জঙ্গলের মানুষ কিংবা দোকানের মালিকের সঙ্গে ঝামেলা করে। শেখর কম কথা বলে, জঙ্গলে চুপচাপ বসে থেকে শহরের কথা মনে করে। ধীরে ধীরে দোকানপাট বন্ধ হয়ে ওঠে। বনের অন্ধকারে অজ্ঞান পুরুষকে কাঁধে করে পালিয়ে গেল যুবতী নারী। মেয়েদের কোনো আব্রু নেই, নর-নারী মিলে সুরাপান করে। উৎসবে নারী-পুরুষ একে অপরের হাত ধরে নাচগান করে।

ধলভূমগড় স্টেশনে দশ-বারো জন সাঁওতাল মেয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকাল দশটার সময়ে। তাদের বয়স প্রায় পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বয়স, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। তার মধ্যে পনেরো বছরের নীল শাড়ি পরা মেয়ে বাবুদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট হাসি হাসে। কালো পাথরের মতো তাদের চেহারা। তার মধ্যে একজন মেয়ে ফরসা

দেখতে, সাদা শাড়ি পরে তাকে সুন্দর লাগে। মেয়েগুলো জঙ্গলে থাকে কিন্তু শাড়িগুলি ময়লা নয়। কুলির কাজে রোজ তাদের আসা-যাওয়া এই ষ্টেশনে। ব্লাউজহীন বুক ও শাড়ি পরে থাকলেও ধূলভূমগড় অঞ্চলের মানুষজন সাঁওতাল নারীদের চেয়েও দেখে না। কিন্তু কলকাতা শহরের চারজন যুবক বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলোকে দেখে। শেখরের মতে সাঁওতাল মেয়েরা ক্রীতদাস, কুলি-মজুরের কাজে নিত্যদিন পার করে। রোজ রোজ কাজ পাওয়া যায় না, তবুও তারা হাসি মুখে থাকে।

রবি সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়, তাদেরকে কাজ দিতে চায়। রবির সাহসকে সঙ্গ দেয় অসীম। শেখর আর অসীমের মধ্যে অসহায়, ক্ষুধার্ত সাঁওতাল নারীদেরকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। শেখর আর সঞ্জয় প্রতিবাদ করে- 'আমরা জঙ্গলে এসেছি, জংলী হতে আসেনি। আমরা যেখানেই যাই, আমরা সভ্য মানুষ।'[৪৩] সঞ্জয় দুঃখে ও অভিমানে আপন মনে উচ্চারণ করে- 'কোনো মানে হয় না, আমরা মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করি না, শুধু নিজেদের আনন্দ ফূর্তি, কোনো মানে হয় না।'[৪৪] জঙ্গলি গন্ধের টানে রবি পালিয়ে যায় অন্ধকার জঙ্গলে- 'পোশাক খুলে ফেরার পর শরীরের সঙ্গে আত্মাও যেন আর কিছু গোপন রাখতে চায় না! রবি কেন এত ছটফট করছে শেখর জানে। ওর আঘাত আর দুঃখ, শহরে যা গোপন রাখা যায়, এই অরণ্যে এসে তা আরও বিশাল মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৪৫] রবির আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠে। মনের অবচেতন সত্তা শরীরের চরিতার্থে আনন্দে জেগে ওঠে, যার বেগ টানা মুশকিল। রবি জংলী জাতির মতো আত্মহারা হয়ে উঠে শরীরের লোভে। সে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আদিবাসী মেয়ে-পুরুষের নাচের দলে মিশে যায়। নাচের তালে মাদলের আকর্ষণে রবি আশ্চর্যবোধ করে। রবির এই জংলী জীবন উপলব্ধি করে সঞ্জয়, তাই তার মত হলো- 'সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অনেকটা সভ্য আমেরিকানদেরই মতন, মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে মিলছে খোলাখুলি নাচছে, মদ খাচ্ছে। কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই।'[৪৬] সাঁওতাল নারীদের

সঙ্গে মিশে কলকাতার সভ্য জাতির মানসিকতা লুপ্তপ্রায়, সেই কারণেই রবি পূর্ণ স্বাধীনতা পায় আদিম ও বনবাসী মানুষের মধ্যে।

অভিমানিনী দুলির সঙ্গে রবির আলাপচারিতা হয় গভীর জঙ্গলে। দুলির কোনো লাজ-লজ্জা নেই, সাঁওতাল মেয়ে হয়েও ভিন্ন জাতির পুরুষের সঙ্গে তার মেলামেশা। রবি দুলির সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, আর দুলির কাছে এটাই শ্রেষ্ঠ রাত- 'সে কাজ পায় না, তার স্বামী নেই, সে একটা সামান্য হতভাগ্য প্রাণী, আর এই সুন্দরপানা বাবুটা এত লোক থাকতে, তাকেই আদর করছে, তার এই সামান্য শরীরটাকে নিয়ে কত খেলা করছে, এত সৌভাগ্য সে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?।'[৪৭] রবি দুলির কালো শরীরে মিশে রয়েছে। দুলির মুখে রবি গন্ধ পায়- রসুনের, চুলের বাসি জল ও শরীরে শ্যাওলার গন্ধ। রবির কাছে দুলির ঠোঁট ও বুক নোনতা মনে হয়। যে রবি এতকাল ধরে শহরের মেয়েদের কাছ থেকে- শ্যাম্পু, সাবান, পাউডার ও স্নো'র– রুচিশীল গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু দুলির সঙ্গে রবির এই সম্পর্ক কতটা ভয়ংকর হতে তা রবির ধারণার বাইরে। রবির পিছনে পিছনে সাঁওতাল পুরুষ হাজির হয়, সাঁওতাল পুরুষ গর্জন করে- 'ইউ বাস্টার্ড, ইউ সান অব আ বীচ- ইউ থিংক সানথাল গার্লস আর ফ্রি-'।...আপনারা কি ভাবেন? চিরকাল একজিনিস চলবে? যাকে তাকে ধরে মারবেন? আমাদের মেয়েদের কোনো ইজ্জত নেই? আমাদের মেয়েদের নিয়ে যা খুশী করবেন?'[৪৮] বাবুরা চিরকাল সাঁওতাল মেয়েদের মান-ইজ্জত নিয়ে খেলা করে এসেছে। মেয়েদের নিয়ে যা খুশি তাই করে। রবিও প্রতিবাদ করে- 'বেশ করবো! যে চোর, তাকে নিশ্চয়ই মারবো। মেয়ে আবার আমাদের তোমাদের কি? যাকে পছন্দ হবে-আমি কি ওকে জোর করে এনেছি।'[৪৯] রবি দুলির সঙ্গে শুধু শারীরিক সম্পর্ক করেছে। সে দুলির শরীরটাকে নিজের ইচ্ছা মতো ভোগ করেছে। কোনো অন্যায় সে করেনি, পাপ কাজও করেনি। তাহলে কেন এত মার খেলো সাঁওতাল পুরুষদের কাছে? রবির জীবনে এই ভয়াবহ শাস্তি এল কী করে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে প্রেম

সম্পর্কে ভিন্ন মত পায়। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ প্রকাশের সময়ে ‘শরৎ-শীত সংকলনে ‘বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ’ অংশে ‘দৈনিক কবিতা’তে বলা হয়েছে– ‘রোমান্টিক প্রেমের প্রতি আমার আসক্তি দুর্বার তেমনই ভীতিও কম নয়।... আমি নিজে প্রথমটির প্রতি হয়তো একটু দুর্বল বলেই, দ্বিতীয়টিকে হয়তো একটু শ্রদ্ধা করি।’[৫০] ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাঁওতালদের কতটা শ্রদ্ধা করেছেন, তা বড় প্রশ্ন। কারণ সাঁওতাল নর-নারী অন্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হলে সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারে না। তা সাঁওতাল সমাজের বিধির বাইরে পড়ে। আসলে সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে খুব বেশি গবেষণা করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ তিনি সাঁওতাল জীবনকে যেভাবে দেখেছেন– সেই দেখার মধ্যে গভীরতা নেই। তিনি শহরকেন্দ্রিক সমাজ থেকে বন জঙ্গলের পরিবেশে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি সাঁওতালদের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সঙ্গে তিনি কিছু বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট ঘটনা সুগভীর সংযমে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি নর-নারীর প্রেমে দেহ কামনার ইঙ্গিত রূপায়িত হয়েছে। শেখর ও জয়ার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে নিরিবিলি পরিবেশে। দীর্ঘ দিন পর শারীরিক চাহিদা মেটানোর আবেগ-অনুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে। শেখরের অভিজ্ঞতা হয় শারীরিক মিলনের চাইতে মনের মিলন খুব গুরুত্বপূর্ণ। জয়ার মোহময়ী ছলাকলা নেই, বরং স্বাভাবিকভাবেই শেখরের দেহমনের মানসিকতাকে মূল্যায়ন করেছে। বাস্তব ও যুক্তির মাধ্যমে অসীম ও অপর্ণার সম্পর্ক গড়ে উঠেনি, অপর্ণার ভরা যৌবনে আকৃষ্ট হয়েছে অসীম। অল্প বয়সী অপর্ণাও নারী হওয়ার বাসনায় অসীমের গোপন ইচ্ছাকে সঙ্গ দেয়। শুধু শরীরের সম্পর্ক নয়, নর-নারীর মনের মিলনও উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সাঁওতাল নারীর দেহ কামনার মূলে মনের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বহু বছরের অবচেতন সত্তা রবি

চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবি তার যৌন জীবনের স্বাধীনতা উপলব্ধি করে এই জঙ্গলে। রবির কাছে নারীর অর্থনৈতিক সংকট বিশেষ দামী নয়, বরং সেই সুযোগ গ্রহণ করে দুলির যৌনতাকে উপভোগ করা। অথচ সঞ্জয়ের সঙ্গে অনুরাধার যে প্রেম ভালোবাসা দেখানো হয়েছে তা খুব মার্জিত। কলকাতা শহরে সঞ্জয় অনুরাধার সঙ্গে কথা বলার সাহস পায় না, অথচ জঙ্গলে গিয়ে রবি সাঁওতাল নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। একই পরিবেশে দু'জন পুরুষ চরিত্র ভিন্ন ধরনের। সঞ্জয়ের মার্জিত রুচিসম্মত প্রেম আর রবির খামখেয়ালি জীবন। ভিন্ন জাতের নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া সহজ নয়। অর্থের লোভ দেখিয়ে গরিব মেয়েদের যৌনতা উপভোগ করে রবি। অর্থাৎ ক্ষমতাবান মানুষের কাছে অসহায় নারীর আত্মসমর্পন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চারজন বাঙালি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন। এক, সাঁওতাল জীবন ও সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গি। দুই, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি সাঁওতালদের প্রতি। আবার বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিকে তিন রকম ভাবে দেখিয়েছেন। প্রথমত, বাঙালিরা সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেছে। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরা সাঁওতাল নারীকে ব্যবহার করেছে। আর তৃতীয়ত, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব। তবে শেষ পর্যন্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাঁওতালদের প্রতিবাদীরূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বাঙালিরা সাঁওতাল মেয়েদেরকে ভোগ করার চেষ্টা করে। অথচ তার যে ভয়ংকর ও মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে- তারই বিবরণ 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সত্তর দশকে সাঁওতাল ও বাঙালি জীবনের রাজনীতি নিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'তৃণভূমি'(১৯৭০) উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসের একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক আখ্যান অন্যদিকে রয়েছে প্রেমের বয়ান। প্রেমের বয়ানে রোপিত আছে রাজনীতির জটিলতা। প্রেম এবং রাজনীতি পারস্পরিকভাবে যুক্ত। সময়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম সমাজের চিন্তা চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। সামাজিক চিন্তার মূলে আছে গ্রামের পরিকাঠামো। গ্রাম সমাজের

সাংগঠনিক প্রণালী পরিচালনা করে জোতদার জমিদাররা। জমিদার প্রথার সঙ্গে যুক্ত থাকে মহাজন ও প্রজা। মহাজন ও প্রজার দ্বন্দ্ব, লড়াই, ক্ষোভ, আন্দোলন ও বিদ্রোহের উত্তাপ বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। যার ফলে গ্রামের মানুষ জমিদারি ব্যবস্থায় বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিপন্ন মানুষ গ্রামীণ সমভূমি থেকে রাজনীতির আখড়ায় পদার্পণ করে। গ্রামের রাজনীতি দিয়ে সূত্রপাত হলেও সত্তর দশকের রাজনীতি গ্রামের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। তখন গ্রামবাংলার মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। গ্রামের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে রাজনীতি কীভাবে এলো? সেই রাজনীতিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাবধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এসেছে কী? আসলে সত্তর দশকের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামীণ সমাজে জমিদারের দাপটের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের অভ্যুত্থান। এই উপন্যাসে দেখা যায় গ্রাম এবং শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি, সর্বোপরি গ্রামবাংলার সংগ্রাম, আন্দোলন ও বিদ্রোহ। জমিদার বংশের ছেলে আদিনাথ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারই আইন কানুনে গ্রামসমাজের নীতি নির্ধারিত হয়। জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তারই ছেলে আদিনাথ। আদিনাথ শিক্ষিত ছেলে, বহরমপুর থেকে স্নাতক পাশ। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র। সে গ্রামের মানুষকে অনুসন্ধান করেছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। গ্রাম সমাজে সাধারণ মানুষের বিরাট ভূমিকা থাকে সমাজ গঠনের দিক থেকে। যেখানে তার বাবা সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দিতে চায়নি, সেখানে আদিনাথ গ্রহণ করেছে গ্রামীণ মানুষের মতাদর্শ। গ্রামের মানুষ তার শত্রু নয়, তাই তাদের প্রতি সে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে লক্ষ করেছে আদিবাসী সমাজের একতা ও দলবদ্ধ জীবন। এলাকায় বহু আদিবাসী গ্রাম, স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসী সমাজকে উপেক্ষা করা যায় না।

গ্রামে-গঞ্জে রাজনৈতিক পরিবেশ জটিল হয়ে উঠে। ছোটলোক'দের উপর যে হাত রাখতে পারবে, তার দিকেই ভোট যাবে। নিম্নশ্রেণির হাতে ভোট ব্যাঙ্ক। এই অঞ্চলে কুনাই-বাউরী-সাঁওতাল-ডোম অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের ভোটার প্রায় দুয়ের দিন অংশ। এবং হিন্দু ও

মুসলমানের ভোট ভাগ হয়। ফলত ভোট ব্যাংকের লোভে গ্রামের যুবক, ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক কাজে অবতীর্ণ হয়ে উঠে। যাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শও নেই, তারাও দলে দলে গণসংগ্রাম, গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামের জীবন স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হয়ে উঠে, ঔপন্যাসিকের ভাষায়- 'অন্তত যে একবার এই তৃণভূমিতে একটিবেলাও হেঁটেছে, জেনেছে- দেখেছে মানুষের জগৎ ছাড়াও আরও কত জগৎ আছে- কত গভীর উত্থান-পতন প্রেম-মৃত্যু-রক্ত-অশ্রুতে ভেজা আরও আরও জীবন, প্রাণের আরও কত স্পন্দন।'[৫১] এইসব দীনহীন নিম্নশ্রেণির মানুষগুলো অপরিমিত শক্তি সংগ্রহ করে উপযুক্ত বোতামটি টিপে ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সত্তর দশকের ভোট ব্যাংক গঠিত হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের সক্রিয়তায়। যেখানে রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামের সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেছে। সাজোডাঙ্গার প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার বিপিন রাজনীতির পাণ্ডা, ম্যাট্রিক পাশ। হিজরোল গ্রামের মানিক বেসরা, যামির আলির সঙ্গে মাথা পিছু পাঁচ টাকা রেটে লাঠিয়ালের কাজ করে। সেও আলোচনা-সমালোচনা করে রাজনৈতিক বিষয়।

উপন্যাসে দেখা যায় জমির লোভে নীলবাবুর রাজনীতি। পরাশর চৌধুরী বাড়ি থেকে জমিজায়গা ও সম্পত্তির ভাগ নীলবাবুরা নিয়েছে তবুও সে চৌধুরী বাড়ির ভাগ নিতে সংগঠন তৈরি করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাড়ি ভাগ নেবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নিশানাথ ও লাঠিয়াল মানিকের ঐক্যবদ্ধ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা মিলিত হয়ে প্রতিবাদ করে। বাড়ির অংশ নিয়ে বহু মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। নিশানাথ ও মানিক যে করেই হোক বাড়ি বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু নীলুবাবুর সাঁওতাল লাঠিয়ালরা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেনি। নীলবাবুর সঙ্গে সাঁওতাল লাঠিয়ালরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাজনৈতিক কর্মীর মতো তারাও কৌশলে আক্রমণ করে। আদিবাসী মানুষও সত্তর দশকের রাজনীতি বুঝতে

পারে- 'বাথানের লোকগুলো এখন বাইরের ওই ভাষা বুঝতে পারছে। ওরা কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নিয়ে আলোচনা করছে। তার পটভূমিতে এই বিল-জঙ্গল অনাবাদী জমি, তার বাঁধ, ফসল- পরাশর চৌধুরী, পালিত সায়েব- সবকিছু এসে পড়েছে। এমনকি গঙ্গুর মত নির্বোধও বলছে, ইবারে ভোটগুলোন সব পাবে কমিনিস্টরা। গোপালবাবু জিতবেই।'[৫২]

সত্তর দশকের শাসক গোষ্ঠীর প্রতীক চরিত্র শুভেন্দু বাবু, জঙ্গলেই তার টেস্ট রিলফ ক্যাম্প আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিনিধি শুভেন্দু। থানার অফিসার ও পুলিশের সঙ্গে শুভেন্দুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অন্যদিকে পরাশর চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদন করে। শুধুমাত্র নিশানাথ পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলি তাকে নানা ভাবে প্রলোভন দেখায়। শুভেন্দুর কথাতেই ধরা পড়ে- 'নিশাবাবু, এযুগে রাজনীতির তালে তালে মানুষের জীবনের ওঠাপড়া নির্ভর করছে। আপনি যতই এড়িয়ে থাকুন, আপনার পরিত্রাণ নেই। কোথায় পালাবেন? যে কোন দলে নাম আপনাকে লেখাতেই হবে। সামনে ঘোরতর দুঃসময় আসছে।'[৫৩] উচ্চবর্ণ মানুষের সমকক্ষে আদিবাসীদের ব্যক্তিত্বকে বিলীন করার প্রক্রিয়া চালায় শুভেন্দু। সেই কারণেই নিশানাথকে উচ্চশ্রেণির দলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে।

আর নিম্নশ্রেণির আদিবাসীরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। বিপিন বেসরা, ফিলিপ টুডু কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বিরাট সংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থক বনে জঙ্গলে আস্তানা স্থাপন করে পুলিশের অত্যাচার, ক্ষোভ, ঘৃণাবোধ থেকেই। তারাও সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করে। আন্দোলনের উদ্দীপনায় জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক, বোমা, মেশিন গানের মত শক্তিশালী অস্ত্র যোগানের কারসাজি চলে। সাধারণ মানুষকে কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থক হিসাবে গড়ে তোলায় ফিলিপ টুডুর লক্ষ্য। সেই কারণেই নিশানাথের কাছে গর্জে উঠে ফিলিপ- 'সবার আগে ওই লোকগুলোই তো কম্যুনিস্ট হবে- অল দোজ হ্যাভনটস! আজ বিশ বছর ধরে তাদের কথা কেউ ভাবেনি। হ্যাঁ, ভেবেছে- শুধু ইলেকশনের সময়। ...আই ডোন্ট বিলিভ ইন

ইলেকশান পলিটিক্স। ইট ইজ নাথিং বাট অ্যাবসোলিউটলি এ ফরজারি টু দি প্রোলেটারিয়েট।’[৫৪] এই রকম আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি প্রকাশ পায় ফিলিপের কথনে, তার নিশানা শুভেন্দু বাবুর দিকে। কারণ শুভেন্দুর নির্দেশে মানিকের বন্ধু গঙ্গু গুলিবিদ্ধ হয়। শুভেন্দু পালিতের চক্রান্তে মানিক, প্রহ্লাদ, মহিম, সম্ভু ও উদয় আসামী। আসামী মানিক পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। মানিক বুঝতে পারে লাঠির যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ের যুগ।

১৯৬৭ সালে গ্রাম বাংলা উত্তাল হয়ে উঠে। এই সময় রাজনৈতিক শ্রেণিচরিত্রের নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাঁওতাল ডাক্তার ফিলিপ বিদেশী সরকারের এজেন্ট। পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়ায়, কারণ ফিলিপ ডাক্তার মানিককে বন্দুক সাপ্লাই করে। কমরেড মানিকের হাতে বন্দুক, বন্দুকই একমাত্র সংগ্রামের হাতিয়ার। এই সমস্ত দেখে নিশানাথ ভাবে- ‘এই সেই মানিক- সারাজীবনের সঙ্গী তার, এই আদিম প্রকৃতিজগতের এক অংশ সে, আজ বিপ্লবী- তার হাতে বন্দুক, গায়ে অদ্ভুত পোষাক। কিন্তু আসলে সে যে এই আদিম বন্য পৃথিবীর একটা দুর্ধর্ষ অন্ধশক্তি।’[৫৫] আদিম প্রকৃতি জগতের মানিকের হাতে আধুনিক যুগের অস্ত্র। বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে বেঁচে থাকে। জমি দখলের দিন মানিক শুভেন্দু পালিতের বউকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। বোসবাবু বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল মানিককে। নদীর বাঁকে মানিকের লাশের পাশে শুভেন্দু ফিলিপ টুডুকেও হত্যা করে। নিশানাথ চিৎকার করতে থাকে- ‘কী চায় ফিলিপ টুডু? কী চায় ওরা ? কেন ওরা রক্ত আর আগুনের খেলায় মেতে উঠেছে ? ...প্রশ্নের পর প্রশ্ন। নিশানাথ অস্থির আর অস্থির। নিজেকে এত অকিঞ্চিৎকর লাগে এতদিন...কারণ, এই তৃণভূমিতে আর কোন ভূমিকা নেই।’[৫৬] সারা গাঁয়ে জমাট রক্ত ছেঁড়া কালো পোড়া পোষাক ফিলিপের। তার পাশে বন্দুক পড়ে রয়েছে। ফিলিপের মুখ তুলে ধরে অরুন্ধতী। নিশানাথ রক্তাক্ত অবস্থায়

অরন্ধতীকে উদ্ধার করে। শুভেন্দুর কাছ থেকে নিশানাথ বন্দুক কেড়ে নেয় আর শুভেন্দুকে গুলি করে মারে।

'তৃণভূমি' উপন্যাসের অন্যতম জটিল সমস্যা হলো রাজনীতির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক এবং প্রেমের মধ্যে রাজনীতির সম্পর্ক। রাজনীতির আঙ্গিনায় নর-নারী সম্পর্কের মানসিক ও প্রাকৃতিক অস্তিস্ত্বের সঞ্চার হয়। বাঙালি নর-নারী নিশানাথ ও চন্দনার প্রেম যেমন আছে তেমনি সাঁওতাল নর-নারী ঝুমরি ও ফিলিপের প্রেমের সম্পর্কও আছে। বাঙালি ও সাঁওতালি প্রেম সম্পর্ক কীভাবে রাজনৈতিক আকার ধারণ করে, তার বিবৃতি উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। জনসমক্ষে প্রচারিত হয় যে আদিনাথের সঙ্গে চন্দনার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। জনসমাজে লজ্জা নিবারণের তাগিদেই আদিনাথ অন্ধকার রাতে চন্দনার স্বামী কবিরাজকে খুন করে। সাপের কামড়ে কবিরাজের মৃত্যু হয়েছে বলে জনসমাজে আদিনাথ প্রচার করে। কিন্তু সাঁওতাল বৃদ্ধ মানকু হাড়াম খুনি আদিনাথের কর্মকাণ্ড জানে। আদিনাথের কর্মকাণ্ড ছেলে নিশানাথও জানতে পারে। তারপর থেকে বাবা ও ছেলের মধ্যে তৈরি হয় খারাপ সম্পর্ক। এরপর অপমানে লজ্জায় বান্দুকের গুলি দিয়ে আদিনাথ আত্মহত্যা করে। তখন স্বামী হারা চন্দনা খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সারা হিজরোল গ্রামের মানুষ তাকে অপরাধী তকমা দেয়। সেই সময়ে চন্দনার পাশে নিশানাথ এগিয়ে আসে এবং চন্দনার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। নিশানাথও চন্দনার প্রতি দৈহিক কামনা করে জীবনের বড় ভুল করেছিল। তাকে লজ্জায় গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল বন্ধু মানিকের গ্রামে। এইদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয় চন্দনা। চন্দনার চরিত্র বারবার পরিবর্তন হতে থাকে। নিশানাথ বাঙালি চরিত্রকে বুঝতে পারেনি, অপর প্রান্তে সাঁওতালদের সহজ সরল মনে হয়েছে। ঝুমরির মতো স্পষ্ট চরিত্র নয় চন্দনা, তার মনে ঘুরতে থাকে জটিল জীবন। বহরমপুরে চন্দনা নানান দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। সে লাল পতাকা নিয়ে জেলাশাসকের সামনে মিছিল করে।

মানকু হাড়ামের মেয়ে ঝুমরি, চন্দনার সমবয়সী। অসভ্য মেয়ে ঝুমরি চন্দনাকে নিজে থেকে বলে- 'বুকের কাছে আঙুল যেতে না যেতেই চন্দনা নিজেই সরে আসে। ছোঁবে না সাঁওতালকে। ছিঃ ওরা অখাদ্য কুখাদ্য খায় নাকি। শরীরটা তো বটেই- ওই উঠন্ত বুকদুটোও যেন বা ইন্দুঁর সাপখোপের মাংস দিয়ে তৈরী। তবে সাধ থেকে যায় দেখতে ওদের বুক কি সত্যিসত্যি খুব শক্ত হয়?'[৫৭] এই নিয়ে নানা রসিকতা চলে। এ যেন রসিকতার বিষয়! ময়নাডাঙ্গার ফিলিপ টুডুর সঙ্গে ঝুমরির প্রেম সম্পর্ক। তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে ধর্মনীতির উপরে। ফিলিপ নিঃসঙ্কোচে নিশানাথকে জানায়- 'টু টেলিউ ভেরি ফ্রাঙ্কলি নিশাবাবু, আমরা দু'জনে জু'জনকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, ঝুমরি সাঁওতাল, আমার জন্ম টোডা বংশে। আমি অবশ্য খ্রিস্টান। ঝুমরি এখনও বাপ্তাইজও হয়নি। ওর বাবা আছে। সমাজ আছে। যাই হোক, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জেদের কথা তো জানেন। আমার ভয় হচ্ছে, 'বাইশাগ্রামী' করে আবার ঘর জ্বালিয়ে না দেয়। অবশ্য ওখানে এডুকেটেড আদিবাসী রয়েছেন।'[৫৮] সাঁওতাল সমাজ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষকে মেনে নিতে পারে না। সমাজের লোক ফিলিপের সঙ্গে ঝুমরিকে মেলামেশা করতে দেয় না। সাঁওতাল সমাজের মোড়ল বিপিন বেসরার দলবল ঝুমরিকে শাসায়। ফিলিপকে তীর দিয়ে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। তাকে তারা আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। অথচ আদিবাসীদের মধ্যে ফিলিপের জনপ্রিয়তা কম নয়। আদিম সারল্য জীবন নিয়ে ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতি করে বিপিন বেসরা। কমরেড বিপিন বেসরার চক্রান্তে ফিলিপ ও ঝুমরির প্রেমের সম্পর্ক নষ্ট হয়। সে নিশানাথকে বলে- 'ওই মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম। গভীরভাবে ভালবাসতাম ওকে। ...গন্ধগোকুল ধরেছিলাম। বেচারা জানোয়ারটা খোঁচা খেতে খেতে শেষ অব্দি মরে গেল। - বাট উই সী। ঝুমরি তার বাবার দিকে কোনদিন ফিরে তাকায়নি। সে শুধু নিজেকে নিয়েই থেকেছে। শুধু চেহারা আর পোষাক, পোষাক আর চেহারা। আই হেট ইট। হিউম্যানিটির প্রশ্ন এটা। আমার মনে হলো, আমি এদ্দিন একটা চেহারাকে

ভালোবেসেছিলাম। মানুষ শুধু একটা জিনিসকে চাইতে পারে না মানুষের কাছে।'[৫৭] ফিলিপের প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর, সে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষিত ফিলিপ রাজনীতির সৈনিক হয়ে উঠে। একদিকে প্রেম আর অন্যদিকে রাজনীতি। ১৯৭৬ সালের ইলেকশন হওয়ার পরে ঝুমরির উপরে বিপিন বেসরার দলবল অত্যাচার শুরু করে। পিতাহীন ঝুমরি বড় অসহায়, তার পাশে কেউ নেই। ঝুমরি তখন বাস্তবের মুখোমুখি, সে ফিলিপের গুরুত্ব বুঝতে পারে। তার বেঁচে থাকার একমাত্র সঙ্গী ফিলিপ। পাগলের মতো সে ফিলিপের গোপন আস্তানা খুঁজে বেড়ায়। ছুটে চলে নদীর পশ্চিম প্রান্তে যেখানে মানিকের মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেই ফিলিপের সংগ্রাম চলে, ফিলিপ মারা যায়। ঝুমরি নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের প্রেমিকের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। সে তার ভালোবাসার মানুষকে পায়নি। অসহায় ঝুমরির জীবন এক অন্ধকারে বিলীন হয়।

তৃণভূমির সুধন্য, গঙ্গু, ঝুমরি, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, মানিক, মানকু হাড়াম, ফিলিপ প্রভৃতি মানুষের সুখদুঃখের কথা উপলব্ধি করে নিশানাথ। নিশানাথকে নিয়ে বিধবা চন্দনাও সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল। এমনকি সীতাও নিশানাথকে পছন্দ করত। কিন্তু নিশানাথ অরুন্ধতীকে ভালোবেসেছে, অরুন্ধতীর জন্য বাকী সব প্রেম প্রত্যাখান করে। অরুন্ধতীর মৃত্যুতেই নিশানাথের প্রেম পর্ব শেষ হয়ে যায়। মানিক, গঙ্গু, ফিলিপ, অরুন্ধতীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে নিশানাথ শুভেন্দুকে হত্যা করে। নিশানাথের ব্যক্তিসংকটের পালাবদল চিহ্নিত হয়েছে। জমিদার প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে নিশানাথ আদিম অরণ্যের স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করে। সে গ্রামকেন্দ্রিক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মাটির মানুষ হয়ে ওঠে। সে বনে জঙ্গলে বসবাস করতে করতে মানুষের ভয়ংকর পশুসুলভ আচরণ লক্ষ করে। বহু দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা ও ব্যর্থতার সাক্ষী তৃণভূমি। ঝুমরি, ফিলিপ, চন্দনা, অরুন্ধতী এবং সর্বোপরি নিশানাথের প্রেম সার্থক হয়নি, রাজনৈতিক লড়াইয়ে ব্যক্তি প্রেম শেষ হয়ে যায়, যার সাক্ষী শুধু তৃণভূমি।

সত্তর-আশির দশকে সাঁওতাল সমাজে বিরাট পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ভাবে। এই সময় পর্বে সাঁওতালদের জীবনে নকশাল ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছিল। এই ধরনের বিষয় নিয়ে আব্দুল জব্বার 'মাতালের হাট'(১৯৭২) রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চরিত্র রবি হাঁসদা, রাঁচি কলেজ থেকে বি.এ পাশ বেকার যুবক। অর্থের অভাবে তার এম.এ পড়াশোনা হয়নি। তার বাবা মংলা হাঁসদা রাণীগঞ্জ কয়লাখনির শ্রমিক। ঘরের জমি জায়গা বিক্রি করে ছেলে রবিকে শহর থেকে শিক্ষিত করে তুলেছে। কিন্তু চাকরির অভাবে শিক্ষিত ছেলে গ্রামের বাড়িতেই থাকে। রবির সংসারে থাকে ঠাকুরদা, ঠাকুমা, অসুস্থ বাবা, দাদা ও দুই বোন। অসুস্থ বাবার জন্যে ওষুধ কেনার টাকা নেই, হাত-মুখ পরিষ্কার করার মতো সাবান কিংবা সোডাও তাদের বাড়িতে নেই। অর্থের অভাবে মশারি না থাকায় সারারাত মশার কামড় সহ্য করতে হয়। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। জঙ্গলে সাঁওতাল ছেলে ও মেয়েরা খুঁজে বেড়ায় খাদ্য। জোড়মাই জঙ্গলে মেয়েরা কেঁদুপাতা, শালপাতা সংগ্রহ করে। আর ছেলেরা ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, সাপখোপ, খরগোশ শিকার করে। এভাবেই তারা দিনযাপন করে।

টাকার অভাবে রবি শহরে যেতে পারে না, কিন্তু পিয়ালীর দেওয়া দশ টাকা দিয়ে সে রাঁচি শহরের মেস বাড়ি যায়। মেস মালিক ঠাকুর পরমানন্দ পানিগ্রাহী রবির সমস্ত বইপত্র আটকে রাখে। রবি তাকে বাকি টাকা না দিলে বই ফেরত দেয় না। রবির টিউশনির কিছু টাকা বাকি ছিল। সেই টাকা উদ্ধার করতে রবি প্রথমে যায় নির্মল রায়ের মেয়ে সুপত্রাদের বাড়ি। সেখান থেকে টাকা পেয়ে রবি চলে যায় মিসেস সরকারের বাড়িতে। মিসেস সরকার টাকা দিতে না চাইলে, রবি পোস্টার লিখে আন্দোলন করে। মিসেস সরকার টাকা দিতে বাধ্য হয়। রবি সেই টাকায় মেস মালিকের দেনা শোধ করে শহর থেকে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি এসে বাবার মৃত্যুর খবর শোনে। পরের দিনেই বাড়ির সবাই মিলে জমি-জায়গা নিয়ে আলোচনা

করে। মুদিওলা হরি টুডু, সুদখোর বসন্ত হাঁসদা এবং অনন্ত ডাক্তার পাওনাদার হিসেবে রবিদের বাড়িতে হাজির হয়। হরি টুডুর একশো পঁচিশ টাকা পনেরো আনা, বসন্তর দুশো টাকা বাকি আছে- এভাবেই বাড়ির মধ্যে উত্তেজনা ও ঝামেলা হয়। উত্তেজনার মুহূর্তে লংকা মুর্মু হাজির হয়। প্রতিবাদ করে উঠে সব পাওনাদারের বিরুদ্ধে। সে সবাইকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে দেয়। লংকা মুর্মু কমিউনিস্ট পার্টির লিডার হিসাবে প্রতিবাদ করে। সে গরিব বঞ্চিত মানুষদের সেবক। তার কাছে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, বিহারি, বাঙালি, উড়িয়া কেউ আলাদা নয়। লংকা মুর্মুর ভয়ে একে একে সব পাওনাদার পালিয়ে যায়।

এই উপন্যাসে দেখা যায় টাটানগর, রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সাঁওতাল জীবিকার তাগিদে শহরে, নগরে, পথে, ক্ষেত-খামারে ও খনিতে কাজ করতে যায়। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আদিবাসীরা স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়। আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রভাব পড়ে রবি হাঁসদার চিন্তায়। রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদ করে- 'এই অভাব, এই দারিদ্র্য তারা কতদিন, কত কাল আর সহ্য করবে?। ... রাস্তাঘাট, টিউবল, পোল- সব হবে। সময় লাগবে। ইলেকট্রিক আসবে। নতুন ভারত গড়ে উঠবে- গান্ধীজী নেহেরুজীর ধ্যানের ভারত।'[৬০] বিরোধী আন্দোলনের চালিকাশক্তি রবির সুপ্ত মনে ছিল এবং শান্তিময় ভারত কামনা করে।

রবি হাঁসদা মনে করে স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের কোনো মূল্য নেই। তাদের বাসস্থান বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা তিন রাজ্যের মিলন স্থলে। তিন রাজ্যের ভোটার তারা। তাদের তিনজন এম.এল.এ, বিষ্ণু শর্মা থাকে পাটনায়, চরণ বেসরা কলকাতায় আর অনন্ত মিশ্র থাকে ভুবনেশ্বরে। কেউ তাদের জনকল্যাণকর কাজ করে না। শিক্ষার, শ্রমের, আহার্যের, গৃহের, জমির- এই রকম বহু সমস্যা আদিবাসীদের আছে। ফলে রবি বুঝতে পারে না কোন পার্টির লোক ভালো, তার মনে হয় কংগ্রেসেই ঠিক, আবার কখনো কখনো মনে হয় কমিউনিস্টরাই

ঠিক কিংবা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনই ঠিক। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনই তাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে। রবির বোধবুদ্ধি ও মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মকভাবে। বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে জড়িয়ে দিলে প্রায় কোটি কোটি আদিবাসীদের বিশ্ববিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক নেই। বাঙালিদের যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বনফুল, শরৎচন্দ্র- অনেক সাহিত্যিক আছে। অথচ আদিবাসীদের কিছু নেই, তাদের পাঠক্রমও নেই। বাঙালিরা আদিবাসীদের থেকে প্রায় দেড়শো বছর এগিয়ে রয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র- কত বীর পুরুষ দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে। তাই রবি হাঁসদাও সাঁওতাল জনজাতির পাঠক্রম শুরু করতে চায়। তার মতে 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র ইতিহাস সবাই পড়ুক। 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র ইতিহাস প্রথাগত ইতিহাসের পাতাতেই নেই। আদিবাসীরা কেন উপেক্ষিত হবে? তারাও নতুন জীবন চায়। তাদের জন্য স্কুল, হাই-স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠুক। কলকাতাতে যেরকম হাসপাতাল আছে, তেমনি আদিবাসী অঞ্চলেও হাসপাতাল গড়ে উঠুক। আদিবাসীরা বস্ত্রহীন, গৃহহীন, অশিক্ষিত, নির্বোধ পশুর মতো অন্ধকারে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। গৃহ-ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট মেরামত, পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রামে গঞ্জে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ স্থাপনের মাধ্যমেই আদিবাসী জীবন সুখ-সমৃদ্ধি হবে।

চরণ বেসরা এই উপন্যাসের খলনায়ক। রাজনৈতিক পটভূমিকায় ও বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে চরণ বেসরার সত্তা নির্মিত হয়েছে। অল্প বয়সী নারীর প্রতি চরণের লোভ লালসার প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র পিয়ালী, তার শরীরের প্রতি চরণের খুব লোভ। সে পিয়ালীকে নানা লোভ দেখায়। শহর কলকাতার গাড়ি-ঘোড়া, হাওড়ার পোল, সিনেমা দেখা, ভাল শাড়ি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে টাকার বাজি প্রভৃতি ঘটনা থেকে চরণ বেসরার মতলব বোঝা যায়। সাঁওতাল মেয়ে পিয়ালী দেখতে সুন্দরী, তার প্রতি বাবুদের আকর্ষণ বেশি। চরণ বেসরার কুমানসিকতা বুঝতে অসুবিধা হয় না

পিয়ালীর। কিন্তু তার বাবা সরল সাঁওতাল মানুষ, চরণ বেসরার মত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। চরণ বেসরা লোকটা গুণ্ডা, তার পোষা গুণ্ডা লেঠেল পালোয়ান রতন মাণ্ডির সাহায্যে বহু মানুষকে খুন-জখম করিয়েছে। এলাকার মানুষ ভয়ের চোটে চরণ বেসরাকে ভোট দেয়। শহরের খারাপ ছেলেদের গ্রামে নিয়ে আসে, তারা সম্পত্তিওয়ালা ঘরের সন্তান, তাদের গাড়িবাড়ি সবই আছে। শিক্ষিত শহরের ছেলেরা গ্রামের কুমারী মেয়েদের যৌন জীবন উপভোগ করে। চরণ বেসরার শয়তানি বুদ্ধি ও কুমতলব শহরের মানুষ জানে না। শহরের মানুষের কাছে চরণ বেসরা ভালো মানুষ, সে সাঁওতালদের বীরত্বের-কাহিনি শোনায়। চরণ বেসরা শহরের দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গ্রামের গরিব মানুষদের বিতরণ করে। সেইসূত্রে তার সঙ্গে শহরের বাবুরা গ্রামে গিয়ে মহুয়া নেশা করে সাঁওতাল মেয়েদের যৌবন উপভোগ করে। চরণ বেসরার কুকর্ম রবি হাঁসদাও জেনে যায়। কলকাতার ইটভাটাতে রবি রূপার কাছ থেকে চরণ বেসরার কুকর্ম শোনে। চরণ রূপাকে ঝাড়গ্রামের বাসায় নিয়ে যায়। সেই রাতে চরণ রূপাকে ভয় দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করে। ভয়ের কারণে রূপা কাউকেও জানাতে পারেনি। তাঁতের ভালো ডুরে শাড়ি পরিয়ে রূপাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। সেখানে রূপাকে তার বউ হিসাবে পরিচয় দেয়। এভাবেই ছ'মাস হওয়ার পর রূপা সন্তান সম্ভাবনা হয়ে উঠে। তখন রূপার পেটে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল চরণ। সেই সময় অনন্ত ডাক্তার রূপাকে ডেকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। ডাক্তার রূপাকে অজ্ঞান করে বাচ্চাকে নষ্ট করে দেয়। কিছুদিন পর ডাক্তার রূপাকে কামনা করতে শুরু করে, ফলে রূপা তার প্রতিশোধ নিয়ে পালিয়ে যায় ইটভাটাতে। তারপর রূপার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে অসহতায়।

ঔপন্যাসিক অনন্ত ডাক্তারের মধ্যে হিংস্র প্রবৃত্তি দেখিয়েছেন। অর্থবান মানুষের কাছে সাধারণ সাঁওতাল নারীর অসহায় চিত্র ফুটে উঠেছে। পিয়ালীর রূপের পিছনে অনন্ত ডাক্তারের জ্বলন্ত লালসা ধরা পড়ে জঙ্গলে। ডাক্তার তাকে নানা ভাবে লোভ দেখায় কিন্তু পিয়ালী চালাক

মেয়ে, লোভে পা দেয় না। ডাক্তারের মনে আদিম কামনা জেগে উঠে। হিংস্র পশুর মতো তার কাম জেগে উঠে। একটা ঝোপের মধ্যে পিয়ালীকে একা দেখতে পেয়ে অনন্ত ডাক্তার ঝাঁপিয়ে পড়ে পিয়ালীর উপরে। পিয়ালী রবিকে তার কুমারীত্ব দেয়নি, আর এই ডাক্তার কীভাবে তা অর্জন করবে। জোর করে ধর্ষণ করার পরিণতি খুব ভয়ংকর। পিয়ালী হেঁসো ধরে অনন্ত ডাক্তারকে হত্যা করে। পরের দিন পুলিশ এসে হাজির হয়। গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। খুনি কে? পুলিশ কিছুই বুঝতে পারে না। সমস্ত পুরুষ গ্রাম ছাড়া হয়। তবুও কিছু পুরুষকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সন্দেহ হয় লংকা মুর্মুর ওপর। আর মাঝখানে পিয়ালী বেঁচে যায়।

রবি হাঁসদা চাকরির সন্ধানে কলকাতায় যায়। সেখানে গিয়ে বন্ধু পুরন্দরকে খুঁজে পায়। পুরন্দর রবিকে চাকরি আর ডিগ্রির ব্যাপারে জানায় বি-এ পাশ ডিগ্রী কলকাতায় বিশেষ মূল্য নেই। গ্রামের ছেলে কলকাতাতে চাকরি করা সহজ ব্যাপার নয়। রবি তবুও থেমে থাকে না, কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাজের খোঁজ করে কিন্তু কোথাও কাজ পায় না। হতাশ হয়ে সে নিজেকে খুব ছোট ভাবতে শুরু করে। পড়াশোনা যদি না শিখত, তাহলে কত দিন আগে থেকে কাজ করত। রবি চলে যায় হুগলী নদীর ধারে একটা ইটভাটাতে, সেখানে তার মাসতুতো বোন রূপা থাকে। রূপার সাহায্যে মালিক পুণ্য প্রামাণিক রবিকে ম্যানাজার পদে কাজ দেয়। রবি লক্ষ্য করেছে ইটভাটাতে আদিবাসী মেয়েদের নিয়ে বাবুরা খেলা করে। কানাই সিংহ মেয়েদের সঙ্গে খারাপ কাজ করে, সে পংখীকে জোর করে ধরে রাখে। এই সমস্ত ঘটনা রবি স্বচক্ষে দেখে। পরের দিন সে সমস্ত সাঁওতাল জড়ো করে। সবার সামনে পংখীকে শাস্তি হিসাবে একটা গরম লোহা দিয়ে ভয় দেখায়, সমস্ত সাঁওতাল চুপচাপ হয়ে যায়।

ইটভাটাতে মাইনে বাড়ানোর জন্যে মালিক পুণ্য প্রামাণিকের সঙ্গে রবির ঝামেলা বাঁধে। রবি যুক্তি দেখায় সাঁওতাল কুলীরা ফেন-ভাত খেয়ে কোনো রকম বেঁচে আছে। তাদের খাদ্য

তালিকায় চিনি নেই, দুধ নেই। তারা একটু টক তরকারীতে আঙুল ডুবিয়ে দিন পার করে। মাছ-মাংস কেনার সাধ্য নেই। পুণ্য প্রামাণিকের কাছে আন্দোলন করতেই পাঁচ টাকা বোনাস বাড়িয়ে দেয়। সাঁওতালদের জীবন নিয়ে রবি হাঁসদা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাতে 'আদিবাসী জীবনের আদিকথা' লেখা বার করে, তা দেখে পুণ্য প্রামাণিকের আরও ভয় হয়। যদি ইটভাটার কুকীর্তির কথা রবি লিখে ফেলে। সেই কারণেই সে রবিকে পাঁচশো টাকা দিতে চায়। কিন্তু টাকা নিতে অস্বীকার করে রবি, কারণ সে একার জন্যে লড়াই করে না। সমস্ত কুলি-কামিনদের জন্য রবি মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রবির আন্দোলন।

পুজোর ছুটি নিয়ে রবি গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। দুর্গা পুজোর সময় পিয়ালীদের বাড়িতেও পুজো হয়। চরণ বেসরা পিয়ালীর বাবা মহাদেব মুর্মুকে বশ করে রাখে। চরণ বেসরা স্বেচ্ছাসেবক নাম করে শহরের ছেলে মিলে ফূর্তি করে। চারিদিকে জমাট অন্ধকারে মাতালের হাট বসেছে। সেই সুযোগে চরণ বেসরার দল পিয়ালীর হাত ও মুখ বেঁধে দেয়। কাঞ্চি ও রূপাও বাদ যায়নি। এই সমস্ত ঘটনা রবি নিজের চোখে দেখে, সে তখন পিয়ালীর বাবা মহাদেব মুর্মুকে সমস্ত ঘটনা জানায়। তখন সবাই মিলে চরণ বেসরার দলকে তাড়া করে। জঙ্গলের মধ্যে রবির দল চরণ বেসরার দলকে আটকে দেয়। তখন তাদের মধ্যে লড়াই হয়। রবির দল চরণ বেসরাসহ মোট ছ'জনকে হত্যা করে। গাড়িতে আগুন লাগিয়ে ছ'জনকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন পুলিশের ভয়ে রবি ভোর বেলা ঝাড়গ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরে কলকাতার ইটভাটাতে যায়। সেখানে একটা খবরের কাগজে দেখতে পায়- 'ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এল-এল-এ চরণ বেসরাসহ আরও পাঁচজন সহকর্মী নিহত'। পুলিশ অনেকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ রবিকেও সন্দেহ করে এবং তল্লাশি চালায়। রবি নিজের নাম খবরের কাগজে দেখে হতচকিত হয়। তাড়াতাড়ি করে কলকাতা থেকে রবি খড়গপুরে ফিরে আসে, সেখানে তিতু ফকিরের সঙ্গে দেখা হয়। তিতু ফকিরকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। রবি তখন বলে-

> আমি এখন ঝোলা কাঁধে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে অরণ্যপথে আত্মগোপন করে শহরে নগরে গ্রামে পল্লীতে জনপদে মানুষের কাছে যাব- মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার হব। সারা আদিবাসীদের- অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখব। গরু-ভেড়ার মতন আমাদের জীবন কাটছে। গায়ে বস্ত্র নেই, অনাহারে দুর্দশায় গৃহহীন অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। রাজধানী কলকাতা দিল্লী বোম্বাইয়ের যখন আধুনিক সভ্যতার রঙমশাল জ্বলছে তখন এইসব আদিবাসী অঞ্চলের মানুষ প্রায় উলঙ্গ, অশিক্ষিত, নির্বোধ পশুর মতন অন্ধকারে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।[৬১]

আদিবাসীদের কথা মাথায় রেখে রবি খড়গপুর থেকে রাণীগঞ্জে যায়। সে কাকাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকে, রাণীগঞ্জ থেকে কোলিয়ারী, সেখানে আদিবাসীদের বাড়িতে থাকে। তারপর সে সোজা গ্রামের বাড়ি যায়। বাড়িতে গিয়ে দেখে যে তার পাশে গ্রামের সমস্ত মানুষ। কেননা, রবি খারাপ কাজ করেনি। বরং খারাপ মানুষের বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছে। রবি তখন জোতদারদের ভাগচাষের জমির ফলন দিতে রাজি নয়। তিনভাগের একভাগ মালিকদের আর বাকী সব চাষিদের। তিন বছরের বেশি চাষাবাদ করে থাকলে তা খাস-দখল হয়ে যায়। সরকার আগামী দিনে চাষাবাদের সময় ভাগচাষিকে নতুন করে জমি দেবার মতলব করেছে। তখন আদিবাসী বা গরিব বাঙালি, বিহারি, উড়িয়া- পুরানো ভাগচাষির জমিতে নতুন করে চাষ করার নিষেধ জারি হতে পারে। রবি হাঁসদা ঘনশ্যামের বাড়িতে যায়, সেখানে ঘন্যশ্যামের সঙ্গে তর্ক করে। তর্ক করার সময় রঙ্গলাল নামে একজন শহরের ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রঙ্গলাল এম-এ পাশ এবং তার বন্ধু পোদ্দার বি-এ পাশ। তারা নকশাল গোষ্ঠীর দল। সেই দলের সঙ্গে রবি যুক্ত হয়। সবাই মিলে গ্রামে গ্রামে জমিদারের বাড়িতে লুটপাঠ করে। তারা আশীষ মজুমদারের বাড়িতে ধান-চাল, টাকা পয়সা ও গয়না লুঠপাঠ করে। সেই সঙ্গে রঙ্গলাল আশীষ মজুমদারকে বন্দুকের গুলি দিয়ে হত্যা করে। পুলিশ রবিকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু তাকে না পেয়ে তার বোন রুইবারির ওপরে পুলিশ অত্যাচার করে। সেই সঙ্গে পুলিশ রবির প্রেমিকা পিয়ালীকেও সন্দেহ করে। পুলিশ পিয়ালীর বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরেই রবি চলে আসে।

মহাদেবের বাড়ি থেকে রবি পিয়ালীকে পালিয়ে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে, সেই জঙ্গলের মধ্যে রবি পিয়ালীকে বিয়ে করে। এবং উভয়ে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হয়। জঙ্গল থেকে রবি পালিয়ে যায় টাটানগরে। সে টাটানগরের ইটভাটাতেও বেশিদিন রইল না। সেখান থেকে রাঁচি যায়, রাঁচি থেকে বাঁকুড়া, বাঁকুড়া থেকে সে বাড়ি ফিরে আসে। রবি গ্রামের পরিস্থিতি দেখে আগের মতো নেই, এখন অনেক বেশি শান্ত। গ্রামের লোক রবিকে ছোট বীরসা বলে সম্বোধন করে। পিয়ালী পাঁচ মাসের পোয়াতি, তাই রবি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, সেই জন্যে পিয়ালীকে সঙ্গে নিয়ে মাতালের হাটে যায়। মাতালের হাটে রবিকে সবাই নেতা ভাবে। সমস্ত সাঁওতালরা রবিকে প্রণাম করে। রবি পিয়ালীকে লাল পাড় সাদা শাড়ি কিনে দেয়। শাড়ি কিনে রবি ফিরে যেতে চাইল, তখন পুলিশের ভ্যান হাজির হয়। আশীষ মজুমদারের ছেলে নিশিকান্ত পুলিশ নিয়ে হাজির হয়। রবি যখন পালাতে চায় তখনই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

'মাতালের হাট' উপন্যাসে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনা নেই, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রেমের আখ্যান অসাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনিতে রবি ও পিয়ালীর প্রেম বর্ণনা পাওয়া যায়। রবির প্রেমিকা পিয়ালী মুর্মু, চাষি মহাদেবের মেয়ে। তাদের বাড়িতে ধানের গোলা ও দশ-বারোটা গরু-মোষ রয়েছে। গ্রামের পটভূমিকায় বলা যায় তাদের পরিবার অবস্থাপন্ন। অল্প দামের শাড়ি পিয়ালীর পরনে, খোঁপায় পাখির পালক, গলায় লাল কাঠির মালা, হাতে সবুজ রঙের বালা ও সরু রূপোর দুল কানে। পিয়ালীর ছ'লম্বা রোগাটে গড়ন, লম্বা গলা, খাড়া নাক ও মায়াময় হরিণের চোখ। পিয়ালী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নয়, তবুও সে সুন্দরী দেখতে। পিয়ালীর রূপে গুণে মুগ্ধ বহু সাঁওতাল যুবক এবং দিকু বাবু। কিন্তু পিয়ালী মনে প্রাণে রবি হাঁসদাকে ভালোবাসে। বাড়ির লোকসহ গ্রামের মানুষ জানে তাদের প্রেম সম্পর্কের কথা। শালগাছের তলায় তারা দিনে-দুপুর রোদে মাটিতে বসে প্রেমের কথা আলোচনা করে। পিয়ালীর কথাতে ভয়ের বার্তা পাওয়া যায়, শিক্ষিত ছেলে রবি। শহরের কোনো ভদ্র ঘরের মেয়েকে রবি বিয়ে

করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে পিয়ালী। ঠাকুরথানে বসে মহীরুহকে সাক্ষী রেখে তারা প্রেমের প্রতিজ্ঞা করে। পিয়ালী রবিকে বলে–

> আমার এই ধড়ে 'জান' থাকতে তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ দখল করতে পারবে না- এই ঠাকুরের থানে বসে বলচি। তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি। তুমি একটা চাকরি দ্যাখো, আর তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়া করো। আমি আর থাকতে পারি না গো- খালি তোমার কথা মনে পড়ে।[৬২]

অভিমানী পিয়ালী রবিকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মতো রবি ও পিয়ালীর প্রেমকে ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য সাঁওতাল সমাজে বাঁশি বাজানো প্রাচীন প্রথা। নায়ক-নায়িকার বিচরণ আর প্রেমের মর্মবাণী ধ্বনিত হয় ঘন জঙ্গলের মুক্ত আকাশে। রবি জঙ্গলের মধ্যে একটা শালগাছের নিচে বাঁশি বাজায় পিয়ালীর জন্য। রবি অনেকক্ষণ বাঁশি বাজানোর পর পিয়ালী আসে। তারা তখন সুখ-দুঃখের কথা ভুলে যায়। তারা জঙ্গলের মধ্যে হাসি খুশিতে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি করে, লুকোচুরি খেলে। পিয়ালী লাল রক্তটুকু নিয়ে রবির আঙুলে লাগিয়ে দিয়ে বলে- 'আমার এই সিঁথিতে লাগিয়ে দাও এটা।' ছেলেমানুষী রবি পিয়ালীর সিঁথিতে লাগিয়ে দেয়। সাঁওতাল রীতি অনুসারে পিয়ালী তার বরের পায়ে গড় করে। রবি তার প্রেমিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে চুম্বন করে। সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে দৈহিক মিলনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু পিয়ালী রাজি হয় না। পিয়ালী সারা জীবন অপেক্ষা করতে রাজী আছে কিন্তু এই পাপ কাজ করতে রাজী নয়। অন্ত্যত বিয়ের আগে সে নিজের ইজ্জত দান করতে চায় না। তবুও রবি তাকে জোর করলে, পিয়ালী বলে-

> মেয়ে হলে বুঝতে পারতে ভীষণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কত সামলাতে হয়- এটা যে ভাগ্যের খেলা। যদি কিছু হয়ে যায়- যদি বিয়ে না হয়। আমার ইজ্জৎ খাবে আর আমাকে বিয়ে করবে না, এ কখনো হয় না। আর দুনিয়ার সৎলোক সব্বাই

বিশ্বাস করে, এটা পাপ। অন্তত মেয়েদের জন্যে। আমাদের যে ভয় করে...চষা ক্ষেতে বীজ পড়লেই যে চারা গজাবার ভয়।[৬৩]

আসলে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, যৌনতার ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। রবির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। সাঁওতাল মেয়েরা গরিব হতে পারে কিন্তু তারা যৌনতা নিয়ে খুব সচেতন। তারা সহজেই নিজেদের কুমারীত্ব দান করে না। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বার বার পিয়ালী ও রবির দৈহিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। যখন রবি পিয়ালীদের বাড়িতে যায়, সেখানেও যৌনতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পিয়ালীর রূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যৌনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঝড়ের রাতে দু'জনের হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার নেমে আসে- 'পিয়ালীর কী নরম দেহ আর যৌবনদৃঢ় দেহ! এই তো তার পিয়ালী। সাঁওতালীদের মধ্যে যাকে সব চাইতে দেখতে সুন্দরী। যার দেহের প্রতিটি খাঁজ পাথর কুঁদে কুঁদে যেন কোনো পাকা রসিক শিল্পীর হাতে তৈরী। এখন সেই মেয়ে রবি হাঁসদার সম্পূর্ণে আয়ত্তে রয়েছে।'[৬৪] সে ইচ্ছা করলেই প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারত কিন্তু রবি সেই সব কিছুই করে না। রবি এক বেকার ছেলে, তার রোজগার নেই আর চাকরিও পায় না। অর্থনৈতিক চিন্তার কারণে সে দৈহিক সম্পর্ক করেনি।

রবি পিয়ালীকে বিয়ে করতে চায়, সুখে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু মাতালের হাটে পুলিশের গুলিতে রবি আহত হয়। পোয়াতি পিয়ালী মর্মান্তিকভাবে পড়ে থাকে মাতালের হাটে। কিছুদিন পর পিয়ালীর সন্তান জন্ম নেয়। পিয়ালীর একমাত্র সম্বল এই নবজাতক সন্তান, রবির একমাত্র অস্তিত্ব। ঔপন্যাসিক রবি ও পিয়ালীর প্রেমের ট্র্যাজিক রূপ দেখিয়েছেন। যা এই উপন্যাসকে সার্থক করে তুলেছে। কেননা রবির রাজনীতি আন্দোলনের মধ্যে সততার অভাব ছিল। কিন্তু রবির প্রেমের মধ্যে গভীর সত্য লুকিয়ে রয়েছে। সে পিয়ালীর সঙ্গে সারাজীবন থাকতে চেয়েছিল। সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে পিয়ালী রাজনীতি বোঝে না। সে শুধু চেয়েছিল রবির সঙ্গে সংসার করতে।

প্রেমে কোনো রাজনীতি নেই, বরং বলা যায় সাঁওতাল সমাজের নানা নিয়ম কানুন আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজের একটা ভূমিকা থাকে- তা এই উপন্যাসেও প্রমাণিত। শুক সরেনের সঙ্গে পিয়ালীর বিয়ে ঠিক হয়, তবে শুকের মন অন্য নারীর প্রতি। সে গুরুবারির সঙ্গে ভুট্টা ক্ষেতে যায়। ভুট্টা ক্ষেতে একটা বিষাক্ত সাপের ভয়ে গুরুবারি চিৎকার করে, সেই সুযোগে শুক গুরুবারিকে জড়িয়ে ধরে। গুরুবারিও বাঁধা দেয় না, কেমন যেন তার লজ্জা লাগে। সে লজ্জায় শরীরের শক্তি হারিয়ে ফেলে, শুক তাকে জড়িয়ে ধরে, কাছে টেনে নেয়। শুক তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। শুক গুরুবারিকে পরের দিন বিয়ে করার কথা দেয়। ভুট্টা ক্ষেতে বিধু হাঁসদাকে সাক্ষী রেখে গুরুবারির সিঁথিতে শুক সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সাঁওতাল সমাজে এই রকম বিয়ের প্রথা চালু আছে। বিয়ের পর বিধু হাঁসদা শুকের বাবা আজর সরেনকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু আজর সরেন কিছুতেই এই বিয়ে মানতে চায় না। আজর সরেন গ্রামের লোক নিয়ে বংশীঢল গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বংশীঢল গ্রামেও ধামসা মাদল বাজিয়ে লোকজন জড়ো হয়। দুই গ্রামের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে। দুই গ্রামের বাজনা ও লাঠির যুদ্ধে বংশীঢল গ্রামের লোক পরাজিত হয়। কিন্তু বিধু হাঁসদার সাক্ষীতে দুই গ্রামের লোক শুককে জিজ্ঞেস করলে, তাতে প্রমাণিত হয় শুক গুরুবারিকে ধর্মসাক্ষী রেখে বিয়ে করেছে। এবং শুক নিজের অপরাধ স্বীকার করে। গ্রামের লোক শুক ও গুরুবারিকে ক্ষমা করে দুই গ্রামের লোক শান্ত হয়। সকলেই তাদের বিয়ে মেনে নেয়। কিন্তু আজর সরেন রাজি হয়নি। রাজি না হবার কারণে পণ প্রসঙ্গ এসেছে। সাঁওতাল সমাজে পণ প্রথা নেই। সাঁওতাল রীতি অনুসারে ছেলে পক্ষকেই পণ দিতে হয়। আজর সরেনকে পণ দিতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত আজর সরেনও মেনে নেয়।

এই উপন্যাসের মধ্যে পিয়ালী ও রবির প্রেম যেমন আছে তেমনি শুক ও রুইবারির সম্পর্কও রয়েছে। একদিকে প্রেমের বিচ্ছেদ হয়েছে রাজনীতির কারণে অন্যদিকে প্রেমের মিলন ঘটেছে সমাজের সহযোগিতায়। উভয় প্রেমের মধ্যে একটা মিল লক্ষ করা যায়- তা হলো

সিঁদুর বিয়ে। একটা বিয়ে হয়েছে জঙ্গলে আর অন্যটা ভুট্টাক্ষেতে। জঙ্গলে বিয়ে হওয়ার পর দৈহিক মিলন ঘটেছে আর ভুট্টাক্ষেতে দৈহিক মিলন হওয়ার পর বিয়ে হয়েছে। এখানে সাঁওতালদের বিবাহ রীতিনীতি সঠিক ভাবেই অনুসন্ধান করেছেন ঔপন্যাসিক, তবে সাঁওতালদের ধর্ম নিয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। সাঁওতালরা হিন্দু নয়, সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম পরিচয় আছে। হিন্দু সমাজ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলীর লোক সাঁওতালদের নিয়ে টানাটানি করে। বেশিরভাগ সাঁওতালরা নিজেদের জাতি পরিচয় ও ধর্ম পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে। যারা খ্রিস্টান বা হিন্দু হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রকৃত সাঁওতালদের ধর্মনীতি ও রাজনীতি চলতে থাকে। এই রকম রাজনীতির পাণ্ডা চরণ বেসরা, তার অত্যাচারে সাধারণ মানুষের বাঁচার স্বপ্নটাও থাকে না। রাজনীতির ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে চরণ সাধারণ মানুষের জীবন সম্পত্তি লুট করে। অন্যের জীবনের ভিতরে শিকড় চারিয়ে দিয়ে রস শুষে নেয় চরণ।

বি.এ পাশ আদিবাসী মানে শিক্ষিত যুবক, ১৯৭২ সালে সাঁওতালরা খুব বেশি শিক্ষিত ছিল না। রবি হাঁসদার চাকরি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পায়নি। লেখক বেকারত্বের সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বেকারত্বের জ্বালায় রবি হুগলীর ইটভাটাতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের আদব-কায়দায় আদিবাসী গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিল। ইটভাটাতে মাইনে বাড়ানোর জন্যে মালিক পুণ্য প্রামাণিকের সঙ্গে রবির ঝামেলা বাঁধে। গ্রামে এসেই রবি তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। রবি যেখানে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন করছিল, সেখানে হঠাৎ তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। তেভাগা আন্দোলন শেষ না হতেই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে জোতদার-জমিদারদের সম্পত্তি লুটপাট করে এবং মানুষকে হত্যা করতে থাকে। মাতালের হাটে সমস্ত সাঁওতাল রবিকে ছোটো বীরসা বলে ডাকে, সাঁওতালদের বিদ্রোহের নায়ক সিধু-কানু, তাহলে রবিকে বারবার বীরসার সঙ্গে তুলনা করা হলো কেন? সাঁওতাল ও মুণ্ডার মধ্যে লেখক পার্থক্য দেখাতে চাইলেন না, আদিবাসী যোদ্ধা হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। তবুও রবি চরিত্রের মধ্যে

বীরসা চরিত্রের কোন মিল পাওয়া যায় না। মোটের উপর রবি চরিত্রে লেখক যে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা আসলে ছন্নছাড়া রাজনীতির রঙ। রাজনীতির কোনো সামঞ্জস্য নেই। তবুও রবি চরিত্রের মধ্যে শিবু সরেনের অনুসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। শিবু সরেন যেমন করে দিকুদের সঙ্গে মিশেছিলেন, তেমন করেই রবিও দিকুদের সঙ্গে মিশেছে। ফলত আদিবাসীদের জোট নষ্ট হয়। রবি চরিত্র একা হয়ে যায়। এই উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ নেই, আছে শুধু কিছু রাজনৈতিক ঘটনা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী চর্চিত বিষয়ে সব থেকে বেশি আলোচিত সাহিত্যিক হলেন মহাশ্বেতা দেবী। সমাজ সচেতন লেখিকা বলেছেন- 'শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ তাঁদের প্রতি সংবেদি মানুষই আমার লেখার প্রধান ভূমিকা। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে অন্ন, জল, জমি, ঋণ কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে অবস্থায় এই মুক্তি ছিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।'[৬৫] অবজেকটিভ্লি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, তাঁর অনেক লেখাতেই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের কথা আছে। তাঁর প্রস্তুতি পর্বের 'ঝাঁসীর রাণী' রচনাতেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলা আছে। সত্তর দশকে কলকাতার রাস্তার ধারে বহু লোক মরে যায়, তখন তিনি তাদের কথা লিখেছেন 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে। মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন নিয়ে বিশেষ লেখা লেখেননি কিন্তু নকশাল আন্দোলন নিয়ে তিনি বিখ্যাত বিখ্যাত গল্প-উপন্যাস রচনা করেন। কারণ, নকশাল আন্দোলন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। একজন মানুষ হিসাবে, একজন অরাজনৈতিক মা হিসাবে তরুণ যুবককে বুঝতে চেষ্টা করেছেন 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে দেখেছেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রামে গ্রামে নানা কারণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। **১৯৬৫** সাল নাগাদ

তিনি ম্যাকলাক্সিগঞ্জ, পালামৌ এক, দু-বার গিয়েছেন। তিনি রাঁচি অঞ্চলে মুণ্ডাদের দেখেছেন। মুণ্ডারা মহাশ্বেতা দেবীর কাছে আসে, 'মুণ্ডা' বলে তারা নিজেদের মধ্যে বিরাট গর্ব বোধ করত। তাঁর কাছে অনুরোধ আসে যে মুণ্ডাদের নিয়ে বিশেষ কিছু লেখালেখি নেই, তাদের ইতিহাস সম্পর্কে সেইরকম কিছুই লেখা হয়নি। ফলে মহাশ্বেতা দেবী তাদের জীবন ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন। তিনি মুণ্ডাদের অনুরোধে মুণ্ডা সমাজ, বীরসা মুণ্ডার জীবনী এবং আন্দোলন নিয়ে 'অরণ্যের অধিকার'(১৯৭৭) উপন্যাস রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে 'কোল বিদ্রোহ', 'খেড়োয়াল বিদ্রোহ', 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'- প্রভৃতি আদিবাসী বিদ্রোহ নিয়ে তিনি বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এবং সিধু-কানু ক্লাব, সিধু-কানু-বিরসা ক্লাবগুলির মাধ্যমে তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছেন। তিনি প্রথম দিকে সেই সমস্ত অঞ্চলে খুব যাতায়াত করতেন, পরের দ্দিকে আদিবাসীরাই কলকাতাতে লেখিকার কাছে আসতেন। লোধা ও খেড়িয়া জাতিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে লোধা আর খেড়িয়া জাতি জন্ম সূত্রে ক্রিমিনাল ট্রাইব। লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালদের খুব ভালো সম্পর্ক আছে। তাদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ নেই। শবরদের মধ্যে প্রয়োজন বোধটাই নেই। তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। বনে জঙ্গলে সাপ-ব্যাঙ যা পায়, তাই খেয়ে নেয়। আদিবাসী জীবনের মধ্যে লেখিকা নিজেকে উপলব্ধি করেছেন বলেই প্রথাগত ইতিহাস রচনা করেননি। অবহেলিত আদিবাসী সমাজকে জানার ইচ্ছে এবং গবেষণা করার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর চিরকালের। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস বেরনোর পরে তিনি বহু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের বহু চিঠিপত্র পেয়েছেন। আদিবাসীরা নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ সুবিধা পায় না, তারা বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি নব্য ভারতীয় ভাষায় লেখাপড়া করে। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং

বাচনভঙ্গিই আদিবাসী সমাজের সঙ্গে তাঁকে গভীরভাবে একাত্ম করে তুলেছে। তিনি বৃহত্তর আদিবাসী সমাজকে বুকের কাছে পেয়েছিলেন, যা লেখক জীবনের সব থেকে বড়ো পুরস্কার।

আদিবাসী উন্নয়ন সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী নানা মতামত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে উন্নয়নের নামে যা এসেছে তা আদিবাসী জীবনে অভিশাপই। কারণ সংরক্ষণের নামে অন্যজাতির মানুষরা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে। ফলে আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার পাওয়ার জন্যে অনেক সংগ্রাম করেছে বলেই তারা নিজেদের ক্ষমতা পেয়েছে। 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আদিবাসীরা নিজেদের ক্ষমতা অর্জন করেছে। যখন জঙ্গল কাটা হলো তখন আদিবাসীরা আন্দোলন করেছে। কনট্রাকটর কিংবা ইটভাটার শ্রমিক হিসাবে যে অত্যাচার আদিবাসীরা সহ্য করত, তার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা পেয়েছিল। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠল। আদিবাসীরা কিছুটা হলেও নিজেদের ক্ষমতা পেয়েছে বলে তাদের বিরাট কিছু উন্নতি হয়েছে, তা কিন্তু নয়। আদিবাসীদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, জমি নেই- তাদের কিছুই নেই। লেবার খাটা ছাড়া উপায় নেই। ঠিকাদাররা আদিবাসীদেরকে ট্রাকে বোঝায় করে লেবার খাটাতে নিয়ে যায়। এই সমস্ত ঘটনা উঠে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে। তিনি যখন প্রতিষ্ঠিত লেখক হলেন, তখন ওই সময়েই 'সাব অলটার্ন স্টাডিজ' চর্চা চলছে। অথচ মহাশ্বেতা দেবী 'সাব অলটার্ন স্টাডিজ' এর রাজনৈতিক তত্ত্ব কথা বিশেষ কিছু লেখেননি। বরং তাঁর সাহিত্যচর্চা থেকেই নানা রকম তত্ত্বকথা বিশ্লেষকরা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আসলে চলমান জীবনের বাস্তব রূপকার। তবে তিনি বাস্তবের সঙ্গে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে নতুনরূপে অন্বেষণ করেছেন। তাঁর কাছে ইতিহাস ও পুরাণ বেশ অন্যরকমের। তিনি লোকবৃত্তের ইতিহাস বলেছেন। পুরাণের কথা তিনি লোকের মুখে শুনে শুনে লিখেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে কোনো অনুপ্রেরণা নেই, তাই তিনি পরিশ্রম করেই নতুন আখ্যান রচনা করেন–

> আদিবাসীদের নিয়ে আমি অনেক লিখেছি। ওদের সুখ-দুঃখের কথা, বঞ্চনার কথা, বেদনার কথা, লড়াইয়ের কথা। ওদের সঙ্গে আমি ভীষণভাবে ঘনিষ্ঠ। আমার মনে হয়েছে ওদের নিয়ে লেখা উচিত। আমি লিখেছি।[৬৬]

মহাশ্বেতা দেবী কঠোর পরিশ্রম করে আদিবাসীদের লড়াই, বিদ্রোহ, সংগ্রামের ইতিহাস বারবার গবেষণা করেছেন। বাবা তিলকা মাঝির লড়াইকে কেন্দ্র করে তিনি 'শালগিরার ডাকে'(১৯৮২) উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে দেখা যায় সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের জীবিকা নির্ভর করে আছে ভাগলপুর অঞ্চলের পাহাড়-জঙ্গল এলাকার জমি-জায়গায়। সাঁওতালরা জঙ্গল কেটে 'জমি হাসিল' করে আর পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ করে। কিন্তু দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। আদিবাসীরা জমিতে চাষ করে কিন্তু জমির উপর যে আইন আছে, তা সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়ারা খোঁজ খবর রাখত না। আদিবাসীদের জঙ্গল আছে, আর সেই জঙ্গলে তারা শিকার করে। শিকার করার যাবতীয় সরঞ্জাম কামাররা প্রস্তুত করে। কামাররা তীরের ফলা, বর্শা, সড়কির ফলা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, দা, নিড়ানি- এমন দরকারের কাজ করে থাকে। তার বিনিময়ে সাওঁতালরা কামারদের দুধ, দই ও মাংস দিত। এছাড়াও সাঁওতালরা কামারদের লাউ, কুমড়ো, বেগুন, কচু, লঙ্কা কিংবা ছাগল, মুরগি, গরু দিত। এভাবেই সাঁওতালদের সঙ্গে কামারদের আত্মীয়তা বাড়তে থাকে। শুধু তীর-বল্লমের সম্পর্ক নয়, কামার বউ দিনমণির সঙ্গে সুন্দ্রা মুর্মুর বোঝাপড়া বেশ ভালো। দিনমণি নিজের মেয়ের জন্য বর খুঁজতে গিয়ে দুনিয়ার খবর পায়, রাজমহল পাহাড় ও বন দিয়ে সড়কের খোঁজ দিলে একশো এক সিক্কা টাকা কিংবা কড়কড়ে রূপোর টাকা দেওয়া হয়- ইত্যাদি। ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে এবং মেয়েদের ইজ্জতকে লোপাট করে বর্গিরা লুটপাট করে নিয়ে যায়। বর্গির ভয়ে মানুষ পালাতে থাকে, বরো, পদ্মা ও ভাগীরথী নদী পেরিয়ে মানুষজন জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতাল গ্রামে কামার-কুমোর-ছুতোর-তেলি জাতিরা আশ্রয় নিল। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণির দল সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে যায়। তিলকা মাঝির বাবা সুন্দ্রা মাঝি ছোট

থেকে বড়ো হয়েছে শুধু সাঁওতাল সমাজে। আর তিলকা বড়ো হয়েছে সাঁওতাল জাতির পাশাপাশি কামার-কুমোর-ডোম-তেলি ও ধানুক জাতির মাঝখানে। তিলকার যখন মাত্র সাত বছর বয়স, তখন ১৭৫৭ সাল। এই সময় ভাগীরথীর পলাশিতে বাংলার নবাব যুদ্ধে পরাজিত হয়। সাহেবদের দেওয়া তাজ মাথায় পরে নবাব হয়েছিলেন মীরজাফর। অথচ এই পাহাড়ের মানুষরা জানেই না দেশের কী অবস্থা চলছে–

> এই বিস্তীর্ন এলাকায় কেউ লোভের হাত বাড়ালে তোমরা তীরধনুক নিয়ে জান কবুল করে নেমে যাবে লড়তে। তোমরা জান তোমরা স্বাধীন। কোনো শাসকের অস্তিত্বে তোমরা জান না। মোগল আমলে, বাংলা সুবার আগের নবাবের আমলে তোমাদের কেউ খাজনা দিতে বলেনি। বরঞ্চ পরগণাদার, চাকলাদাররা তোমাদের সম্মান জানিয়েছে...।[৬৭]

১৭৪০-৫০ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রকে একশো টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকায় কবি ভারতচন্দ্র বিশাল বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আর ১৭৫৭ সালে মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে ক্লাইভ সাহেব পুরস্কার পেয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা। ১৭৬০ সালের নাগাদ কোম্পানি বুঝতে পারে যে, মীরজাফরকে রাখলে তাদের চলবে না। তাই তারা মীরজাফরের জামাই মীরকাশেমকে নবাব করে তোলে। এরপর ১৭৬৪ সালে মীরকাশেমের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ হয়, তাতে মীরকাসেম পরাজিত হয়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির হাতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা চলে যায়। তখন কোম্পানি প্রচুর পরিমাণে চড়া দামে ধান ক্রয় করে। গ্রামের সমস্ত লোক একটাকায় চার মণ, পাঁচ মণ ধান বিক্রি করতে থাকে। কোম্পানির এই রকম চক্রান্ত কিন্তু সাঁওতালরা বুঝতে পেরেছিল বলেই তিলকা মুর্মু কয়েকজন মাঝি ও পরগণায়েতের পরামর্শে গ্রামে গ্রামে 'গিরা' পাঠিয়েছিল। কোশানি নদীর ধারে জরুরি অবস্থায় সাঁওতালরা এক জোট হয়। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল দরকার ছাড়া চাল যাতে কেউ বিক্রি না করে। কোম্পানি সরকার ১৭৬৯ সালে গ্রাম-গঞ্জের সব চাল ধান কিনে নিয়ে কলকাতার গুদামে রেখে

দিত। সেই বছর, ১১৭৫ সনেই বাংলায় মন্বন্তর হয়। কলকাতার গুদামে রাখা ধান ১১৭৫ সনের দিকে টাকায় চার দরে বিক্রি হতে থাকে। ১১৭৬ সালের এপ্রিলে নতুন বাংলা বছর অনুসারে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামকরণ দেওয়া হয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' কোম্পানির চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি গর্জে উঠে- 'কে তোর কোম্পানি? আমরা কোম্পানি জানি না, কলকাতা, জানি না। সকল চাল কিনে নিছিস, যে বেচল সে খাবে কি ? সবার ঘরে ঘরে ঝমর ঝমর থলি বাঁধা আছে, নয়?।'[৬৮] সাঁওতালরা বনে-জঙ্গলে বসবাস করে বলে কোম্পানি তাদেরকে সহজেই শায়েস্তা করতে পারে না। সাঁওতালদের অসামান্য সমাজবন্ধন দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়িয়াদের মেলবন্ধন নেই, তারা সব ধান বিক্রি করে দেয়। পাহাড়িয়াদের চাল শূন্য ঘরে মন্বন্তর নেমে আসে, ফলত রাগে দুঃখে তারা পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে পাহাড়িয়াদের জব্দ করার লক্ষ্যে তিতাপানি নালার নিকটে ভাগলপুরের ক্যাপ্টেন ব্রুক ও সিপাহীর দল দশটি বন্দুক তারোয়াল নিয়ে লড়াই করে। বালি ও পাথরের জঙ্গলে পঞ্চাশটা নাগারার শব্দে পাহাড়িয়াদের তীর-ধনুকের কাছে ব্রুকের গুলি পরাজিত হয়। তারা যেন হারানো জঙ্গল নতুন করে ফিরে পায়। পাহাড়িয়ারা হারানো গর্ব ফিরে পায়, আনন্দ আর উৎসবে মেতে উঠে। তাদের উৎসবে সাঁওতালরা যোগদান করে। তারা মনে করে যে, দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ইংরেজরা ভুলে যায়নি, তারা আবার যুদ্ধ করে। বগড়িতে যদু সিংহের বিদ্রোহ, ঘাটশিলা-ধলভূমগড়ে জগন্নাথ ধলের বিদ্রোহ, বরাভূমের পাইক সর্দারের বিদ্রোহ, ময়ূরভঞ্জ ও পাতকুমে বিদ্রোহ- প্রভৃতি স্থানে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের লড়াই হয়। এই সময় অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড রাজমহলে সুপারিন্‌টেনডেন্ট হয়ে আসেন। তিনি ১৭৭৩ সাল থেকেই পাহাড়িয়াদের উপর নজর রাখেন। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব জানতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়িয়া ও সাঁওতালদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কের উপরে জল ঢেলে দিতে চাইলেন। ক্লিভল্যাণ্ড চালাকি করে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বড়ো খাসি,

সরু চাল, ঘি ইত্যাদি লোভ দেখিয়ে অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়িদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি পাহাড়িয়াদের কাছ থেকে সাঁওতালদের সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারেন। তখন তিনি পাহাড়িয়া সর্দারদের মাসে দশ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সঙ্গে চারশো পাহাড়িয়া কোম্পানির ফৌজ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। পাহাড়িয়ারা যখন ইংরেজের সঙ্গে যোগদান করে তখন তিলকা মাঝির বাবা সুন্দ্রা মুর্মু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজের আতঙ্কে সে সাঁওতালের মরণ ঘন্টা শুনতে পেয়েছিল। পাহাড়িয়ার চিন্তায় মারা যায় সুন্দ্রা মুর্মু। তার মৃত্যুতে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে। তিলকার নেতৃত্বে আধুনিক যুগ শুরু হয়। পাহাড়িয়াদের জন্যেই সাঁওতালদের বিপদ। লড়াকু পাহাড়িয়াদের নিয়ে গর্ব করার দিন শেষ। গবির মানুষের বেশভূষা ত্যাগ করে পাহাড়িয়ারা নীল জামা, লাল পাগড়ি পড়ে কোম্পানির সিপাহী হয়ে উঠে। তারা আদিবাসী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ফলত পাহাড়িয়া এবং সাঁওতালদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কিন্তু এরা সহজ সরল জাতি। তারা ইংরেজ সরকারের চক্রান্ত বুঝতে পারে না। তাদের জীবন চলে সরলরেখায়। ইংরেজ সরকার 'দামিন-ই কোহ্' অঞ্চলের গ্রামীন জীবন ও আদিবাসী জীবনের আদল ভেঙ্গে তছনছ করার পরিকল্পনা করে। তাই ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের উপরে জোরজুলুম করে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করে। 'খাজনা'র বিরুদ্ধে ১৭৮০ সালের নাগাদ তিলকা মাঝি 'গিরা' ডাকে-

> আমি নই দেশমাঝি, নই পরগণাইত তবু গিরা দিলাম। আমার স্বপনে সে প্রথম আয়ু বার বার আসে, বুকে আসে। তাতেই বুকে বল পেলাম। বড় বিপদ আমাদের, বড় দুর্দিন। কোম্পানি জোর জুলুমে বাধ্য করাবে আমাদের, কোমর ভেঙ্গে দিবে আমাদের। তাতেই এখন খাজনা উঠাতে চায়। খাজনা দাও, তুমি এখন কোম্পানির প্রজা।[৬৯]

খাজনার প্রথম বলি হয় জঙ্গল সীমান্তে অবস্থিত সাঁওতালদের পিপলা গ্রাম। পিপলা গ্রামে প্রবেশ করে কোম্পানীর তহশিলদার ও সিপাহীরা। সৈন্যর দল গ্রামের দশ ঘর ঘিরে ফেলে, তারা গুলি ছুঁড়ে সাঁওতাল জাতিকে তাড়া করে। সিপাহীরা সাঁওতালদের ধানের উপর ও ঘর-

বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুন দেখে সাঁওতাল নর-নারীরা পালাতে শুরু করে। আর পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায় ভাগলপুর জেলে। ফলে পিপলা গ্রাম শূন্য হয়ে যায়। জঙ্গলের ভিতরে এক সুবিশাল দুর্গে সাহস করে প্রবেশ করতে ভয় পায় পুলিশবাহিনী। ক্লিভল্যাণ্ডের নির্দেশে বহু সাঁওতাল গ্রামে আক্রমণ করে তহসিলদার ও সিপাহীরা। তখন তিলকা মাঝি আরও ক্ষেপে যায়। এই সময় জঙ্গল এলাকায় দূরধিগম্য পরিবেশ। বর্ষাকালে তিতাপানি নদী, পাহাড়ি ঝরণা, নালা-নদী ও ঝরণা জঙ্গলের জলে 'দামিন-ই কোহ্' পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। জঙ্গল ডুবে গেলে হবে কী? ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব জঙ্গলে যুদ্ধের অভিযান চালাতে থাকেন। তিনি বার বার যুদ্ধের রণনীতি পাল্টে ফেলেন, ছ'টি ফৌজ আক্রমণ করে প্রান্তের সাঁওতাল বসতিতে বন্দুক গুলি নিয়ে মোরেল, হেবার, গেব্রিয়েল, অ্যাসকট ও মিটফোর্ড প্রবেশ করে। মিটফোর্ড আনে পঞ্চাশজন পাহাড়িয়া সেপাই। কিন্তু তিলকা মাঝি তার দলবল নিয়ে তীর ও বাটুল দিয়ে লড়াই করে। লড়াইয়ে উভয় পক্ষের জখম হয়। সেই সঙ্গে পাহাড়িয়ারাও মারা যায়। পাহাড়িয়া বুঝতে পারে যে আসল শত্রু হলো ইংরেজরাই।

পাহাড়িয়ারা সাঁওতালদের সঙ্গে আবার একজোট হয়ে যায়। মহামন্বন্তরের ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তার উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাপিয়ে দেওয়া কর। 'বিনিময়' প্রথা চরম পর্যায়ে উঠে। কোম্পানির অত্যাচারে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা জর্জরিত। বাঁচার তাগিদে তারা ইংরেজ সরকারের খাজনাপ্রথাকে বিরোধিতা করে এবং জমির দখল ছাড়তে চায় না। তিলকা মাঝি লড়াইয়ের জন্য নিজের হাতিয়ার প্রস্তুত করে- 'ঈর্ষৎ রুক্ষ কোঁকড়া চুলগুলি জালি সুতোয় বোনা লাল জালের ফেটিতে কপাল ঘিরে জড়ানো। কোমরে খাটো ধুতি, কাঁধে জালের গেঁজিয়াতে গুলতি বাঁটুল, পিঠে ঝুলানো তীরপোষ। হাতে ধনুক ও তীর। উচ্চতা সাধারণ, বৈশিষ্ট্য কাঁধ, ঘাড় ও হাতের কবজি বলিষ্ঠ গড়ান। যুদ্ধের পর যুদ্ধের চিহ্ন কপালে, বাহুতে,

পিঠে।'[৭০] লড়াই শুরু হয়, তিলকা মাঝির সঙ্গে ক্লিভল্যাণ্ডের যুদ্ধ হয়। বাবা তিলকা মাঝি পাথরের আড়ালে বসে থাকে। জঙ্গলের আড়াল থেকে তীর-বাটুল ছোঁড়ে তিলকা-

> জঙ্গল এলাকায় তোমরা বে-হক ঢুকেছ, নিরীহ মানুষ মেরেছ, ঘর জ্বলিয়েছ, আমরা তমাদের বের করে দেব। শিঙা ফেলে বিদ্যুদ্বেগে তিলকার দিকে বন্দুক তোলে ক্লিভল্যান্ড। তিলকার গুলতি থেকে বাঁটুল ছুঁটে যায় পর পর। তিলকার প্রিয় আর বড় বিশ্বাসী হাতিয়ার। তিলকা চেঁচায়, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমাদের ইলাকা থেকে।- ঘুরে পড়ে ক্লিভল্যান্ড ছত্রভঙ্গ কোম্পানি ফৌজ। জয়োল্লাসে ধ্বনি ওঠে- হুল হুল।[৭১]

১৩ই জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ডের অবসান ঘটে। গোটা ভাগলপুর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ক্লিভল্যাণ্ডের সমাধিতে বড় বড় কথা লিখে দিলেন। ক্লিভল্যাণ্ডের মৃত্যুর আগে থেকেই ইংরেজ সরকার ব্যবস্যা বানিজ্যকে বিস্তার করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা করেছিল। ইংরেজ সরকার ১৭৭৭ সালের শেষে 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' আইন করেছিল, পরে 'দশসালা বন্দোবস্ত' আইন পাশ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮১ সালে বাংলার রাজস্ব ২১ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেয়। বাড়তি রাজস্ব তুলতে হলে যত জমিতে লাঙল চলে, তার শেষ ছটাক জমিও খাজনা আদায়ের আওতায় রাখা হয়। সরকারের এই খাজনা নিয়মকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই হয়। ১৭৮০ সালে মহীশূরে হায়দার আলি ফরাসিদের সহায়তায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ওড়িশার সংলগ্ন জঙ্গলমহলের জমিদার ও অধিবাসীদের জমিজায়গা কোম্পানি আক্রমণ করে। ফলে মেদিনীপুর ও বীরভূমের আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে। যা আসলে ১৭৮০-র দশকে 'বিদ্রোহের দশক' বলা হয়। আদিবাসীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে। ওয়ারেট হেস্টিংস বুঝতে পারেন যে, সাঁওতালদের নেতা তিলকা মাঝিকে জব্দ করলেই বিদ্রোহ দমন সাফল্য পাবে। এই সময় বাবা তিলকা মাঝিও জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তিলকা মাঝিকে ধরার জন্য ইংরেজ ফৌজ বাহিনী লাগাতার আক্রমণ করতে থাকে। তিলকা

জঙ্গলের ভিতরে দিনের পর দিন লড়াই করে। একটা সময় তিলকার খাবার ও তীর-বাঁটুল ফুরিয়ে যায়। জঙ্গলের বাইরে কোম্পানির ফৌজ বন্দুক আর বেয়নেট গুলির বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি টাঙি দিয়ে যুদ্ধ করে, কিন্তু বহু ফৌজ মিলে রক্তাক্ত তিলকাকে ধরে ফেলে। কোম্পানির ফৌজ বাহিনী জঙ্গল থেকে তিলকাকে নিয়ে যায় ভাগলপুরে- 'ঘোড়ার পায়ে বাঁধা তিলকা। ঘোড়া ছুটছে, তিলকার শরীর ছেঁচড়ে যাচ্ছে। নেই, চেতনা নেই। চেতনা আসছে। ঘোড়া থামল।'[৭২] ১৭৮৫ সালে ইংরেজ সরকার ভাগলপুরের একটা বটগাছে তিলকা মাঝিকে ফাঁসি দেয়।

'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহের পাশাপাশি সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান ও পূজারী, তারই কিছু নিদর্শন এই উপন্যাসে উল্লেখিত। সাঁওতালরা 'শালগাছ'কে পরম যত্নে পূজা ও ব্যবহার করে থাকে। সাঁওতালদের উৎসব-আনন্দে যেমন শালগাছ পূজিত হয়, তেমনি সাঁওতালদের বিপদ-আপদেও ব্যবহৃত হয়। এই উপন্যাসে 'শালগাছে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। সাঁওতালদের একটা ডাক আছে, যে ডাকের মাধ্যমে সমগ্র সাঁওতাল জাতি সমবেত হয়ে উঠে। সেই ডাকের নামই হলো 'শালগিরার ডাক'। এই ডাক শুরু করেছিলেন বাবা তিলকা মাঝি। বাবা তিলকা মাঝি দলবল নিয়ে ১৭৮৪ সালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন।

'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে দেখা যায়, সাঁওতালদের মতই শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করে পাহাড়িয়ারা। সাঁওতালদের সব চেয়ে প্রিয় শিকার উৎসব বছরের যে কোনো একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তবে শীতকালেই বেশিরভাগ হয়। কম করে তিন দিন ধরে শিকার উৎসব পালন করা হয়। তিন দিন আর ঘরে ফেরা হয় না। সবগুলি গ্রামের প্রধান এক হয়। দশটি, বিশটি, পঞ্চাশটি গ্রাম মিলে এক পরগণা গঠিত হয়। পরগণার উপরে থাকে পরগণায়েত।

সকলে এক হয়ে শিকারের দিন ঠিক করে। পুরুষরা সারাদিন শিকার করে বিকেলে এক জায়গায় মিলিত হয়। সেখানে আগুন পোহাও, শিকারের মাংস খাও, পালা করে কেউ জেগে থাকে, কেউ ঘুমোচ্ছে। তিনদিন বাদে সকল গ্রাম প্রধান এক হয়ে জঙ্গলের উঁচুজমিতে চূড়ান্ত বিচারসভা আয়োজন করে। এখানে বসে সবাই যে-যার গ্রামের অভিযোগ শোনে, বিচার করে মাঝিরা, পরগণায়েত। সাঁওতাল সমাজের নিয়ম অনুসারে শিকার পরবে যোগদান করতে গেলে কম করে চৌদ্দ বছর বয়স লাগে। অথচ এই উপন্যাসের নায়ক তিলকা মাঝির বয়স চোদ্দ বছর হয়নি। তবুও সে শিকার পরবের জন্য ছাড় পায়। তিলকা বড় ছেলেদের সঙ্গে মিশে যায়। তিলকা নাচ-গান আনন্দ উৎসব করে। বাঁচার জন্য গান করে। আবার তিলকা মাঝি মরণের জন্যও গান করে -

সওয়া ধারতিরে হাসা হড়মরে
লান্দায় লেকাকে জিউয়ি মানাঃ।
নওয়া জিউয়ি দ শিশির দাঃ লেকা
অক দিশম চং অটাং চালাঃ।[৭৩]

শিকার পরবের গান। প্রথম রাতের গান –

বাহারেদ সহরায় বেদ
ইঞ হঁ লাই আঞপে
ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।
আপে রেয়াঃ দেওয়া সেবা
ইঞ হঁ দাদা বাতায় গেয়া
ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।
সেনদ্রারে দ কারকারে দ
বলনরে সে নাওতাঞ পে,
ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।।[৭৪]

গানে গানে স্মরণ করা হয় অতীতকে-

চাম্পা থেকে সাওন্ত
কত পথ, কত কত পথ
নাগারা মাদল বাঁশির সুরের পথ
ছেলে পিঠে, মাথায় বোঝা, হাঁটার পথ
কত পথ, কত কত পথ
তারপর শাল বন আর ধূ ধূ মাঠ
আর নেচে চলা নদী
সব আমাদের ডেকে নিল
ঝকমকে পিতলের থালার মতো সূর্য না ডুবতে
ঝকঝকে পিতলের থালার মতো চাঁদ উঠেছিল।।[৭৫]

সাঁওতাল মেয়েরা ধান রোয়ার সময়ও গান করে-

নদীর ধারে বনের ধারে
ফুল ফুটছে ফুল ফুটেছে
ভাদ্র মাসের ফুল।
বাঘ ডাকে না পাহাড়তলায়
বাঘ ডাকছে পাহাড়চূড়ায়
ভাদ্র মাসের দিন।
ফুল তুলেছি চুলে পরছি
ফুল তুলেছি কানে পরিছি
ভাদ্র মাসের ফুল।[৭৬]

শুধু ধান রোয়ার গান করে, এমনটা নয়। সাঁওতাল মেয়েরা দুঃখ-বিষাদের গানও করে। দুঃখ বিষাদের সুরে হুল গানও করে-

নুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো তেঙ্গোন,
খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,
খাঁটি গেবোন হুল্লেয়া হো,
দিশম দিশম দেশমাঞ্জহি পারগানা
নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো

দঃ বোন দানাং বোন বাং গোকো তেঙ্গোন

তবে গেবোন হুলগেয়া হো।[৭৭]

'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী সাঁওতাল সমাজের শিকার পরবের গানগুলি সুন্দর ও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। আখ্যানের আড়ালে সংগীতের সুর ও পরিবেশের তাৎপর্য উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত হয়েছে। সাঁওতালরা গান-নাচ প্রিয় মানুষ।

'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের মধ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্যগুলো আমরা পেয়েছি, তাতে মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবে তুলে ধরেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপন্যাসের মধ্যে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেই তথ্যের সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যের কোন যোগসূত্র নেই। বলা যেতে পারে মহাশ্বেতা দেবী সেই তথ্যগুলি নিজের মতো করে নির্মাণ করেছেন। একজন ঔপন্যাসিক ইতিহাসের তথ্যকে সবসময় একই রকম ভাবে প্রকাশ করবেন- এমনটা নাও হতে পারে অর্থাৎ ইতিহাসের উপাদানকে সংগ্রহ করে লেখক নিজের মতো করে কাহিনি উপস্থাপন করতেই পারেন। এইটুকু স্বাধীনতা একজন লেখকের থাকে। বাবা তিলকা মাঝির যে লড়াইয়ের কথা লেখিকা জানিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে বাটুলের ব্যবহার ও তার গুরুত্ব বিশাল। লেখিকা জানিয়েছেন, অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডকে বাটুল দিয়ে মেরেছেন বাবা তিলকা মাঝি এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লিভল্যান্ড সাহেব মারা যান- এই তথ্যও সঠিক নয়। শুধুমাত্র উইকিপিডিয়াতে উল্লেখ আছে, তবে সেখানেও কোনো রেফারেন্স উল্লেখ নেই। আসলে ক্লিভল্যান্ড সাহেব যুদ্ধের বেশ কিছুদিন পরে মারা যান। তবে এটুকু বলা যায় যে তিলকা মাঝির আক্রমণে ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব আহত হয়েছিলেন। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো ইতিহাসবিদ সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। এই উপন্যাসে আমরা দেখেছি যে, বাবা তিলকা মাঝির মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ ভাগলপুরের বটগাছে তাকে ফাঁসি দেয়। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য অনুসারে বলা যায়, বাবা তিলকা মাঝি ভাগলপুর জেলে বন্দী হয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে বাবা তিলকা মাঝির লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত জীবন্তভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাবা তিলকা মাঝির পর সাঁওতালদের সব থেকে বড়ো আন্দোলন হলো ‘হুল’, যা ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তিনি ‘সিধু কানুর ডাকে’(১৯৮১) উপন্যাস রচনা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নানা ঘটনা এবং নায়ক সিধু কানুর লড়াকু মানসিকতা লেখিকা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকে ইংরেজ সরকারের শাসনব্যবস্থা, আইন কানুন ও ক্ষমতার প্রয়োগ কীরকম ভাবে এসেছে? এবং সেই সূত্রে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জীবনে কতখানি প্রভাব পড়েছে? তার গোটা বৃত্তান্ত ‘সিধু কানুর ডাকে’ উপন্যাসের পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় শুকনো ঘাসপাতায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুন লাগিয়েছে জংলী, জানোয়ার, ভূত, বাঁদর, উল্লুক, গাধা, বদমাশ ও শয়তান ধনরাম টুডু। ধনরাম টুডু নাগিন দাসের কাছে বেগার খাটত, সেখান থেকে পালিয়ে আসে। রাস্তায় সিধুর সঙ্গে তার দেখা হয়। সিধু তাকে ধরে নিয়ে আসার সময় রাম লোহার তেড়ে তেড়ে আসে ধনরামকে মারার জন্য। ধনরাম মানুষ নয়- বান্ধা বেগার, নাগিন দাস তাকে মর্মান্তিক অত্যাচার করে। কারণ ধনরাম তিন টাকা ধার নিয়েছিল, সেই টাকা সাত বছর বেগার খাটার পরও শোধ করতে পারেনি। নাগিন দাস ধনরামকে খুঁজে পায়নি বলে তার ভাই ও বাবাকে তুলে নিয়ে যায়।

বীর সিধুরা চার ভাই। তারা লক্ষ্য করে দিকু জমিদার, মহাজন, পেয়াদা-গোমস্তা, কোম্পানি পুলিশের অত্যাচার। নাগিন দাসের মতো বহু জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের মানসিকতা সাঁওতাল সমাজে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে। চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে তীর-ধনুক লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। সিধুর ভয়ে নাগিন দাসের পেয়াদা ও পাইকরা পালিয়ে যায়। তখন বীর সিধু ধনরামের ভাই ও বাবাকে উদ্ধার করে। তারপর থেকে বারহাট বাজারে সিধু-কানুর সঙ্গে দিকুদের প্রায় ঝামেলা বাঁধে। সিধু তার বাবার

কাছে শুনেছে বাবা তিলকা মাঝি রাজমহল এলাকায় সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ইংরেজরা বাবা তিলকা মাঝিকে ভাগলপুরে ফাঁসি দিয়েছিল। বাবা 'তিলকা মাঝির বিদ্রোহ' এবং 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র ব্যবধান খুব একটা বেশি নয়। সিধুর বাবা জানে যে বাবা তিলকা মাঝি ফাঁসি যেতে যেতে বলেছিল- 'হুলমাহাটা কে করবে, হুলমাহাটা?'। হুলমাহা করার জন্য সিধু প্রস্তুত হয়। কারণ সাঁইথিয়া থেকে কলগাঁও, বারহারোয়া থেকে দেওঘর- গোটা এলাকায় সাঁওতালদের পায়ে শিকল। আর অন্যদিকে মহেশপুর, পাকুড়, বারহেট বাজার, মিছাপুর, আমড়াতলা- ইত্যাদি স্থানে সাঁওতালরা বাঁধা বেগার খাটে। বাবার আমল থেকে যে ঋণ ছিল, সেই ঋণ শোধ করতে আজীবন বেগার খাটা সাঁওতাল সমাজে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যা থেকে মুক্তি লাভের কোনো উপায় ছিল না। দিকু মহাজন আর বুড়া হুড়ার, দুই সমান। বাঙালি, বিহারী মহাজন ও কোম্পানির লোক একজোট হয়। মহেশ দারোগা ও কেনারাম দুইজন মিলে এবং পুলিশের সহযোগিতায় বেগার খাটা বিজয়কে বিনা বিচারে ভাগলপুর জেলে ফাঁসি দিয়েছিল। জমিদার, নায়েব, কাছারি, ব্যবসায়ী, মহাজন, নীলকর সাহেব, মদ-বিক্রেতা ও নায়েব দারোগার সাহয্যে সাঁওতালদের যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তারা কোনো বিচার পেত না। কারণ সেই সময় শিক্ষিত মানুষ সাঁওতাল পরগণাতে ছিল না। শিক্ষিত মানেই শহর কলকাতার মানুষ। শিক্ষিত মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস অশিক্ষিত মানুষের ছোঁয়া বড় অপবিত্র। অথচ দামিনি-কো এলাকার মেহনতি মানুষের রক্ত ঝরিয়ে ধান-চাল-ডাল-তেল সরষে চাষ করে শহরের মানুষের কাছে রপ্তানি হয়। এই সকল সাঁওতালরা যে ভাবে কৃষি সভ্যতাকে উন্নত করেছিল, ঠিক সেই সময়েই ইংরেজদের অত্যাচার বাড়তে থাকে। ফলে কৃষিসভ্যতার ধ্বংসের মুখে দাঁড়ায়। অন্য দিকে ইংরেজদের রেলপথ বিস্তার, নীল চাষ, চা-চাষ বিস্তার লাভ করে। আর কলকাতার বাঙালিদের ধারণা ছিল না সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে, তারা বাঙালি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাত-

যারা বাল্যবিবাহ জানে না, বিধবাবিবাহ যাদের সামাজিক নিয়মে স্বীকৃত, বিধবাকে যারা পোড়ায় না, নারীকে করে না অসম্মান, তাদের খবর সেই দিনের বাঙালী রাখে নি। যারা অসভ্য, তারাই যে সভ্য, যারা অনুন্নত, তারাই সভ্যতার চরিত্রগুণে উন্নত, একথা বাঙালি জানত না।[৭৮]

সাঁওতাল জনজাতির মানুষ শহরের চাল-চলন বুঝত না। তারা শহরের মানুষের মতো চালাক চতুর হতে পারেনি এবং শহরের ভাষা ও রীতি বোঝেনি। বন-জঙ্গলের রীতি অনুসারেই সাঁওতালদের দিনযাপন ও বিশ্বাস বেঁচে আছে। সেই প্রাচীন শালগাছের মাধ্যমেই লোকজনকে জড়ো করার মতো ঐতিহ্যপ্রথা এরা ব্যবহার করে। সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব চার ভাই মিলে মহাজনদের অত্যাচার নিয়ে বৈঠক করে। ১২৬১ বঙ্গাব্দে সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরবরা বুঝতে পেরেছিল যে, সাঁওতাল নারীরাও ছাড় পাবে না। আষাঢ় মাসে বীর সিধু অলৌকিক ভাবে ঠাকুরের নির্দেশ পায়। ১২৬২ বঙ্গাব্দে সিধু-কানু নাগড়া মাদল বাজিয়ে হুল গিরার ডাক দেয়। মহাজনের দলবল সাঁওতাল গ্রামে যেতে সাহস পেত না। সেই সুযোগে ধনরামের মতো বিশালী ও মঙ্গল পালিয়ে আসে সাঁওতাল গ্রামে। হাজার হাজার সাঁওতাল মানুষ জড়ো হয়ে যায় ভগনাডিহির মাঠে। শুধু দামিন-ই নয়, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, মানভূম থেকে সাঁওতালরা আসে যুদ্ধ করার জন্য-

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডিহি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বের মাঠে এক প্রাচীন ও বিশাল বটগাছের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল জমা হয়েছিল। তারা যে কত হাজার, কে তা বলবে? কে হিসাব রেখেছিল? মাঠে যদি বা দশ হাজার সাঁওতাল থাকে, আরও তো সাঁওতাল আসছিল।[৭৯]

আর কাজের জন্য যারা মানভূম, হাজারীবাগ, মালদা, পূর্ণিয়া, বর্ধমান, রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ছিল, তারাও ফিরে এসেছিল। সেই দিন তাদের হুল গান হয়েছিল– ‘হুল আমাদের অধিকার ফিরে পাবার হাতিয়ার/ হুল আমাদের হাতে তুলে দেবে দেশ ও রাজ্য।’ বহু সাঁওতালের মাঝে লড়াকু সিধু মুর্মু বলেছিল- ‘জোহার’। সমস্ত সাঁওতাল মন দিয়ে সিধুর কথা শোনে। সিধুর বাবা

তিলকা মাঝির ইতিহাসের কথা বলে। ভগনাডিহির মাঠ থেকেই 'হুলশাই' করতে করতে সাঁওতালরা রওনা দেয় মহাজন মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হীরু দত্তের দিকে। পাঁচক্ষেতিয়া বাজারে সাঁওতালরা প্রথমেই মানিকবাবুকে হত্যা করে। পাঁচক্ষেতিয়া বাজারের পর বারহেট বাজারের অন্যতম টার্গেট মহেশ দারোগা ও কেনারাম ভকত। সাঁওতালরা কেনারাম ভকতকে মারার পরে মহেশ দারোগাকে কুড়াল দিয়ে হত্যা করে। তারপর তারা রাজদান, নগিন দাস ও চুনীলালকে খতম করে দেয়। তারপর বারহেট বাজারের জমিদার- সিপাহীদের হত্যা করা হয়। তখন সাধারণ বিহারি ও বাঙালিরা সাঁওতালদের সম্পর্কে ভাবে–

> সাঁওতালরা কি করে? তারা জমিদার মহাজন নায়েব সুজাওয়াল, নীলকুঠির পাইক লেঠেল আমিন গোমস্তাদের খুন করে। ঘরবাড়ি জ্বালায়। নীলকুঠি গুলিতে আগুন জ্বলে। হা রে সাঁওতাল। কোম্পানির শাসন কি নাই? না না, কোম্পানি সরকার যেখানে গেছে তুইও সেখানে যা। স্বাধীন সাঁওতালরাজে তোদের জায়গা নাই।[৮০]

জমিদার-জোতদার-মহাজনরা বারহেট বাজার থেকে পালাতে থাকে। এই সমস্ত ঘটনা কলকাতার ইংরেজদের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনো আমল দেয়নি। তবে ভাগলপুরের কমিশনার ব্রাউন খবর পেতেই 'বিদ্রোহ দমন' নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। বহু সাঁওতালকে ভাগলপুর জেলখানায় বন্দী করা হয়। কমিশনার ব্রাউন ঘোষনা করলেন বিদ্রোহী নেতাদের ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু সাঁওতালদের বিদ্রোহ দমন করা সহজ ছিল না। ভাগলপুর, লক্ষ্মণপুর, হিরণপুর বাজার পর্যন্ত সাঁওতালরাজ চলতে থাকে। সিধু-কানুরা কলিকাপুর, বল্লভপুর, সাহাবাজপুর ও নবীনগর হয়ে মুর্শিদাবাদ যখন যায়, তখন তারা সব ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারপর সিধু কানুকে লক্ষ্য করে পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। চার ভাই জখম হয়ে যায়, কিন্তু মারা যায়নি। সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরবরা কষ্ট করে ভোর রাতে চলে যায় কুজড়া গ্রামে। তারপরে সামরিক বিভাগের সমস্ত ইংরেজ অফিসার, গোটা

পুলিশ দপ্তর, কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট সুপারিন্টেন্ডন্ট, জমিদার, সবাই মিলে বিদ্রোহীদের তল্লাশি করে।

সাঁওতালরা শান্তিপ্রিয়, তারা খুব সহজ সরল মানুষ। কিন্তু বাস্তবে সাঁওতালদের আক্রোশ ইংরেজরা বুঝতে পারেনি। তারা সাঁওতালদের বক্তব্য শুনতে চেয়েছিল। জমিদারদের অত্যাচার ও সরকারের খাজনার কারণে সাঁওতালদের রাগ, বিদ্বেষ, আক্রোশ অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছেছিল। তার উপর কোম্পানির লোক জোর করে রেললাইনের কাজে বহু সাঁওতালকে নিযুক্ত করে। এরা রেলপথের বিরোধীতা করেছিল। তারা নানা কারণে যুদ্ধ থামায়নি, বহু নির্মম মানুষকে হত্যা করে। সাঁওতালরা তালডাঙ্গা, সাঁইথিয়া, ভাগলপুর ও রাজমহলের গ্রামগুলিতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করেছিল। বীর সিধুর দাবি হলো- ‘আমাদের জমি, আমাদের জঙ্গল, আমাদের সমাজ। ...সাহেবরা যেমন ঘুম ভাঙি জানতেছে যে সন্তাল বলি একটা জাত আছে।’ ইংরেজদের বন্দুকের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের তীর গর্জে উঠে। আধুনিক বন্দুকের বিরুদ্ধে আদিম ধনুকের লড়াই চলতে থাকে। ভাগলপুরের কমিশনার মার্শাল ঘোষণা করে যে, সিধু-কানুকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর সেই সময় ইংরেজ সরকার পেনরোটি গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বহু সাঁওতাল নারী-শিশু মারা যায়। ইংরেজ সরকার ভগনাডিহিতে এসে সাঁওতাল গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এর আতঙ্কে মেয়েরা ও শিশুরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে সুন্দ্রা ও রাম তাদের দলবল নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় দুমকা মহকুমার থানায়। সারু মাঝি সিউড়ি দখল করতে যায়। সেখানেও মাঝি সিউড়ি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারপর সাঁওতালরা কুজড়া গ্রাম থেকে বনে-জঙ্গলে অবস্থিত পিপলা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। জঙ্গলের গ্রামে সাঁওতালরা গরম ভাত ও লবণ খেয়ে বেঁচে ছিল। যুদ্ধবাজ সাঁওতালরা পিপলা গ্রাম থেকে মহিলা ও শিশুদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল। ভাগলপুরের কমিশনার মার্শাল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে। পিপলা গ্রামে সিপাহীরা সার্চ করে করে ঢুকতে থাকে।

সিপাহীরা সাঁওতালদের আত্মসমর্পন করার কথা বলে কিন্তু তারা রাজি হয়নি। ফলে ইংরেজরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। আর সাঁওতালরা নাগরা বাজাতে থাকে। এই যুদ্ধে বহু সাঁওতাল মারা যায়।

সাঁওতালদের হুল কিন্তু থেমে থাকেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চার ভাইয়ের নানা জবানীতে। হুল কেন এবং কিসের জন্য দরকার, তার উত্তরে সিধু বলেছিল– 'হুল আমরা কেন করেছিলাম তা সবাই জানি। স্বাধীন সন্তালরাজের জন্য। তা হবে কি না হবে সে বিচার করব কেন? ... হুল করেছি, তা চালাব। রাজ পাব কি না পাব জানি না। কিন্তুক যতদিন না সন্তাল লোক সুবিচার পায়, সে হুল করবে, অন্য জাতে কেউ লড়াই ডাকলে তাতে যাবে।'[৮১] বিদ্রোহের প্রভাব সাঁওতাল সমাজে গভীরভাবে পড়েছিল। যেখানে মঙ্গল ও বিশালীর মতো চরিত্রও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। লড়াইয়ের তাগিদে মঙ্গল আর বিশালী চন্দননালার পশ্চিম হাজারীবাগের দিকে যায়। হাজারীবাগে ইংরেজ লেফটন্যান্ট ফেগানের বিরুদ্ধে মঙ্গল ও বিশালী লড়াই করে। ঠিক একই সময়েই ভাগলপুরে গোডেলে সঙ্গে চাঁদ ও ভৈরবের যুদ্ধ হয়। গোডেলের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞাতা ছিল বলে তীরন্দাজদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তার উপর তাদের পিছনে ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ফলে তারা মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল। গুলি ও তীরের যুদ্ধে চাঁদ ও ভৈরবের মৃত্যু হয়। কিন্তু সিধু আর কানুকে পাওয়া যায়নি। সরকারী অফিসাররা বুঝতে পেরেছিল যে–

> হুল' শব্দটি যেমন সাঁওতালদের মনে প্রেরণা এনে ওদের যুদ্ধে নামিয়েছিল, 'সিদু-কানু বেঁচে আছে' এ কথাও ওদের প্রেরণা দিচ্ছে, মরতে সাহস জোগাচ্ছে। সাঁওতালদের মনে 'হুল' যা, সিদু-কানুও তাই। দুটোর জায়গাই ওদের কালো বুকের হৃৎপিণ্ডে।[৮২]

ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত সিধু-কানুকে খুঁজে পায়। সেনাবাহিনীর দল সিধুকে ধরে বারহেট বাজারে নিয়ে যায়। ইংরেজ সরকার সাঁওতাল জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জনগণের সামনে ক্ষতবিক্ষত সিধুকে ফাঁসি দেয় মহুয়া গাছের তলায়। সেখানে হাজার হাজার সাঁওতাল উপস্থিত

হয়। সাঁওতাল নর-নারীরা আকুল ভাবে প্রার্থনা করেছিল। ফাঁসি দেওয়ার সময় সিধুর মুখ ও চোখ জ্বলে উঠেছিল এবং সামনের দিকে চেয়ে হেসেছিল। সে হাসির মধ্যে সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহের আগুন ছিল। সিধু মুর্মু দুঃখি ও নিপীড়িত মানুষের অন্তরে জন্ম নিয়ে বেঁচে আছে। সিধু মৃত্যুহীন, অন্তহীন। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে জেল খানায় কানুর ফাঁসি হয়। কানু দেখতে পায় সাঁওতালরা বন্দীখানায় আছে, তাদের অবস্থা খুব শোচনীয়। সাঁওতালদের কাছে শোক পালন করা ছাড়া আর কি বা আছে, তাই কানু বলেছিল– 'আবার আমি আসব, আবার আসব, আবার আবার আসব।'

'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসেও নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। 'ঘন্টা বাজে' অংশে দেখা যায় পাহাড়ের নিচে জঙ্গলের মধ্যে বিরহা গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামের মধ্যে ভূঞা রাজারা ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে। বিরহা গ্রামের আশেপাশে ধানতোলা হাট ও ধানতোলা গঞ্জ অবস্থিত। সেখানে দারোগা ও মহাজন মিশ্রলাল দুইজন মিলে সাধারণ কৃষকের উপরে অত্যাচার করে। মিশ্রলাল মাঝিপাড়া, সিংপাড়া, ডোমপাড়ায় ধান দেয়। এক টাকা দিলে, সাত টাকা সুদ নেয়। বিরহা গ্রামে ১৮৫৫ সালে শালগাছের গিরা ডাক পৌঁছেছিল। সেখানেও মাঝি পাড়ায় বলরাম ও গিরি ঘন্টা বাজিয়ে ছিল। ধানতোলার হাটে মহাজন মিশ্রলাল ও দারোগার বিরুদ্ধে বলরাম ও গিরি লড়াই করে। কিন্তু বির্হা গ্রামের অশিক্ষিত বলরাম কিস্কু আর গিরি মাঝি হক আদায় করতে পারে না। তারা ঠকে যায় কাছারি-দারোগা-নায়েব-মহাজন-নীলকরের কাছে। দারোগার ফৌজের কাছে বলরাম কিস্কু ও গিরি মাঝি ধরা পড়ে। দুজনেরই ফাঁসি হয়। তাদের মৃত্যুর পর বির্হা গ্রামের সরোজ ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে।

সরোজ শহীদ হওয়ার পর বিরহা গ্রামে ঘন্টা বাজে না। কারণ, জমিদার শরত ভূঞার ছেলে অনুপম ভূঞা জমিদারী উচ্ছেদ আইনটি স্বাগত জানিয়ে নিজের নামে বহু জমি দখল করে। সাঁওতালদের জঙ্গল সরকারের হাতে চলে যায়। ১৯৬৯ সালে সৎভাবে কাজ করার জন্য

বনপাল সরকারের নজরে পড়ে। ফলে সরকার তাকে মিথ্যা বদনাম দিয়ে বরখাস্ত করে। জঙ্গলের গাছগুলি বে-আইনি ভাবে কাটা হয়। তখন জঙ্গল নিয়ে সাঁওতালরা নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে। এই সময় 'গরিবদের কমরেড' সভা গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে সরকারের বিরোধীদল হিসাবে গরিব কমরেড দল পরিচিতি লাভ করে। আদিবাসী অফিসার সুবল সিং-কে উৎসাহ দেওয়া হয়। সেই উৎসাহে সুবল সিং গ্রামের লোককে বোঝায়। সুবল শিক্ষিত বলে গ্রামের লোক তার কথা শোনে। সরকার আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ থেকে লাগাতার বঞ্চিত করতে থাকে। তাই গ্রামের সাঁওতালদের লড়াইয়ে মুণ্ডা সমাজও যোগদান করে। কন্যাপণ সর্বাধিক বারো টাকা, মা-মান্য দুই টাকা, আতেয়ার তিন টাকা, জিয়া শাড়ি একটি, শ্যালক বরণের ধুতি একটি, সমাজ শাড়ি জামা- এই ভাবে মুণ্ডা সমাজ লড়াই দলকে চালানোর জন্য নানা রকম খরচ কমিয়ে দেয়। সাঁওতাল-মুণ্ডারা বাড়ির উৎসব-পার্বণ ও হাঁড়িয়া-ফূর্তি সব বন্ধ করে দেয়। আদিবাসীরা খরচ বাঁচিয়ে সংগঠন চালানোর জন্য অর্থ জোগাড় করে। তারা লড়াই করে জমি বাঁচানোর জন্য, কিন্তু জমির দখল করতে পারে না। জমি দখলের লড়াইয়ে সরকারের লোক আদিবাসীদের 'নকশাল' তকমা দেয়। আদিবাসী 'নকশাল'দের বিরুদ্ধে সরকারের পুলিশ বির্‌হা গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামে ও জঙ্গলে যুদ্ধ চলতে থাকে। জঙ্গলে নকশাল, গ্রামে গ্রামে নকশাল দল খাস জমি দখল করে। পুলিশের বিরুদ্ধে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের লড়াইয়ে পার্বনী, দুলাচাঁদ, ভগবানো, সতাতন, বালক-বালিকা ও বরুণদের এগারোজন আহত হয়। আর পুলিশের কাছে সুবল সিং আটকে পড়ে। সুবল জ্ঞান হারায়, শিকলে আত্মহত্যা করে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসে রাজমহল এলাকায় সাহেবদের বিরুদ্ধে বাবা তিলকা মাঝির লড়াই এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ সরকার বাবা তিলকা মাঝিকে ভাগলপুরে ফাঁসি দিয়েছিল। তিলকা মাঝির হুল ডাকের পথ অনুসরণ করেছিল সিধু ও

কানু। তখন সিধু শুনেছিল নাগনা-নাগিনের গল্পকথা। নাগনা-নাগিনের কথা বলতে বোঝায়- ‘পাঁচ গ্রামের লোক এক হবে আরও আপঁচ গ্রামে যাবে। মাঝির আঙিনায় নাচবে গাইবে নাগরা বাজাবে। দুটো আইবুড়া ছেলে গলায় পইতে নেবে, দুটো লাঙলে সিদুঁর মাখাবে, ডালায় নিয়ে ঘুরবে। পাঁচ গ্রাম ঘুরলে তবে নাগনাগিনের নামে পূজা দিয়ে, অন্য দুটো ছেলের হাতে ডালা দিয়ে ফিরে যাবে। এরা আবার পাঁচ গ্রামে ফিরবে। এ কথা এখনো রাজমহলের লোকেরা জানে।’[৮৩] মহাশ্বেতা দেবী বিপদ সংকেত অর্থে নাগনা-নাগিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বিপদ শেষ হলেই সাঁওতালরা হাঁড়িয়া-মদ খেয়ে আনন্দ করে। সাঁওতালরা আদিকাল থেকেই বনে-জঙ্গলে বসবাস করত। সাঁওতালদের এক অন্যতম উৎসব হলো শিকার উৎসব। যুদ্ধের সময় যেমন ভাবে শিকার উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি যুদ্ধের সময় বিয়ের কথাও উল্লেখিত। লড়াইয়ের বিপদ কাটলে সাঁওতালরা নাচে-গানে মেতে ওঠে। তবে বিপদ সময়েও সাঁওতালদের বিয়ে হয়। তাতে অবশ্য যুদ্ধ থেমে থাকে না। সাঁওতালদের রীতি অনুসারে বলা হয়, যুদ্ধের সময় কোনো মেয়েই কুমারী থাকতে পারে না। বিপদকালে ‘সাইহা’ বিয়ে হয়, অর্থাৎ কপালে তেল দিলেই বিয়ে হয়ে যায়। পরে অনুষ্ঠান বিয়ে হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত ‘সিধু কানুর ডাকে’ উপন্যাসে দেখা যায় ভাগলপুরে গোডেলের সঙ্গে চাঁদ ও ভৈরবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চাঁদ ও ভৈরবের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হলো তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। সিধুর ফাঁসি নিয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়, তবে এই উপন্যাসে সিধুকে বারহেট বাজারে জনগণের সামনে ফাঁসি দেওয়া। আর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে কানু ঠাকুরকে বন্দী করা হয়। জেলখানায় কানুর ফাঁসি হয়ে হয়। ফাঁসির মঞ্চে কানু বলেছিলেন– ‘আবার আমি আসব, আবার আসব, আবার আবার আসব।’ কিন্তু ইতিহাসের তথ্য অনুসারে বলা যায়, ফাঁসির সময় কানু বলেছিল- ‘ছবছরের মধ্যে আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব’।[৮৪] বাংলার লেফটেন্ট গভর্নর হ্যালিডের

নির্দেশে কড়া পাহারায় কানুকে ভগনাডিহির গ্রামে পৌনে দু'টার সময় ফাঁসি দেওয়া হয় ১৮৫৬ সালের ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৮৫৫ সাল থেকে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় পেরিয়ে স্বাধীনতা উত্তর সত্তর দশক পর্যন্ত। আগস্ট আন্দোলন নাম মাত্র উল্লেখ আছে, তবে নকশাল আন্দোলনের পরিধি অল্পবিস্তর উল্লেখিত। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব পড়েছে নকশাল আন্দোলনের মধ্যে। তবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়নি, কেননা, নকশাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা।

মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮০)। এই উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের চিত্র উঠে এসেছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শিক্ষিত দিলীপ সোরেন। চরসা গ্রামের মানুষ তাকে বিশ্বাস করে না, কারণ সাঁওতাল ছেলে হয়েও ভাষার মধ্যে সাঁওতালি টান নেই। তার উপর সে পুলিশের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সরকার সাঁওতালদের জন্যে অনেক কিছুই করছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। সাঁওতাল সমাজ ধীরে ধীরে এক নতুন শ্রেণির সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিক্ষক, ডাক্তার, চাকুরে- জন্মাচ্ছে সাঁওতাল সমাজে। কিন্তু বেশিরভাগ সাঁওতালরা ধানক্ষেত, কয়লা খাদান ও অন্যত্র কুলি কাজ করে। শিক্ষিত দিলীপ সোরেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্ব-সমাজেই থেকে যায়। সোরেনের জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে। সে শহরের টাকা পয়সা, শাড়ি- গয়না, গাড়ি-ঘোড়া এবং শহরের হরেক রকম খাওয়া-দাওয়ার জীবন দেখেছে। কিন্তু সে লক্ষ্য করেছে গ্রামের সমস্যা একই রকম থেকে গেছে। চরসা গ্রামে এখনো কুয়ো নেই, জল নেই। এই গ্রামের প্রাচীন দিঘিগুলিও সংস্কার করা হয়নি। গ্রামের লোক এখনও প্রকৃতি নির্ভর, অলৌকিক বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান তাদেরকে নির্ভরশীল করতে পারেনি। দিলীপ সোরেন তার গ্রামের মানুষের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন করতে থাকে। গ্রামের মানুষকে একতা করার লক্ষ্যে সে সাঁওতাল সংগ্রামের ইতিহাস বলে– 'সবার আগে বাবা তিলকা মাঝির কথা। কমজনা জানে, কিন্তুক পহেলা লড়াইটো তিনি উঠাছিল ইংরেজের সাথে।

হাঁ। সিদো-কানহুর লড়াই হতে সত্তর বছর আগে। তা বাদে বলব সিদো-কানহুর-চাঁদো-ভৈরবের হুল-মাহার কথা। তা বাদে মালদহের জিতা সানথালের লড়াই- তা বাদে তেভাগা লড়াইয়ে যত সানথাল শহিদ হছে, তারাদের কথা-তা বাদের বসাই টুডুর কথা- আর লকশালীতে মরছে যারা তারাদের কথা-সকল কথা জুড়ি পালার আগে বন্দনা গাহি দিব।'[৮৫] দিলীপ সোরেন বসাই টুডুর সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যায়। সাঁওতালদের বিশ্বাস অনুসারে সংগ্রাম চালাতে হয়, সংগ্রাম ফুরায় না কখনো।

'অক্লান্ত কৌরব' উপন্যাসে 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের কাহিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত হয়েছে। বসাই টুডু এবং কালী সাঁতরার অন্তর্বয়ানে দিলীপ সোরেন ও ইন্দ্র প্রামাণিকের কথন স্পষ্ট ব্যাখ্যায় আলোচিত। বসাই টুডুর মৃত্যু হয়েছে বারেবারে, আসলে এই মৃত্যু চেতনার মূলে মৃত্যুহীন সংগ্রাম ও বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখিকা। দিলীপ সোরেনের মৃত্যু হয়নি, তার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায় বামপন্থী বন্ধু ইন্দ্রের সহযোগিতায়। কালী সাঁতরার আদলে তৈরি ইন্দ্র চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোকপাত হয়েছে। তবে কালী সাঁতরার মতো জনপ্রিয় চরিত্র নয় ইন্দ্র। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তার ভূমিকা যথেষ্ট, পাঠক সহজেই তাকে উপলব্ধি করে কিন্তু পাঠক যে ভাবে কালী সাঁতরার সাথে একাত্ম হয়েছে, সেই ভাবে ইন্দ্র চরিত্রের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। বরং দিলীপ সোরেনের একনিষ্ঠ, সৎ চরিত্রবান মানুষ, বিবেকবান চিন্তাধারা পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেছে। দিলীপ সোরেনের পথ চলা বসাই টুডুর জগৎ থেকে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও প্রশাসনের শাসন ও আইনকে অগ্রাহ্য করে দিলীপ সোরেন, জঙ্গলের জমি দখল ও অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে সে লড়াই বাঁচিয়ে রাখে।

কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫)। যে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে বাজিকর জাতির জন্ম বৃত্তান্ত, একই সঙ্গে উঠে

এসেছে সমাজ, ব্যবস্যা বাণিজ্য, রীতিনীতি, বিশ্বাস, ধর্ম, রাজনীতি, পৌরাণিক, ইতিহাস ও দলিল আখ্যানের চিত্র। এই আখ্যান জুড়ে রয়েছে বাজিকর গোষ্ঠীর গৃহহীন জীবনে স্থায়ী ঠিকানা খোঁজার বৃত্তান্ত। যারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নেয় বেঁচে থাকার রসদ। তাই মূল ধারার মানুষ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হলেও জীবনের অনুভূতি থেকে এরা বঞ্চিত নয়। বাজিকরের মধ্যেও প্রেম, ভালোবাসা, রাগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, ঈর্ষা প্রভৃতি অনুভূতি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম থেকেই পীতেম চরিত্রকে বাজিকরের আদিম জাতির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে সালমা, জিল্লু, পরতাম, বালিসহ বাজিকরের জীবন বৃত্তান্তকেও তুলে ধরেছেন হৃদয়তার মধ্য দিয়ে, আর এইসব মানুষদের আখ্যান হিসাবে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাস।

ইতিহাসের একটা পর্ব থেকে সময় ও পরিস্থিতির কারণে বাজিকরদের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক গভীরতর চিত্রও এখানে ফুটে উঠেছে। অবশ্য এখানে সাঁওতাল জীবনকে ফুটিয়ে তোলা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য নয়, বাজিকরের যাযাবর কাহিনি তুলে ধরায় লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মূলত নিম্নবর্গ দৃষ্টিভঙ্গির আদলে উভয় জাতির মধ্যে ভাব বিনিময় ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিস আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে তা যেন কাহিনিতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কাহিনির অন্যতম চরিত্র পীতেমের দৃষ্টিতে কালো চকচক মানুষের অফুরন্ত আনন্দ যেন বেশ বিস্ময়কর। এরা বাজিকরের মতো নয়, আবার সাধারণ গৃহস্থ মানুষের মতোও নয়, পণ্ডিত নয়, আবার মূর্খও নয়, এরা হলো খেটে খাওয়া মানুষ, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এরা পাহাড় ভেঙ্গে, জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরি করে। আবার সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যার সময় নাচ গানের মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করতে জানে। রাজমহল, বারহেট, আমগাছিয়া প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার স্থানে মহাজনের দাপট দেখেছে পীতেম। তাই

পীতেমের জীবন অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে গ্রাম-হাটগঞ্জে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ের সময় মহাজনদের চতুরতা।

পীতেম ও সালমার সম্পর্কের মতো রাজমহল বাজারেও যেন জমিদার মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্থ সাঁওতাল সমাজ। যে কারণে সাহেবগঞ্জ, বীরভূম, পাকুর রেল লাইন নির্মাণে নিযুক্ত থাকা বহু সাঁওতাল পালাতে চাইলেও সেখান থেকে তাদের মুক্তি নেই। অন্যপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ে অবস্থিত সাঁওতাল গ্রামগুলিতে শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রয়োজন মতো দাদন খাটা মানুষও প্রাপ্য মূল্যও পায় না।

পরতাপ ও জিল্লু যখন মুর্শিদাবাদের পথ ধরেছিল, তখন পীতেমের চিন্তায় বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছিল। সেই সময় শহরের বুকে বেশ কিছু সাঁওতাল যুবক মিছিল করেছিল। যে মিছিলের আগে ছিল একটা মৃত বাঘ। আর তার পিছনে খাটিয়েতে বসেছিল আহত যুবক। তার নাম ডুমকা সোরেন, শিকারী যুবকের শরীরে তীর গোঁজা ছিল। সেই যুবকের পাশে জিল্লু ও পরতাপ ছিল। ধামসা মাদল বাজিয়ে শিকার নৃত্য চলতে থাকে শহরের রাস্তায়। শহরের ব্যবসাদার, মহাজন, দোকানদার থেকে তারা বীরত্বের স্বীকৃতি বাবদ টাকা আদায় করতে থাকে। তারপর বাজিকরের ছাউনিতে ডুমকা সোরেন ও তার পিতা লক্ষ্মণ সোরেনের জন্যে স্বসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পীতেম খুবই খুশি হয়, কারণ জিল্লু ও পরতাপকে সে ফিরে পেয়েছে। সেই সঙ্গে সাঁওতাল প্রৌঢ় লক্ষ্মণের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার খুবই মার্জিত। পীতেমের আত্মমর্যাদাবোধ বিশেষ দামী হয়ে উঠে। দুই জাতির মধ্যে এক মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। জাতিগত দিক থেকে উভয়ই ভিন্ন ধরনের কিন্তু দৈনন্দিনের অভাব অনটন ও আর্থিক দিক থেকে উভয়ের মিল পাওয়া যায়, একেবারে নিম্নশ্রেণি মানুষের দল। এখানে লক্ষ্মণ সোরেনকে যথার্থ সম্মান দেয় পীতেম। তাই পীতেম একসন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানিয়ে লক্ষ্মণ সোরেনকে আপ্যায়ন করে। ভোজন ও পানের বিনিময়ে দুই প্রৌঢ়ের মধ্যে আন্তরিকতা গভীর হয়ে উঠে।

বহু পুরানো কালের বন্ধুর মতো উভয়ের মধ্যে আচরণ লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে তারা নাচ গান উল্লাসে মেতে উঠে। যুবতীরাও সেখানে যোগদান করে। ধামসা, মাদল, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তা যেন বিচিত্ররূপ ধারণ করে। আনন্দ উল্লাসের পর গভীর আলোচনায় দুই বৃদ্ধ মত্ত হয়ে উঠে। অবশ্য পীতেম গেরস্থ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী প্রকাশ করে না। লক্ষ্মণ বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পীতেমকে বোঝাতে থাকে। জঙ্গল কেটে, পাথর কেটে জমি পত্তন হয়েছিল একদা, সেই জমিতে বহু মানুষের বসতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে আগের মতো পরিস্থিতি নেই। জমি তৈরি করলেই মালিকের আগমন ঘটে। অথচ জমিতেই স্থিতি ও স্থায়ীত্ব। জমিতেই জীবন, জমিতেই সুখ, জমি না থাকলে জীবন ব্যর্থ হয়ে উঠে। জমিতে ফসল হওয়ার সময় যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দেই আজীবন কাটানো যায়। কিন্তু এই জীবন পীতেমদের জন্য নয়। তারা ডোম-চণ্ডাল জাতের ভাগীদার। বাজিকরদের নির্দিষ্ট স্থান থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জমি জায়গা সম্পত্তিও থাকে না। তারা ঘুরে ঘুরে জীবনযাপন করে। এটাই তাদের জীবনের ধর্ম ও কর্ম। অথচ সাঁওতালদের কাছে জমিই বেঁচে থাকার একমাত্র মন্ত্র। জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ভাগ গ্রহণ করে জোতদার, জমিদার, পুলিশ, সাহেব, দারোগা, গোলাদার, মহাজন প্রভৃতি প্রভাবশালীর দল। তবুও সাঁওতালরা জমির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। পীতেমের সঙ্গে লক্ষ্মণের এই জমি জায়গার আলোচনায় অনেক সমস্যা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ উঠে আসে। ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্কও গড়ে উঠে। এক সময় দিঘি থানার বহেরা গ্রামের লক্ষ্মণ সোরেন বিদায় গ্রহণ করে বন্ধু পীতেম কাছ থেকে। তার এক মাস পরে ডুমকা সুস্থ হওয়ার পরে লক্ষ্মণ সোরেন বন্ধু পীতেমকে সহরায় পরবে আমন্ত্রণ জানায়। পীতেম কারো কাছ থেকে কোনো দিনও নিমন্ত্রণ পায়নি। গর্বে ও আনন্দে তার বুক উজ্জ্বল হয়। আত্মীয়তার বন্ধন তার কাছে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য। কার্তিক মাসের শেষে পীতেম, সালমা, পরতাম, জিল্লু মিলে দশজন

বাজিকর ঘোড়ায় সওয়ার করে সাঁওতাল গ্রামে প্রবেশ করে। তারা দেখে সাঁওতাল গ্রামের মোড়ে মোড়ে আছে লাল ঝাণ্ডা, ঘণ্টা ও ভাঙ্গাকুলো। মাঠে মাঠে পাকা ধান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল গ্রাম দেখে পীতেম মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়ে উঠে। ঘরবাড়ি নিপুণভাবে নিকানো, উঠোনগুলি ঝকঝকে। সন্ধ্যার সময়ে লক্ষ্মণ সোরেনের ঘরে উপস্থিত হয় পীতেমের পরিবার। সাধারণত রাজকীয় অভ্যর্থনা বাজিকরদের কোনো দিনও মেলে না। আর এখানে সাঁওতাল সমাজের কাছ থেকে আশাতীত ব্যবহার পেয়ে পীতেম যেন এক নতুন জীবন অনুভব করে। সন্ধ্যার পর লক্ষ্মণ সোরেনের স্ত্রী পীথা মুর্মুর কাছ থেকে সহরায় পরবের কথা শোনে সালমা। এই সহরায় পরব কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই পরবে তাদের ঠাকুর ঠাকরানের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয় আতপ চাল, তেল সিঁদুর, দুর্বা ঘাস ইত্যাদি দিয়ে। মারাংবুরু ও অন্যান্য দেবতাকে এদিন পূজা করা হয়। মোরগ ও শূকরও বলি দেওয়া হয় এই পূজায়। পূজাপাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরে তারা নাচ গানে মিলিত হয়। অবশ্য এই পরবের বেশিরভাগ গানগুলিই দুঃখ, বেদনা ও বিষাদমিশ্রিত। এই রকম একটি গানের নিদর্শন-

রাজমহল পাহাড়ে,
গাড়ি চলে লহরে,
চার হালের মোষ বেঁচে
হায়রে, হায়রে,
মরদ গেল শহরে।
হায়রে, হায়রে,-
গোমানীর জল গেল শুকিয়ে।

অথবা –

পারগানার কাছে নালিশ জানালাম,
পারগানা চুপ করে থাকে।
আমার বিচার করে দারোগা,
আমার বিচার করে মহাজন,

আমার বিচার করে
ঘোষা নালার ঘাটোয়াল।
পারগানা চুপ করে থাকে।

অথবা-

পারগানার কাছে আর্জি জানালাম,
হায়রে, হায়রে, মিছাপুর মেলায়,
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য
হায়রে, হায়রে! মিছাপুর মেলায়!
নির্দয় দারোগা, ধূর্ত পেয়াদা,
মনে প্রাণে সুখ নেই,
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপটাপ যায়-
কোমরে পেতলের বেল্ট,
উজ্জ্বল পোশাকে
আমার সুখ নেই।[৮৬]

সহরাই পরবের এই সব গান শুনেই সকলে যেন বিষণ্ণ হয়ে যায়। বস্তুত বাজিকরের দল আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করে খুব সহজেই। সালমাকে সাঁওতালি গানের অর্থ বুঝিয়ে দেয় জিল্লু কিংবা পরতাম। যারা বিগত ছমাস ধরে সাঁওতালদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা সাঁওতাল যুবক যুবতীর নাচের তালে পা মেলায়। গানের টানে হাততালি দিয়ে সালমাও নাচতে থাকে পীথার সঙ্গে। এই উল্লাস আনন্দ খুব দ্রুত সমাপ্ত হয়ে যায়।

সহরায়ের পরে নতুন উৎসব শুরু হয়, ফসল কাটার উৎসব। সারাদিন মাঠের মধ্যে ধান কাটা এবং সেই ধান ঘরে নিয়ে আসা হয়। জিল্লু, পরতাপও এই সব কাজ রপ্ত করে ফেলেছে। নিতান্ত গেরস্থালি কাজকর্মকে এরা সহজেই গ্রহণ করে। বাজিকররা দেখতে পায় বহেরা গ্রামে মহাজন পতিত সাউ-এর দশখানা গাড়ি প্রবেশ করে। অথচ একটা সময়ে তার ছিল তামাক পাতার দোকান। বর্তমানে সে লক্ষ টাকার মালিক। সাঁওতালরা নিজেদের রক্তের

ঘাম ঝরিয়ে জমির ফসল উৎপাদন করে অথচ ভোগ করতে পারে না। সাঁওতাল পরগণায় জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করেছে। সেই সময় কোনো ভাগীদার ছিল না। পাকুরের রাজারা বেশি খাজনা পাবার আশায় তাদের জমিগুলি পত্তনি দেয়। তারপর জমি জরিপের পালা শুরু হয়ে যায়। অশিক্ষিত সাঁওতালরা জমির হিসাব বুঝতে পারত না। এভাবেই শুরু হয় পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজাদার, অশিলদার, পাইক প্রভৃতি জমি জরিপের দল। একই সঙ্গে শুরু হয় খাজনা আদায়ের কাজ। একপ্রকার জোর জুলুম করেই নায়েব, গোমস্তা, দারোগার দল সাঁওতালদের খাজনা আদায় করত। খাজনা না দিলেই মানসম্মান ইজ্জত কিছুই থাকত না। রাজমহলের জংলি জাতি সাঁওতালরা মহাজনের কাছ থেকে পাঁচশলি ধান ঋণ নিলে দেড় বছরে চল্লিশ শলি হয়ে দাঁড়ায়। ধান শোধ দিতে না পারলে বেগার খাটতে হয় বছরের পর বছর। পতিত সাউ, দয়ারাম ভকত, গোরাচাঁদের মতো জমিদারের হিসাব সাঁওতালরা কখনোই বুঝতে পারত না। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও করতে পারত না। লক্ষ্মণ সোরেন ছিল দশটা গ্রামের পারগাণা। সে দেখেছে পাঁচ টাকা কর্জ নিয়ে সারা জীবন ধরে বেগার খাটছে মঙ্গল মুর্মু। দয়ারাম ভকতের কাছে মঙ্গলের ছেলে সুফলও বাঁধা চাকর হয়ে থাকে। লক্ষ্মণের ছেলেরা ও অন্য কয়েকজন মিলে ধান মারছিল, পীথা, কুলোরা ধান পরিষ্কার করছিল, ঠিক তখনই চেতন মাঝির উঠোনে গণ্ডগোলের চিৎকার শোনা যায়। পতিত সাউ ধান ওজন করার সময় সিঁদুর দেওয়া পাথর ব্যবহার করেছিল। ফলত ধানের কারচুপি জিল্লুর চোখে এড়িয়ে যায়নি। এখান থেকেই মূল ঝামেলা সৃষ্টি হয়। পতিত সাউ-এর লাঠিয়ালের দল জিল্লুকে আঘাত করে, যদিও তা গুরুতর নয়। অন্যদিকে মহাজনদের কাছ থেকে সাঁওতালরা যুগ যুগ ধরে ঠকে এসেছে, ফলত সাঁওতালদের মধ্যে চাপা রাগ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তারা এতদিন প্রকাশ করতে পারেনি। জিল্লুই প্রথম মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পাঁচশের বাটখারার বদলে মহাজনরা পাথর ব্যবহার করে। আর এর প্রতিবাদস্বরূপ লক্ষ্মণ সোরেন ক্ষোভ প্রকাশ করে,

পতিত সাউ হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার তিন দিন পরেই বাজিকরের দল বিদায় নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

রাজমহল থেকে ফিরে এসেই পীতেম জানতে পারে আনন্দের সঙ্গে পেমা অন্যত্র পালিয়েছে। গৃহস্থ মানুষদের সুখ দেখেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল পেমা। তারা সুখের সংসার করে। দলত্যাগ পেমার চিন্তায় পীতেম নিজেকে বৃদ্ধ ও অসমর্থ বোধ করে। অর্থ উপার্জনের দিকে জোর দেয়। তখন সে সালমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। লক্ষ্মণের কথা পীতেমের মাথায় ঘুরপাক করতে থাকে। রাজমহল পাহাড়ের গায়ে জলাজীর্ণ জমি মহাজন শ্যামলাল মিশ্রের কাছে পাঁচ বিঘা জমির পত্তন পায় সে। আর এভাবেই জমি পেয়ে বাজিকরদের সত্তা ধীরে ধীরে পালটে যেতে শুরু করে।

অন্যদিকে লক্ষ্মণ সোরেনের হাতকড়া, পায়ে বাঁধা শিকলে রাখা হয় আমগাছির হাটে। এই ঘটনায় সমস্ত সাঁওতাল মানুষ যেন থমকে যায়। সেই হাটে লোকজন কম, দোকানপাট বন্ধ। দারোগা সাহেব বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করে চারিদিকে। তারই মাঝে লক্ষ্মণ সোরেন প্রতিবাদ করতে থাকে। লক্ষণ সোরেন দাদন দিত না। তার কোনো ঋণ ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ব্যক্তি লক্ষ্মণ সোরেন হিসাব জানে। বহেরার বেশ কিছু জমির প্রতি পতিত সাউ এর লোভ ছিল, যা লক্ষণ সোরেনের হাতে ছিল। পতিত সাউ ভালো করেই জানে সাঁওতালরা হলো নিরীহ জাত। উৎসব আনন্দে থাকতে বেশি পছন্দ করে। লড়াই, ঝামেলা এরা খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতাল জাতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন অঞ্চলে। সাঁওতালরা সভা করে এবং এক দারোগা খুনও হয়। সুফল মুর্মুও প্রতিবাদ করে উঠে। সাঁওতালরা বিদ্রোহ শুরু করে চারিদিকে। রাজমহলের পশ্চিমপ্রান্তের ঘাঁটিতে শ্যাম পরগণার অবস্থান। শ্যামের সঙ্গে ডুমকা সোরেন তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সঙ্গে জিল্লু ও পরতাপও দলে মিশে যায়। চেতন মাঝিও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয় এবং মেজর স্টুয়ার্টের

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাঁটাজঙ্গলে সে তার দলবল নিয়ে লড়াই করে। তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে উন্মাদের মতো সাঁওতালরা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে। স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের উপর বন্দুকের গর্জনও বাড়তে থাকে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে মেজর বারোজ যুদ্ধ থেকে বিরতি থাকে। অন্যদিকে সাঁওতালরাও ফিরে আসে আহত শ্যাম পারগাণার কাছে।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে সাঁওতাল বাহিনীর সঙ্গে পরতাপ, বালি, জিল্লু এবং পিয়ারবক্স পাহাড়ের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। লোহার কাজে তাদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে, এই দক্ষতা লড়াই করতে সাহায্য করে। দেখা যায় কামার অস্থায়ী ঠিকানায় তীরের ফলা, বল্লম, তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত রাখে। লোহার অস্ত্র নিয়ে সাঁওতাল সেনাবাহিনীতে বহু লোক যোগদান করে। ফলে পীরপৈতি পাহাড়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং চেতন মাঝিকে উদ্ধার করা হয়। বস্তুত বাজিকরের সহযোগিতায় সাঁওতালদের দল শক্তিশালী হয়ে উঠে। সাঁওতাল বাহিনীর দল জমিদার, মহাজন, জোতদার, পুলিশ, দারোগার থেকে সর্বস্ব ঋণ শোধ করে মুক্তি লাভ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও অত্যাচারে সাঁওতাল সমাজ নির্মম হয়েছিল। কিন্তু একসময় অসীম সাহসিকতায় তারা দলবেঁধে বিদ্রোহ করে সাঁওতাল পরগাণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ দখল করে। তবে ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনী বন্দুক দিয়ে সাঁওতালদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকে। পাহাড় জঙ্গলে বৃষ্টির সময়ে খাদ্যের সংকটে অসহায় সাঁওতালদের উপর হত্যালীলা চলতে থাকে। লক্ষ্মণ সোরেনকেও মহেশপুর থানায় হত্যা করা হয়। একই সঙ্গে সাঁওতাল শিশু, বৃদ্ধ, নারীকেও হত্যা করা হয়। রক্তাক্ত হয়ে উঠে একের পর এক সাঁওতাল গ্রাম।

অন্যপ্রান্তে বহেরা গ্রাম পিয়রসন দখল করে, ফলে ডুমকা সোরেন তিন হাজার সাঁওতাল দিয়ে আক্রমণ করে এবং পিয়রসনসহ পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা করে তারা। কিন্তু ডুমকার মা পীথা মুর্মু সহ আরও চারজন মহিলা আপত্তি জানায় একাজে। কারণ পিয়রসন সাহেব অত্যাচার

করেনি। বরং গ্রামের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিয়েছিল। পীথা তার ছেলেকে মানা করেছিল কিন্তু মায়ের নির্দেশ শোনেনি। বদলা হিসাবে ডুমকা তার দলবল নিয়ে পিয়রসনকে হত্যা করে। এই ঘটনাই বহু সাঁওতালের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সাঁওতালদের নিয়মকানুন, রীতিনীতি ডুমকারদল মানতে চায়নি। গ্রামের মানুষ হত্যাদৃশ্য স্বচক্ষে দেখে। ফলত, পীথা আহত, অপমানিত ক্রুদ্ধ হয়ে ডুমকাকে গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অনুসারে ডুমকার দলবল পাহাড়ের উপরে চলে যায়। সেখানেই ইংরেজবাহিনীর গুলিতে ডুমকাসহ পঞ্চাশ-ষাটজন সাঁওতাল মারা যায়। ডুমকার মৃত্যুর পরে বহেরা গ্রামে ডুমকার মা ও তিনজন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে হত্যা করা হয়। অপর দিকে সংগ্রামপুরে সিধু ও কানু মুর্মুর বিশাল সংগ্রাম ঘটে। যুদ্ধ হওয়ার পরে কৌশলে ইংরেজ সরকার জঙ্গলের মধ্যে সিধু ও কানুকে আক্রমণ করে। এখানে দুই মহান নায়কের মৃত্যু হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতাল ও বাজিকর জাতি মালদা জেলাতে বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে বেশ কিছু দিন হওয়ার পর পীতেম ও সালমার বিচ্ছেদ হয়। পীতেম জামিলাবাদে থাকে, সেখানেই জমির বন্দোবস্ত করতে থাকে। গ্রামের দু'ক্রোশ দূরে উত্তরের দিকে সাঁওতাল গ্রাম নমনকুড়ি। সেই গ্রামে থাকে পনেরো–বিশটির ঘর পরিবার। এই গ্রামের মোড়ল হাড়মা ও গান্দু। গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল, সাপের ভয়ে অনেকে জঙ্গলে প্রবেশ করে না। বর্ষাকালে টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর জল বিপদ সীমায় পৌঁছায়। জলাজমিতে সাঁওতাল ও ওঁরাওদের পরামর্শে ও উৎসাহে পীতেম নতুন ভিটা নির্মাণ করে। আর এভাবেই শুরু হয় বাজিকরদের কৃষি সভ্যতা। সেই সঙ্গে বাজিকররা পশুপালনের কাজও সমানে করতে থাকে। নমনকুড়িতে বর্ষার বানভাসি ঘটেনি। অনেকেই বিশ্বাস করে পীতেম বুড়ো যাদু বিদ্যা জানত। নদী, বান, বৃষ্টিকে পীতেম বশ করে রাখত। অথচ এই অঞ্চলে বাজিকররা শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। ধর্ষক দোদনের অত্যাচারে জামিলাবাদ, হিঙ্গল, নমনকুড়ির মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে

উঠে। বাজিকর বসতির চৌদ্দ বছরের লুবিনির প্রতি তার লোভ। দোদন পরতাপের ঘরে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করেছিল। তারপরে সে সাঁওতাল গ্রাম আক্রমণ করে। দোদন সাঁওতাল নারীদের পছন্দ-অপছন্দের খবর গোপনে গোপনে রাখত। তার দ্বারায় হিঙ্গল ও জামিলাবাদে বহু নারী ধর্ষিত হয়। বস্তুত সাঁওতালরা সাবধান ও সচেতন হয়ে উঠে। তাই জামিলাবাদের আমবাগানে হাড়মার বউ দুর্গির প্রতি দোদনের আক্রমণ। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে হাড়মা। জামিলাবাদের আমবাগানে দুর্গির টোপে দোদন ধরা দেয় হাড়মার কাছে। আর সেখানেই হাড়মা দোদনকে খুন করে।

অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের মূল বিষয় বাজিকরের জীবন যাত্রা ও জীবনচেতনা হলেও বাজিকরের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক স্থাপনের চিত্র পাওয়া যায়। আন্দোলন ও লড়াইয়ের সময়ে সাঁওতালরা বহুবার ছন্নছাড়া হয়েছে, সহজ সরল জীবন উদ্বাস্ত জীবনে পরিণত হয়। সাঁওতালরা বনজঙ্গলে কেটে জমি তৈরি করে। যে জমির সঙ্গে তাদের হার্দিক সম্পর্ক রয়েছে। সাঁওতাল সমাজের পারগাণা লক্ষ্মণ সোরেনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কারণ লক্ষ্মণ সোরেনের কাছ থেকে বাজিকর জাতি বহু কিছু শিখতে পেরেছিল। বিশেষ করে জমি হাসিলের কাজ। জমি চাষ করার প্রণালী ও পদ্ধতি বাজিকররা প্রথম সাঁওতালদের কাছ থেকে শেখে। জামিলাবাদেও লক্ষ্মণের আদব কায়দায় পীতেম জমিবন্দোবস্ত করে। জমিতে কীভাবে চাষ করতে হয় লক্ষ্মণের কাছ থেকে পরতাপ জেনেছিল। সে কারণেই জামিলাবাদে পরতাপের ধানের ফলন দেখে বহু সাঁওতাল হতচকিত হয়। পরতাম বারে বারে লক্ষ্মণ সোরেনের অভাব অনুভব করে- 'পীতেম লক্ষ করে পরতাপের ভিতরে সেই বিচিত্র নেশার জন্ম হয়েছে, যার কথা লক্ষ্মণ সোরেন তাকে বলেছিল। ধানের গাছ যখন গামর হয়, কলার গাছে যখন মোচা আসে, সবজিতে যখন ফুল আসে, পীতেম লক্ষ করে পরতাপের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে যায়, যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে সে।'[৮৭] লক্ষ্মণ সোরেনের দেখিয়ে

দেওয়া পথেই বাজিকরের জীবন অতিবাহিত হয়। বাজিকরের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন আসে।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন কথাকার মানব চক্রবর্তী, তাঁর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন'(১৯৯৪) উপন্যাসে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সাঁওতাল সমাজের অবস্থান কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে, তারই বৃত্তান্ত এই আখ্যানে উন্মোচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এক ভূখণ্ডে অবস্থিত মানুষের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য তাদের শরীর স্বাস্থ্যে নানা রোগ এবং খাদ্য সংকটে তাদের দিন হাহাকারে কাটে। অর্থাৎ অর্থের অভাবে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে। আর এই ধরনের মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করে চলেছে গান্ধী আশ্রমের শাখা 'বদলাও ফাউন্ডেশন'। আসলে মানব চক্রবর্তী এই উপন্যাসের কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র ও সময়কাল নির্মাণ করেছেন গান্ধীবাদী দর্শনের নিরিখে।

উপন্যাসের শুরুতেই 'বদলাও ফাউন্ডেশন' পরিচালিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বদলাও ফাউন্ডেশনে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলফেট তুতুরি, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তার সঙ্গে কাজ করে সাঁওতাল নারী বিটিয়া মুর্মু, এই উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র। তাদের সঙ্গে ভাণ্ডারী-কমপাউণ্ডার-কাম-ড্রেসার থাকে, তারা একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ গরিব মানুষকে সেবা করে। সঙ্গে ড. সিদ্ধার্থ শর্মা মাত্র একশো টাকার বিনিময়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাঁওতালদের চিকিৎসা করান। কোনো ওষুধ-পত্র শেষ হলে 'বদলাও ফাউন্ডেশনে'র সেক্রেটারি বজরঙ্গ সিংহকে রিপোর্ট দিতে হয়। গ্রামেগঞ্জে টি.বি রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। অশিক্ষিত মানুষ 'বুকের ব্যামো'কে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, অথচ এই রোগের চিকিৎসার জন্য ভালোরকম খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হয়। যা গরিব মানুষ কখনই পায় না। কিন্তু ওষুধ পাওয়া যায় সিস্টার সুজাতা 'দিদি'র কাছ থেকে। সেবামূলক কাজে সে সমস্ত

মানুষজনকে আহ্ববান করে। সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিনা-পয়সায় ওষুধ দেওয়া হয়। 'বদলাও ফাউন্ডেশন'-এর এ্যাম্বুলেন্স একটা ঘরের পাশে রাখা হয়। গোবর-মাটিতে নিকানো পরিষ্কার ঘরের ভিতরে ছোট টেবিল ও চেয়ার রাখা হয়। সেখানেই ডাক্তার গ্রামগঞ্জের রোগী দেখেন। গ্রামের মানুষগুলি একরাশ আশা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে ডাক্তারের সেবা যত্নের তাগিদে। অনাহার-অনটনে দিনযাপন মানুষগুলোর স্বপ্ন কতটা সত্য হবে তা তারা জানে না কিন্তু দীনতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের চেহারায়। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই, সেখানে গ্রামের মানুষ দুঃখে কষ্টে বেঁচে থাকে। স্বাধীনতা ছেচল্লিশ বছর পরেও বহু গ্রামে জল, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এমনকি চাষযোগ্য জমির অভাব এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের। যার ফলে বহু মানুষ বিষ খেয়ে মরে যায় কিংবা ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

গান্ধী আশ্রম পরিচালনা করে বীণা সরকার। বস্তুত গান্ধী আশ্রমের সাহায্যে 'বদলাও ফাউন্ডেশন' চলে। বিশ-পঁচিশ গ্রাম থেকে লোকজন এসে গান্ধী আশ্রমে ভিড় করে থাকত এক সময়। বীণা সরকারকে এই কাজে আসার জন্যে অনুরোধ করেছিল ক্ষুদিরাম। আর সেই দিন থেকেই বীণা সরকার এই আশ্রমে রয়েছে। তবে গান্ধী আশ্রমের পূর্ব নাম হলো 'রামকৃষ্ণ শিক্ষাশ্রম'। দলিত মানুষদের বেঁচে থাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল 'রামকৃষ্ণ শিক্ষাশ্রম'। বর্তমানে তার নাম 'বদলাও ফাউন্ডেশন' হয়। এদের সেবামূলক কাজকে হিংসা করে ঝাড়খণ্ড পার্টির লোক। উল্লেখ্য ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র নির্মিত হয়েছে। শুধুমাত্র চরিত্র নয়, উপন্যাসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, তা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন বনাম গান্ধীবাদ।

বাদলাও ফাউণ্ডেশনের পরিচালক বীণা সরকারের ঘনিষ্ঠ মানুষ আলফেট তুতুরি। তাই বীণার কাছে তুতুরি অভিযোগ জানায় যে পার্টির লোকের কাছে সে অত্যাচারিত হয়েছে। গান্ধী

আশ্রমের প্রতি ঝাড়খণ্ড পার্টির লোকের ক্ষোভ বহু দিনের। আর সেই ক্ষোভ থেকে তারা মহিলা সভা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। অবশ্য বীণা সরকার পার্টির লোকের কোনো ক্ষতি করেনি। তবুও তার উপরে পার্টির লোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। মূলত বজরঙ্গ সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে পুনর্বাসনের জন্য, তার ফলে প্রতি পরিবার আট হাজার করে অনুদান পেয়েছিল। সেই সঙ্গে সরকার থেকেও ছাগল, কাঁড়া ও জমি দেওয়া হয়। ফলত আনন্দে সবাই আশ্রমে ভিড় করত। কিন্তু এখন সেই সব দিন অতীত। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড পার্টির লোকও বর্তমানে গান্ধী আশ্রমকে বিরোধী দল হিসাবে দেখে এবং তাদের কার্যকলাপকে বিরোধিতা করে।

উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় শিউলিবাড়ি ও ক্যাওটাজালির মধ্যে একটা কালভেট অবস্থিত, যে কালভেটের পিছনে সরকারের খরচ হয়েছে বহু কোটি টাকা। আসলে এভাবেই গ্রামের টাকাগুলো রাজনীতির নেতারা আত্মসাৎ করে। অথচ সেই গ্রামে বিদ্যুৎ, জল, রাস্তা, পাকাবাড়ি নেই। পাহাড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে গ্রামের ঠিকানা। যেখানে কোনও রকম সুযোগ সুবিধা নেই। এধরনের গ্রাম ও গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে গান্ধী আশ্রম। তাদের অনুপ্রেরণায় ‘গ্রাম-বিকাশ আন্দোলন, ‘জাগৃতি কর্মসূচী’র ক্রিয়াকর্ম আয়োজন করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন জরুরী অবস্থা চরম অবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে, তখন জয়প্রকাশ নারায়ণের ‘সর্বাত্মক আন্দোলনে’ যুবক সমাজ যোগদান করেছিল। যুবক সমাজের সহযোগিতাতেই ‘বদলাও ফাউন্ডেশন’ গঠিত হয়েছিল। সেই রকম আর এক যুবকের নাম বজরঙ্গ সিংহ। তিনি বিহারের পিছিয়ে থাকা গরিব আদিবাসীদের জন্যে নিজের জীবন গেঁথে দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে গান্ধী আশ্রমের আদর্শ ও কাজকর্মকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বজরঙ্গ সিংহের চেষ্টায় সমাজের সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মনে ‘বদলাও’ আসে।

আদিবাসীরা জেগে উঠে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন হতে থাকে। শিক্ষা, স্বাধিকার সম্পর্কে আদিবাসীদের মনে প্রশ্ন জাগে।

ঔপন্যাসিক মানব চক্রবর্তী গান্ধী আশ্রমের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ঝাড়খণ্ড পার্টির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সুনীল মারাণ্ডি ঝাড়খণ্ড পার্টির লিডার। সে তার বিরোধী দল বদলাও ফাউন্ডেশনের খোঁজ খবর রাখে। প্রতি বছর 'বদলাও ফাউন্ডেশনে' কোটি কোটি টাকা আসে। সেই টাকা ভাগ না পাওয়ার কারণেই এই ফাউন্ডেশনের উপর ঝাড়খণ্ড পার্টির লোকের রাগ-হিংসা। রাজনৈতিক যড়যন্ত্রে ক্যাওটজালির সোরাই মুর্মু 'বদলাও ফাউন্ডেশন' এর সামনে চিৎকার করতে থাকে এবং সে গ্রামের লোককে জড় করে। বস্তুত এই সোরাই মুর্মুর বোন বেটিয়া ক্লিনিকে কাজ করে আর এটাই সে মেনে নিতে পারে না। অন্যদিকে বীণা সরকার নতুন করে কর্মসূচী ঠিক করে। গ্রামে গ্রামে আরও ক্লিনিক খোলার চেষ্টা করা হয়। সেই সঙ্গে মেয়েদের জাগরণ করার একটা বড় লক্ষণও তৈরি করা হয়। আর সেই লক্ষ্যেই মেয়েরা একটা সম্মিলিত সমিতি গঠন করে। এখানেই সোরাই মুর্মুর প্রশ্ন- 'বদলাও ফাউন্ডেশন' এর লোক বাইরে থেকে এসে এখানে কিসের ক্লিনিক খুলেছে? একই সঙ্গে সে প্রমাণ করতে চায় বাইরের লোক এখানে এসে সমস্ত সাঁওতাল মেয়েদের ধর্ম-ইজ্জত নষ্ট করে দিচ্ছে। এমনকি সোরাই মুর্মু বীণা সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দেয়। অথচ বীণা সরকার কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই ধরনের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় বীণা সরকার অহিংস আন্দোলনের প্রতীক চরিত্র।

বীণা সরকারের অনুপ্রেরণায় মহিলা সভা-সমিতি দিন দিন বাড়তে থাকে। তারা একটা বদল চায়। তাদের কোনো রাজনৈতিক দাবি নেই, কিন্তু তাদের সামাজিক দাবি রয়েছে। গান্ধীজীর 'গ্রাম-জাগরণ'-এর ব্রতকে সামনে রেখে মহিলা সংগঠন নিজেদের অধিকারের জন্যে, ভাষার জন্যে, অশিক্ষা, কুসংস্কার, নেশার বিরুদ্ধে ও অন্ধকারে থাকা মহিলাদেরকে আলোয় ফেরানোর লড়াই করে। বস্তুত নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে নারী-পুরুষ -এর মধ্যে

বৈষম্য দূর হয় না। তাই অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা স্বাধীনভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে মহিলা সংগঠনরা প্রচার করে। যাকে বলে নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা।

নারী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার ভেসে উঠে সাঁওতাল সমাজে। যার ফলে ঝাড়খণ্ড পার্টির লোক চিন্তিত। তারা গান্ধী আশ্রমের যাবতীয় সমিতিকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। গান্ধী আশ্রমের সামনে ঝাড়খণ্ড পার্টির দালাল সুহাগ চিৎকার করে। মহম্মদ সামীম তাকে সরিয়ে দেয়, আরও উত্তেজনা বাড়ে। সুহাগ টুডুর দলবল তুতুরিকে মারধর করে। ততক্ষণে ক্ষুদিরাম, বীণা সরকার ও বজরঙ্গ এসে উপস্থিত হয়। পলাশীর মতে, গান্ধী আশ্রমে থাকলে মার খেতে হয়, তাই মার খাওয়ার বদলে মার দিতে হয়। ছোটবেলা থেকেই গান্ধী আশ্রমে থেকেছে তুতুরি। এখন আর সে গান্ধী আশ্রমে যায় না, নিজে দিন মজুরি খাটে, সেখান থেকে উপার্জন করে সংসার চালায়। তবে তুতুরির কাছে মা বলতে মাটি আর গান্ধী আশ্রম। কারণ, তুতুরি যখন খুব ছোট ছিল, তখন সাঁওতাল মেয়েদের উপর পুলিশবাহিনী খুব অত্যাচার করত। রাতের সময়ে স্টেশনের চত্বরে তার বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছিল। সেই রাতে মা- এর উপরে পুলিশের টার্গেট ছিল। কিন্তু তুতুরির মা পুলিশি জাল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ মা-কে গুলি করে মারে। তখন অসহায় তুতুরির বাবা কিছুই করতে পারেনি। মা এর ছিন্নভিন্ন দেহ তিন টুকরো হয়ে পড়ে থাকে। সেই সমস্ত ভয়াবহ ঘটনা তুতুরির এখনও মনে রয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকেই সে গান্ধী আশ্রমে থেকেছে। গান্ধী আশ্রমে বহু বছর থাকার পরে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে সমাজের বাস্তব চিত্র। যে বাস্তব চিত্রে দেখা যায় জল নেই, চাষের জমি নেই, মানুষের শরীরে শক্তি নেই- প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সে আশ্রমের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে। এই সমস্ত কথা শুনে ক্ষুদিরাম সেনগুপ্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সে গান্ধীজীর ইতিহাস বর্ণনা করতে থাকে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে হাজার হাজার সাঁওতাল যোগদান করেছিল। ১৯২০ সালে গান্ধীজী রাঁচি শহরে এসে

আদিবাসীদের বরণ করেছিলেন। তারাও অহিংস আন্দোলনে যোগদান করে। ১৯৩০ সালে আদিবাসীরা 'চৌকিদারি ট্যাক্স' দেওয়া বন্ধ করেছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে দামিন-ই-কোহ' অঞ্চলে ভীল, কোল, গন্দ সমাজও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৪২ সালে একটি আদিবাসী মহিলা সভা হয়েছিল। যার মাধ্যমে আদিবাসী মহিলা সমাজ জেগে উঠেছিল। আবার সেই বছরের ২৭শে আগস্ট আদিবাসীরা ধ্বংস করেছিল সিলিংগি বাংলো ও ফরেস্ট। মঙ্গল দারোগা অস্ত্রসজ্জিত আদিবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই সময় এবং দারোগা সাহেবের অকথ্য অত্যাচারের সামনে পড়েছিল আসিবাসীরা, যার ফলে শ্রীদুর্গা টুডু মারা যায় ও বন্দি হয় পাহাড়িয়ারা। অবশ্য এখানে সংগ্রাম মুর্মু, চরণ মুর্মু, নয়ন হাঁসদা প্রত্যেক সচেতন সাঁওতাল নেতারাও আহত হয়। ব্রিটিশ ফৌজ গোড্ডা, দুমকা, পাকুড় আর রাজমহল জুড়ে তীব্র অত্যাচার করে এই সময় পর্বে। এমনকি ব্রিটিশ ফৌজ আদিবাসী মেয়েদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার করে লাগাতার। পলাশীতে আদিবাসীরা যখন আন্দোলন করে, তখন ব্রিটিশ সেনার আক্রমণে মুড়মা মুর্মু, কুশ পাহাড়িয়া ও ডমান টুডু আহত হয়। এদের ছাড়াও বহু মানুষের মৃত্যু হয়।

আদিবাসী কল্যাণের ব্রত, মুর্গাডির সভা পণ্ড করে দেওয়া, কাপ্তান হাঁসদার মিটিং- এ বহু লোক ভিড় করা, আর নিজেদের সভায় দুশো-তিনশো লোক হয়- ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তোলে তুতুরি। ক্ষুদিরাম সেনগুপ্তের পাল্টা বক্তব্য –'মানুষকে তৈরী না করে কোনো আন্দোলনেই সাফল্য পাওয়া যায় না। মানুষ তৈরীর জন্য সময় লাগে। অভাবী মানুষকে তাতানো সোজা। যার কিছু নেই তাকে অঢেল-টাকা-মানুষের দিকে সহজেই ক্ষেপিয়ে তোলা যায়- কিন্তু এতে করে সঠিক শত্রু চেনানো যায় না। শত্রু চিনতে হলে আগে নিজেকে জানতে হয়, চিনতে হয়। নিজেকে তৈরী করতে হয়।'[৮৮] অন্যান্য দাবি-দাওয়ার মতোই অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়েও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতারা সাধারণ মানুষদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বহু বছর পরেও সাঁওতাল তথা আদিবাসী সমাজ কিছুই পায়নি। আর সেই সময় তাদের পাশে

দাঁড়ায় গান্ধী আশ্রম। তাই গান্ধী আশ্রম কখনই সাঁওতালদের শত্রু হতে পারে না- ‘আমরা তো সাঁওতালদের শত্রু নই। আমরা নিঃশব্দে সেবা করতে চাই। আমাদের সীমিত ক্ষমতায় মুখ বুজে কাজ করতে চাই। মানুষকে সুশিক্ষার আলো দিতে চাই। সাধ্যমত কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই। হয়ত এ কারণেই আমাদের পছন্দ করে না ঝাড়খণ্ডীরা।’[৮৯] অথচ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতারা তাদেরকে শত্রু ভাবে, তার কারণ তাদের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ।

বিটিয়ার সঙ্গে তুতুরির প্রেম সম্পর্ক রয়েছে এবং উভয়েই ‘বদলাও ফাউন্ডেশনে’ কাজ করে। সেই কারণেই সোরাই মুর্মু নিজের বোন বিটিয়াকে প্রচণ্ড অত্যাচার করে। এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তুতুরি রেগে গিয়ে একদিন অন্ধকার রাতে বিটিয়াকে সোরাই-এর ঘর থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে সোরাই মুর্মুর দল বিটিয়াকে খুঁজে না পেয়ে নিজেদের ক্ষমতায় তুতুরির বাবা পিয়লকে তারা একঘরে করে। সেই সঙ্গে পিয়লের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সোরাই-এর দলবল। আর সেই আগুনে পিয়ল ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। পলাশীর কাছে তুতুরি আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানেই জানতে পারে বাবার ঘটনা। সে তখন চিৎকার করতে করতে ছুঁটে আসে বাবার কাছে। তুতুরি দেখে বাবার হাড়খানি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার পৌঁছানোর পূর্বে। তুতুরির স্বপ্ন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। সে গ্রামের মাতব্বরের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। তুতুরি বাড়ির উঠোনেই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিশোধ নেওয়ার আশায়।

মানব চক্রবর্তী তাঁর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’ উপন্যাসে যেমনভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, লড়াই, দলাদলির ঘটনা দেখিয়েছেন, তেমনি সাঁওতাল সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির বৈচিত্রও তুলে ধরেছেন। আর সেই সূত্রেই তিনি সাঁওতালি গানের অনুসন্ধান করাটা খুবই জরুরি মনে করেছেন। তাই তিনি গানের মাধ্যমে সাঁওতালদের আদিকাহিনি প্রকাশ করেছেন-

আকাশে উইড়তে ছিল হাঁসা-হাঁসিরে
লিচেতে সাগর শুধু জমিন কুথা রে...
তখন আন্ধার কেবল।
মারাং বুরু ভুঁই দিলেক, বিন্না ঘাসের জংলা
হুই ঠেনেতে হাঁসাহাঁসি দুটা ডিম দিলেক রে...
তখন বিহান হঁইল।
ডিম ফুইট্যে জনম লিলেক পিলচু হড়ম পিলচু বুড়ি
ঘাসের বীজ খেইয়ে জবান হইল ছোঁড়া-ছুঁড়ি...
মোদের পেথ্থম খেরওয়ারি।
সিং চান্দো (সূর্য) বিহান দিলেক, নিন্দ্ চান্দো (চন্দ্র) সাঁঝ
মাড়ি খেইয়ে হাঁড়ি খেইয়ে শরীল পুড়ায় ঝাঁঝ...
ইবারে ঘাপাং খেলা।
পিলচু হড়ম পিলচু বুড়ি লাজ পুড়ালে
সাত বেটা সাত বিটির জনম দিলেক রে...
শুরু দুখের দিন।
জবনা হঁইয়ে চিনতে লারে ভাই-বুনেরে
জোড়ে জোড়ে সিঁধাই গেলেক সাঁঝের আন্ধারে...
কইরলব 'সহায় বপলা',
জোট্ বাইন্ধ্যে ঘর বাঁইধলেক 'হিহিরি-পিপিরি
দামিন-ই-কোহ্ বশ করাই নাচে খেরওয়ারি...
মাদলে বোল্ বাজা ঘিজিং ঘিনা...ধিকা ধিন ঘিজিং ঘিনা... [৯০]

আদিবাসীদের পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের বৃত্তান্তে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির জন্মের কাহিনি পাওয়া যায়। তাদের এই কাহিনির মধ্যে সাত ছেলে ও সাত মেয়ের জন্মের চিত্রও উঠে এসেছে। আর এভাবেই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। পিলচু হাড়ামের সাত ছেলে কর্তৃক সাতটি গোষ্ঠীর পত্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১) হাঁসদা, ২) মুর্মু, ৩) কিস্কু, ৪) হেমব্রম, ৫) মার্ডি, ৬) সোরেন, ৭) টুডু। পরে আরও পাঁচটি গোত্র যুক্ত হয়- ৮) বাস্কে, ৯) বেস্‌রা, ১০) পাউরিয়া, ১১) চোঁড়ে, ১২) বেদিয়া। লোককাহিনি অনুসারে সাঁওতালদের আদি

নিবাস ছিল হিহিড়ি। তবে স্থানটি যথার্থভাবে কোথায় রয়েছে তা নিয়ে নানা মুণির নানা মত পাওয়া যায়। সম্ভবত এটি হিহিড়ি-পিপিড়ি ও হাজারিবাগ জেলার আহুরি পরগণা। কারণ এটা সত্য যে, এই জেলারই চাই ও চম্পা নামক স্থানে প্রাচীনকালে সাঁওতালদের বৃহৎ উপনিবেশ ছিল। আদিতে সাঁওতালরা 'খেরওয়াল' নামে পরিচিত ছিল। হিহিড়ি কিংবা আহিড়ি-পিপিড়িতে সাঁওতালরা স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি। লোকশ্রুতি অনুসারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে সাঁওতালরা হিহিড়ি-পিপিড়ি ছেড়ে 'হারাতে' পাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়। 'হারাতে' পাহাড়েই এক সপ্তাহ ধরে 'সেঙ্গেল হয়দাঃ' বা আগুন বৃষ্টি হয়। মনে করা হয় সেখানেই সাঁওতালজাতি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি বেঁচে ছিল। পরে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির থেকেই নতুন করে সাঁওতালদের উৎপত্তি হয়। ধ্বংসের কারণ হিসাবে বলা হয়, সাঁওতালরা অত্যাধিক উচ্ছৃঙ্খল ও অধার্মিক হয়ে পড়েছিল। সে কারণে সর্বশক্তিমান দেবতা সপ্তাহব্যাপী ঐ আগুনঝড়ের প্রলয় সৃষ্টি করেন। সাঁওতালরা ঐ আগুনঝড়ের প্রলয়কে, 'সেঙ্গেল-হয়দা' বা 'যুগ-সেঙ্গেল' বলে অভিহিত করেছে।[৬১] সাঁওতালরা এই সৃষ্টিতত্ত্বের লোককাহিনি শ্রুতি-পরম্পরায় আজও রক্ষা করে চলেছে। আর সেই পরম্পরাই লিখিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে।

সাঁওতালদের জন্ম ও মৃত্যুর সংস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাঁওতালদের জন্ম সংস্কারকে বলা হয় 'জানাম ছাটিয়ার' বা শুদ্ধিকরণ। এই উপন্যাসে 'জানাম ছাটিয়ার' অনুষ্ঠানের এই নামটি ব্যবহৃত হয়নি, 'নিমদাক-মন্ডি' ব্যবহৃত হয়েছে। সন্তান জন্মগ্রহণের পর তৃতীয়, পঞ্চম, অথবা নবম দিনের অনুষ্ঠানের নাম নিমদাক-মন্ডি। এই অনুষ্ঠানে গ্রামীণ আয়া, যার হাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে খুব গুরুত্ব পায়। গ্রামের নাপিত সর্বসমক্ষে নবজাত পুত্রের কেশ মুণ্ডন করে। পুত্রের নাম বাবা-মা, দাদু-দিদারাই ঠিক করে। তারপর তা গ্রামের লোককে জানানো হয়। আয়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোহার করে নবজাত পুত্রের নাম জানিয়ে দেয়। এই উপলক্ষ্যে চাল আটা ও

মকাই গুঁড়োর সঙ্গে নিমপাতা মিশিয়ে একরকম পানীয় তৈরি করে খাওয়া হয় এবং সকলকে ‘চুকুউ-পিঠা’ বিতরণ করা হয়। পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বাড়ির লোককে পুরস্কারস্বরূপ দিতে হয় বত্রিশ কিলো ধান, কন্যা সন্তান হলে ষোলো কিলো ধান।

ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব লাভের মতোই সাঁওতাল সমাজের এক এবং অতি মহত্ত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো ‘চাচো ছঠিয়ার’। নিমদাক-মন্ডি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলেই ‘চাচো ছঠিয়ার’ মধ্য দিয়ে নবজাতকের সাঁওতালত্ব প্রমাণিত হয়। চাচো-ছঠিয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। তবে ‘চাচো ছঠিয়ার’ না হলে সামাজিক মতে বিয়ে হয় না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি চাচো-ছঠিয়ারের পূর্বে মৃত্যু ঘটে, তাকে অবশ্যই কবর দেওয়া হয়, দাহ করা হয় না। সেই জন্য একাধিক ছেলে থাকলে খরচ কমানোর জন্যে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাদের ‘চাচো ছঠিয়ার’ সম্পন্ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের মাঝি হাড়াম, জগমাঝি, নায়কে, গোডেত এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে যথাসাধ্য খাওয়ানো হয়, তারপর নাচগান হয়। ‘চাচো ছঠিয়ার’ হওয়া সাঁওতালের যদি মৃত্যু হয় তাহলে তার দেহ চিতায় দাহ করা হয় এবং একটি হাড়ের টুকরো লাল কাপড়ে বেঁধে আনা হয়। পরে তা নদীর জলে বিসর্জিত হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস, এতে আত্মার অশুভ শক্তি চিরকালের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। উল্লেখ্য, ‘চাচো ছঠিয়ার’ না হলে দাহ করার কোনও বিধান নেই। আজকাল অভাব ও কাঠের আকালের জন্যে দাহ করা হয় না, তবে প্রাচীনকাল থেকেই দাহ করার প্রথা চালু রয়েছে।[৯২]

‘সহরাই’ সাঁওতালদের একটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ উৎসব। চলতি কথায় এ উৎসবের নাম ‘বাদ্‌না’ বা ‘বাধ্‌না’। ‘বাধ্‌না’ শব্দের অর্থ হলো ‘বন্ধন’। প্রেমপ্রীতি ও সম্পর্কের অটুট বন্ধন তাদের এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে। এই উৎসবের নির্দিষ্ট সময় নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে হয়। সাধারণত এই উৎসব কালীপূজা থেকে আরম্ভ করে মাঘ মাস পর্যন্ত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সাঁওতালদের আত্মীয়-স্বজনরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে মিলিত হয়। মানব

চক্রবর্তী তাঁর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে বাধ্না বা সহরাই এর প্রচলিত সাঁওতালি লোককথার উল্লেখ করেছেন। সেই লোককথা হলো এরকম- প্রাচীনকালে এক রাজা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর সাপকে হত্যা করে। সাপটি ছিল রানীর সর্পপতি। রানী জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সাপের একখণ্ড হাড় সংগ্রহ করে রাজার বাগানে পুঁতে রাখে। সেখান থেকে কিছুদিন পর নতুন একটা গাছ জন্মায়। গাছটি বড় হলে তাতে সুন্দর ফুল ফুটে। যে ফুলটি সুন্দর ও সুগন্ধময়। তখন ফুলের নাম কে বেশি জানে– তা নিয়ে তর্ক শুরু হয় রাজা ও রানীর মধ্যে। শেষ অবধি বাজিতে শর্ত রাখা হয়, যে পরাজিত হবে তার মৃত্যু হবে। রানীর প্রশ্নের জবাবে রাজা সব ফুলের নাম বললেও একটিমাত্র ফুলের নাম বলতে পারেনি। সুতরাং শর্তানুসারে রানীর আদেশে রাজার মৃত্যু দিন ঠিক হয়। মৃত্যুর খবর রাজার একমাত্র বোনের কানে পৌঁছায়। দুশ্চিন্তায় কাতর বোন যখন তার ভাইকে বাঁচানোর উপায় চিন্তা করে তখনই গভীর রাতে সে এক শকুন ও শকুনির আলোচনা শুনতে পায়। শকুন তার স্ত্রীকে ফুলের নাম বলে দেয় 'কারোনাগিন হার বাহা'। রাজার বোন প্রত্যুষে মৃত্যুদণ্ডের ঠিক আগে অকুস্থলে পৌঁছে রাজার কানে ফুলটির নাম জানিয়ে দেয়। রাজা ফুলটির সঠিক নাম বলে দিয়ে মুক্তি পায়। তারপর রানীকে শত্রু ভেবে রাজা তাকে হত্যা করে। অর্থাৎ এখানে বোন ভাইকে রক্ষা করে, আর তারপর থেকেই ভাই-বোনের ভালোবাসার বন্ধনের জন্য বাদ্না পরব হয়।[৯৩]

এই উপন্যাসে দেখা যায় দুই নিম্নশ্রেণির মানুষ একে অপরের আনন্দে অংশগ্রহণ করে। তালবেড়িয়ার দুটো পাড়া ভুঁইয়াপাড়া ও সাঁওতালপাড়া। এদের মধ্যে জাত-পাতের ব্যাপার নেই। সাঁওতালদের বাঁধনা পরবে ভুঁইয়ারা অংশগ্রহণ করে। সাঁওতালদের 'সহরাই' বা 'সরজাম বাহা হো' লাগলে ভুঁইয়াদের আনন্দ যেন থেমে থাকে না। আবার ভুঁইয়াদের মনসাপূজার দিনে সাঁওতালদের ঘরে ঘরে আনন্দ-ফূর্তি চলে।

সাঁওতাল সমাজের বাহা পরবের গান এই উপন্যাসে চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। বাহা গানের মধ্যে সাঁওতাল জীবনের শিকড়কে মজবুত করে তুলেছে আখ্যানের বিশেষ অংশে। বেশ কিছু বাহাগানের উল্লেখ পাওয়া যায় -

এ মারসাল ডাহার রেন আয়ুরিঃ
নঙ্গড়ে দ একেন ঞুত্ কাড়াং কাড়াং
নঙ্গড়ে দ আলোম তিঙ্গোনা
লাহা সেঃত্ তড়াম ইদি মেঁ
বুরু-নাঈ পার্ম ইদি মেঁ
আমা কাটা ধাপ ঞেঁলতে আলে লে পাঞ্জা মিয়াঁ
আমা আরসালতে আলে লে মার সালো আঃ।[৯৪]

'হড়-দর্পণ' পত্রিকাতেও বাহা গান বড় বড় কালো অক্ষরে ছাপানো হয়-

এ ফুল দেলা ফুল
রেলগাডিরে ফেজঃক ফুল
ডুমকা জিলা ঞেল,
রেলগাডিরে বাঞ দেজঃক
ডুমকা জিলা বাঞ ঞেল
ডুমকা জিলা হড় দরে হালে ডালে।[৯৫]

বাহা পরবের গানগুলি খুব মিষ্টি হয়। এই গানগুলি বাহা উৎসবে গাওয়া হয়। অন্যান্য উৎসবে বাহা গান করা হয় না। বাহা উৎসবের নাচ সমাপ্তির পথে চলে যাওয়ার সময় নতুন বার্তা দেওয়া হয়। বাহা উৎসবে 'শালফুল'কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। শুধু ফুল নয়, শালডালের গুরুত্বও যথেষ্ট রয়েছে। এই সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন- 'শালগাছের ডাল ভেঙ্গে পাঠানোর অর্থ বিপদসংকেত। সাঁওতাল সমাজ এইরকম বিভিন্ন গাছের ডাল পাঠানোর মধ্যে বিভিন্ন সংকেত লুকানো থাকে। ধান, আম, বট, ইত্যাদি প্রকার ভেদে সাংকেতিক গুরুত্বের তারতম্য ঘটে। এই প্রথার সূচনা হয় ১৮৫৫ র সাঁওতাল মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই।

ভগনাডিহির গ্রাম থেকে সমগ্র জাতিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ‘শালডাল’ পাঠানোর হয়েছিল। সাঁওতাল সমাজে সংকেত পাঠানো ব্যাপারটা প্রথায় প্রচলিত হয়েছে।’[৯৬]

সাঁওতালদের বাহা পরবের মতোই ‘জাহেরথানে’ই কৃষি সম্বন্ধীয় ‘এরোক’, ‘হারিয়াড়’, ‘জান্থাড়’ ও ‘মাঘ’ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ‘এরোক’ পূজা সাধারণত জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের প্রথম দিকে হয়। মূলত ধানের চারা লাগানোর পরেই ভাল ফলনের আশায় ‘এরোক’ পূজা হয়। আবার ধান যখন সবুজ হয়ে উঠে, তখন ‘হারিয়াড়’ পূজা হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস অনুসারে জাহেরথানে ‘হারিয়াড়’ পূজা করলে ‘মারাংবুরু’র কৃপা পাওয়া যায়। ক্ষেতকে ‘হারিয়াড়’ উৎসবের মাধ্যমে ঠাকুরের হাতে সঁপে দেওয়া হয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে, ঠাকুরের হাতে ক্ষেতকে সঁপে দিলে ধানের আশানুরূপ ফলন হয়। কোনো রকম আকাল কিংবা ঝড়বৃষ্টি ধানকে নষ্ট করতে পারে না। একই সঙ্গে সময় মতো ধান পেকে আশানুরূপ ফলনও হয়। ‘জান্থাড়’ পূজাও কৃষিভিত্তিক পূজা। এই পূজা ধান কাটার আগে অনুষ্ঠিত হয়। তাই ধান কাটার পূর্বে গ্রামের ‘নায়কে’ কিছু ধান কেটে নিয়ে ‘জাহেরথানের ঠাকুর’কে পূজার মাধ্যমে তা অর্পণ করে। আর এই ‘জান্থাড়’ পূজা হওয়ার পরই গ্রামের সকল চাষি ধানকাটা শুরু করে দেয়। ‘জান্থাড়’ পূজাতে ‘জাহেরথানে’ শুয়োর কিংবা মুরগি পূজা করা হয়। শুয়োর কিংবা মুরগির মাংস সব পরিবারের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়। উল্লেখ্য, ‘এরোক’, ‘হারিয়াড়’ ও ‘জান্থাড়’ পূজা-উৎসবে নৃত্যগীত হয় না। তবে মাঘ মাসের ‘মাঘ’ উৎসবে নাচ-গান হয়। ‘মাঘ’ উৎসব দু-দিন ধরে হয়। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামের ‘নায়কেবাবা’ প্রতি পরিবার থেকে মুরগি সংগ্রহ করে। এক জায়াগায় খিচুড়ি রান্না হয়। প্রত্যেকে খিচুড়ি ও মুরগির মাংস খেয়ে নৃত্য-সংগীতে মত্ত হয়। এদিনেই মাঝি-হাড়াম (গ্রাম-প্রধান) নির্বাচিত হয়। এই দিনটিকেই সাঁওতালরা বছরের শেষ দিন মানে। সুতরাং, ক্ষেতের কাজের লোক, ঘরের কাজের

লোক (যদি থাকে), বাগালির লোক, প্রত্যেকের বাৎসরিক হিসাব মিটিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় শীতের রাত্রে স্ত্রীপুরুষ নাচেগানে মত্ত হয়ে 'মাঘ' পালন করে।'[৯৭]

সাঁওতালদের 'দাঁশাই' নাচ অন্যান্য পূজা-উৎসবের মত স্থান বিশেষে আলাদা আলাদা সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। সাঁওতালদের 'দাঁশাই' নাচ বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ- সব জায়গায় একই দিনে হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সময় সাঁওতালদের 'দাঁশাই' নাচ অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার পাঁচদিন আগে থেকে শুরু হয়, শেষ হয় দুর্গাপূজার ষষ্ঠীতে। মানব চক্রবর্তী 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে সাঁওতালদের 'দাঁশাই' নাচের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। মানব চক্রবর্তীর মতে 'দাঁশাই' নাচে সমস্ত সাঁওতাল যুবকরা মাথায় ফেট্টি বেঁধে নতুন কাপড় পরে। সাঁওতাল যুবকরা মাথার ফেট্টিতে ময়ূর পালক গুঁজে রাখে। আর নারীদের হাতে ময়ূরের পালক থাকে। নারী-পুরুষ মিলে পাঁচদিন ধরে আশেপাশের গ্রামে বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নাচগান করে। নাচগানের বিনিময়ে ধান, গম ও মকাই সংগ্রহ করে। পাঁচদিনের সংগৃহীত মকাই-সবাই মিলে ভাগ করে নেয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় না। সংগৃহীত মকাই বাজারে গিয়ে বিক্রি করে তারা শুয়োর কেনে এবং সেই শুয়োরের মাংস প্রত্যেকে ভাগ করে নেয়। তারপর নারী-পুরুষ মিলে শুয়োরের মাংস খাওয়া-দাওয়া করে পান মুখে রাঙ্গা ঠোঁটে শহরের দুর্গাপূজা দেখতে যায়।[৯৮]

'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে দেখা যায় ক্যাটাজালি গ্রামের পুরুষ সোরাই মুর্মু, চন্ড সরেণ, শিউলিবাড়ির উচল, আরও অনেকই কাজ কর্ম শেষ করে শালপাতার ঠোঙ্গায় মহুয়া রস পরম তৃপ্তিতে পান করে। শুধু পুরুষ নয়, কোরা, বাইশা, লঙ্গ বা আমনের মত যুবতীরাও লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে মহুয়ার রস খায়। পুরুষরা মহুয়ার রস খেয়ে মাদল বাজায় আর মেয়েরা সেই মাদলের টানে ঘরে বসে থাকতে পারে না। মাদল বাজানোর সুরে যেন লুকিয়ে থাকে প্রাণের ডাক, পুরুষ হৃদয়ের আকুতি। তাই মেয়েরা সেই ডাকের আকর্ষণকে উপেক্ষা

করতে পারে না। বাইশা সুন্দরীর মতো তারাও ছুটে আসে পুরুষের আসরে এবং নাচগান শুরু করে। মেয়েদের নাচের পদ্ধতি হলো এরকম- ‘দুটি অর্ধবৃত্তাকার শ্রেণীতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, সবাই এ-ওকে স্পর্শ করে হয় নাচ। মেয়েরা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে মাদলের তালে একবার এগোয়, একবার পেছোয়। পুরুষরাও একইভাবে এগোনো-পেছনোর খেলা খেলে।’[৯৯] প্রাণের স্পর্শে রাত্রি হয় মোহময়। তখন মেয়েরা গান গায়-

ঝারণা বুরু ঝারণা দাঃ
আতু কানা সাহায় সাহায়।
দেন তিন নায়গো ঘাড়া কাঁডা,
দেন তিন পিতল কাঢুম।
ঝারণা বুরু ঝারণা দাঃ
লৈ আগু আগুই দাঃ ।[১০০]

নাচের চরম পর্যায়ে, গানের মোহিণী মায়া ও মহুয়া নির্যাসে উত্তেজনায় ভরপুর, প্রাণহীন রুক্ষ মাটিতে অভাবের মধ্যেও বেঁচে থাকার একমাত্র ডাক। পুরুষ হৃদয়ের যাবতীয় অন্তর্হিত যন্ত্রণা মাদলের সুরে বেরিয়ে আসে। প্রাণের উন্মাদনা বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে মাদলের বোল- ‘নৃত্যরত পুরুষ নারীর কাছাকাছি হয়। বাইশা কোরা আমনরা নিজেরদের পছন্দসই পুরুষের উন্মুক্ত বুকে কামনার বুকে চিমটি কাটে। খরিশের বুকে খোঁচা মেরে জাগানোর চেষ্টা। জেগে তো আছেই ওরা। প্রচণ্ড জাগ্রত। চিমটির মিঠেকড়া জ্বলনে সোরাই, চণ্ড, উচলের দল উন্মাদের মত খামচে ধরে আকাঙ্ক্ষিতের ঘর্মাক্ত কালো পিঠ।’[১০১] আর মেয়েরা গান করতে থাকে-

দেবোন তেঁগোন আদিবাসী বীর দ
দেবোন তেঁগোন আদিবাসী বীর-
ভারত আয়ো কড়াম তোয়া
নুনু লাগিঃৎ মানব দাঁওআ-
গিতিঃচ হাপেক্কাতে অঁচেৎ নিতঃ আবন বাবন থির
দেবোন তেঁগোন আদিবাসী বীর দ-

দুনিয়ৌ তুলুঃচ্ তোপেৎ আবন
কাউড়ি হোরো অরজনার্বন-
দিশমরেগে উদুগাবন-মান, মাহিমান, খাতির...। [১০২]

বৃষ্টির সময় মানসিক ভাবে দুর্বল বিটিয়ার যৌবন গান-

ইঞ্গাঃক কড়াম্ রে বীরবাও রাকাপ্ আকানা
আডী ত ঝাপাট বীরবাও
মনেরেন মান্মী ওকারে তাহেনা
ওকা বুরু রেতাম্ ওরা...।[১০৩]

গানের মাধ্যমে দৈনন্দিন সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। ক্লান্ত মানুষদের একসুরে এক তালে গান হয়ে উঠে। তাঁতবোনার সময় গণপতি মুর্মুর গান-

আবো দ কিচরি বো তিঞাঁ
আবো দ খান্ডুয়া বো তোয়ারা
আলে দ আপেয়াঃ লাজাও দাপাল
মেনখান আলেয়াঃ লাজাও দ ওকয়ে ওরওয়াল।[১০৪]

সাঁওতালদের দৈনন্দিন সংগ্রামের গান, দুঃখ-বিষাদ ও হুলের গানগুলি প্রকাশিত হয়েছে। গানই হলো সাঁওতাল সমাজের প্রাণ, বেঁচে থাকার একমাত্র পথ।

এই উপন্যাসে 'ভ্যাজা বিঁনধা' নামে সাঁওতালদের তীর ছোঁড়ার খেলা বা লক্ষ্যভেদের অনুষ্ঠান উল্লেখিত হয়েছে। সাধারণত মকর সংক্রান্তির দিন গ্রামের নিকটবর্তী ফাঁকা মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়, মালা, চন্দন, নতুন বস্ত্র সহকারে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়।[১০৫] 'ভ্যাজা বিঁনধা' অনুষ্ঠানে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং সম্পর্ককে সারাজীবন মজবুত রাখার জন্যে সাঁওতাল জাতির মধ্যে 'করমদার' সম্পর্ক তৈরি হয়। 'করমদার' সম্পর্ক বলতে বোঝায় 'আজীবনের বন্ধু'। 'করমগাছের ডাল মাটিতে পুঁতে, একে অন্যের খোঁপায় করম পাতা গুঁজে দেয়। এরপর জগমাঝি বন্ধুত্ব পাতানো দু'জনকে পান্তাভাত খাওয়ায়। এই

অনুষ্ঠানের পর ওরা একে অন্যের করমদার বলে পরিচিত হয়। এই ধরনের বন্ধু-বান্ধবীরা এক অন্যের সুখদুঃখে অংশ নেয় এবং সহযোগিতা করে।'[১০৬] এই ধরনের 'করমু-ধরমু', 'ফুল-পরাণি', ইত্যাদি বন্ধুত্বের রীতি সাঁওতালি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে এমন বন্ধুত্ব সারাজীবন থাকে। বন্ধুত্বের বিপরীতে সাঁওতাল সমাজের ভয়ংকর 'বিটলাহা' প্রথাও উপন্যাসে উল্লেখিত। সাঁওতাল সমাজে বিটলাহা প্রয়োগ হলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সাধারণত সাঁওতাল নারী ও পুরুষ যদি কোনও অ-আদিবাসী মানুষের সঙ্গে শারীরিক বা মানসিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় কিংবা বিবাহ করে তাহলে সাঁওতাল সমাজ সেই ব্যক্তিকে বিটলাহা-যোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে তোলে। শুধু সেই ব্যাক্তি নয়- তার পরিবারকেও একঘরে করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের কারণেও 'বিট্‌লাহা' ঘোষিত হয়। আসলে 'বিটলাহা' হলো সাঁওতাল সমাজের গুরুতর শাস্তি।

এই উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্যা ও সংকটের চিত্রও ধরা পড়েছে। সাঁওতালদের বিশ্বাস ও ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে। বহু সাঁওতাল খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। 'হড় দর্পণ' পত্রিকায় বিনয় বেসরা সেই সমস্ত প্রশ্ন করে তোলে। অর্থাৎ জাহেরথান' থেকে যীশুজাহের', 'মোরেকা' থেকে 'মরিয়াম', সহরাই থেকে 'যীশু-সহরাই', 'হাসঁদা থেকে হ্যাংসডান্‌, ওঁরাও থেকে 'ওরিয়েন', 'টুডু থেকে 'ট্রেডি', মুর্মু থেকে 'মার্মার' যদি হয়, তাহলে তার পরিণামে সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন। বস্তুত আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে পারে না। তাই পরিবর্তিত জীবনচেতনার কাছে কালো চামড়ার মানুষগুলো নিজেদের সংস্কৃতির অভাবে ধীরে ধীরে সংকটের পথে। হয়ত একদিন আদিবাসীদের 'আইডেন্টিটি'ও থাকবে না, তাদের ভাষাও হারিয়ে যাবে। বিনয় বেসরা প্রশ্ন তোলে- 'হড়-দর্পণ' কেন আমি হিন্দিতে ছাপছি ? আদিবাসীদের মধ্যে অলচিকি ভাষার ব্যাপক প্রচার কই? ক'জন বোঝে অলচিকি ? কেন চাঁইবাসার 'ঝাড়খণ্ড দর্শন' হিন্দিতে ছাপা হয় ?

কেন দুমকার 'মারশাল তাবন' রোমান টাইপে ছাপা হয়? যে জাতির বুনিয়াদ নিজস্ব ভাষার ওপর শক্তপোক্ত ভাবে গড়ে ওঠে না, তার ভবিষৎ কী![১০৭] ভাষার মধ্যে জাতির পরিচয় থাকে। অথচ সাঁওতাল ভাষার উন্নত হয়নি। সাঁওতাল সমাজের মানুষ অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্জন ও সাহিত্যচর্চা করে।

মানব চক্রবর্তী তাঁর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন শুধুমাত্র সাঁওতাল জাতির আন্দোলন নয়, এই আন্দোলনে বহু নিম্নশ্রেণির মানুষ যোগদান করেছে। দীর্ঘ দুশো বছরের ইংরেজ সরকার ও আদিবাসীর মধ্যে আর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা ছিল অত্যাচারিত দিকু, তারা আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতির মনে অনুপ্রবেশ করেছে, ফলে আদিবাসী সংজ্ঞাটাই যেন বদলে দিয়েছে। তাই মণ্ডল, মাহাতোরাও নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করে বর্তমানে। দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীদের সঙ্গে লোহার, শুঁড়ি, তেলি, কামার, ক্যাওট, দোসাদ, পাসোয়ান, কুর্মি, কাহার, ঘাটোয়াল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মানুষ মেলামেশা করেছে, ফলত তাদের একাত্ম ঘটেছে আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই তারাও 'ঝাড়খণ্ড রাজ্য' দাবি করে। সুতরাং 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে অ-আদিবাসীদের ভিন্ন চোখে যাতে না দেখা হয়। কারণ তারাও আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। অন্যদিকে জনসমর্থন পাওয়ার লোভে আদিবাসীরাও নিজেদের সংস্কৃতিকে পরোয়া করে না। মূলত সংস্কৃতি ও ঐহিত্যকে বিসর্জন দিয়ে আদিবাসী জীবন কখনই নিজস্বতা লাভ করতে পারে না।

'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করেছেন গান্ধীবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণে। যার পূর্ব সূত্র নিহিত রয়েছে বীরসা মুণ্ডার জীবন বৃত্তান্তে। বস্তুত বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে গান্ধীজীর আগে বীরসাই অহিংসা আন্দোলন চালু করেছিলেন। ভগবান বীরসা মুণ্ডা অহিংসা নীতি প্রয়োগ করেন এবং আদর্শসম্মত সংঘবদ্ধ সমাজ তৈরি

করার চেষ্টা করেছিলেন। খাজনা আন্দোলনের প্রবর্তক হিসাবে তিনি প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু বীরসা শেষ পর্যন্ত অহিংস আন্দোলন ধরে রাখতে পারেননি। অবশ্য অনেকের মতে বীরসা মুণ্ডা আধুনিক গান্ধীর পূর্বরূপ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সত্তরের নকশাল আন্দোলন কিংবা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সশস্ত্র আক্রমণের পূর্ববীজ বীরসার 'উলগুলান'। বস্তুত গান্ধীবাদী বা মার্কসবাদ নয়, মানুষের মুক্তিই হলো আসল কথা।

সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম উপন্যাস হলো 'মহুলবনীর সেরেঞ'। এই উপন্যাস তপন বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন ১৯৮৮ সালে। পরিমার্জনা কাল ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। এই উপন্যাসে ঘটনাকাল অনুযায়ী ঔপন্যাসিক কাহিনির উপ-শিরোনাম ছোটো ছোটো নামে সাজিয়েছেন, যথাক্রমে- 'পরজান বুড়ো, মহুলবনী রেয়াক্ কাথা, মুখিয়ার কুল্হি, জাহের থান, বাহা পরব, মারাং বুরু, জাহের এরা, অতিথি-বরণ, সহেলি, আদিবাসীদের স্বভূম, হাসপাতালে অঘোর, ডাক্তারবাবুর আউটডোর, শিকার-পরবে জঙ্গলে, শিকার কিন্তু কার, বির সেরেঞ, সহেলির ঘরে অঘোর, পলাশ-কুঁড়ি, সনাতন এবং জাতপাত, রানুরান্, বাপ্লা, বিয়ের আসরে ডাগদরবাবু, আই, আর ডি, পি, সহদেবের চাঁমারি, সহেলির চিঠি লেখা, প্রহ্লাদবাবুর কাছে সনাতন, চিহরগাঁইয় গিরাডাক, সহেলির মাতৃত্ব, জঙ্গল থেকে পার্বতীর কাঠ ফেরা, মহুলবনীর ক্রোধসঞ্চার, হুল-উৎসব, 'কুলহি'তে বিতর্ক, 'দেকো' ডাগদর বাবু, ঝাড়খন্দ পর্ব, পাঁচমুখিয়ার 'পুড়শি, শালঘেরীতে সহদেব, 'ডান' বিচার, পুলিশের অভিযান, একদিন ভোরবেলা ও আবার ঝাড়খন্দ ইত্যাদি শিরোনামে। ঔপন্যাসিকের শব্দ চয়নেই বোঝা যায় সাঁওতাল জীবনচিত্র গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসের পটভূমি মূলত মেদিনীপুরের গোপীবল্লভ এলাকার একটা সাঁওতাল গ্রাম। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামটির নাম 'মহুলবনী'। এই গ্রাম ও তার আশেপাশে অঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের পরতে পরতে আলোচনা করেছেন।

সাঁওতালদের লোককাহিনি অনুসারে আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। পৃথিবীর আদিপর্যায়ে ঠাকুর বসবাস করতো। ঠাকুরের ইচ্ছাতে জলের ভিতর থেকে মাটি তুলে আনার পরিকল্পনা শুরু হয়। ঠাকুর একে একে সবাইকে ডাকল, কাঁকড়া, কচ্ছপ, কুমীর, হাঙর, রাঘববোয়াল সকলেই মাটি তুলতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে কেঁচোকে ডাকা হয়। কচ্ছপের সাহায্যে কেঁচো জলের ভিতর থেকে মাটি তুলে আনে। কচ্ছপের পিঠের সাহায্যে মাটি তুলতে তুলতে একটা একটা সময়ে জলের উপরে মাটি হয়ে উঠে। এই মাটি সর্বত্র সমান হয়নি, উঁচু-নিচু জায়গাগুলিতে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর সৃষ্টি করে তোলে মাটির পৃথিবী। তারপর ঠাকুর জীবন সৃষ্টির কথা ভাবলো। ঠাকুরের ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয় যখন একটা দ্বীপে পিলচু হারাম ও পিলচু বুড়ির জন্ম গ্রহণ করে। এরপর পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি দ্বীপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জঙ্গলে বসবাস করতে শুরু করে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতালদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করেননি। তিনি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর আদিম কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সাঁওতালদের কাছে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি হলো পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা। এরাই সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জন্ম দিয়েছে, সাঁওতালদের আদি পিতা ও মাতা। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি জঙ্গল ও পাহাড়ে দিন কাটাত। সাঁওতালদের 'মারাংবুরু' দেবতা উঁচু পাহাড়ে থাকে। 'মারাংবুরু'ই হলো সাঁওতালদের সবচেয়ে বড়ো দেবতা। সাঁওতালরা 'মারাংবুরু'র কাছে সকালে-বিকালে প্রার্থনা করে। সাঁওতালদের বারো গোত্রের মানুষরা বন-জঙ্গল-পাহাড়ে দিনযাপন করত। 'মারাংবুরু'কে তারা যেমন দেবতা হিসাবে মানে তেমনি 'সিং চান্দো'(সূর্য) ও 'নিন্দা চান্দো'(চাঁদ) কেও দেবতা হিসাবে পূজা করে।[১০৮] বারো পদবীর মানুষের বারো গোত্রের কাহিনি ও উপকথা আমরা শুনতে পাই উপন্যাসের অন্যতম প্রবীণ চরিত্র পরজান বুড়োর কাছ থেকে। সাঁওতালদের উপকথাতেও জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে আদি গোত্র হলো হাঁসদা। তারা জিহু পাখির মাংস খায় না। জিহু পাখির রঙ

ছোঁয় না। হেমব্রমরা সুপারি খায় না। সরেনদের ‘সরেনসিপাহী’ বলা হয়। মাঝিদেরকে ‘ব্যবসায়ী’ আর কিসকুদের ‘রাজা’ বলা হয়। ঔপন্যাসিক সাঁওতালদের যে পদবী উল্লেখ করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে যে গোত্র বিভাজন তা খুবই জটিল। একই গোত্রের নর-নারীরা প্রেম-ভালোবাসা-বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে না। সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস একই গোত্র মানেই নিজেদের বংশের মানুষ। শুধু একই গোত্র নয়, কিছু কিছু গোত্রের মানুষ অন্য গোত্রের মানুষের সঙ্গেও বিবাহ করতে পারে না। তাই টুডুদের সঙ্গে বেসরাদের বিবাহ হয় না। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে তাদের প্রাচীন লোককথা। আর এই লোককথার উল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যায়। টুডু পদবীর দুই ছেলে নিজেদের গ্রাম পেরিয়ে অন্য গ্রামের যুবতীদের কাছে পৌঁছায়। যখন তারা গ্রামের দিকে যায় তখন একটি জলপূর্ণ খাল পাওয়া যায়। ছেলে দু’টি খুব কষ্ট করে পার হয়। যাই হোক, অন্য গ্রামে ছেলে দুটির সঙ্গে সাতজন যুবতীর মেলামেশা ও পরিচয় হয়। এরপর তারা সারারাত্রি ধরে নাচ গান করে। কিন্তু ভোরবেলা ছেলে দুটি আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে আসার সময় সেই খালে আটকে পড়ে। কারণ সেই খালে জাল বিছানো ছিল। সাতজন নারীদের মধ্যে থেকে বড় দুইজন নারী জাল বিছিয়ে দিয়েছিল। জাল বিছানোর কাহিনিটি রূপক, আসলে ছেলে দুটি ভালোবাসার জালে আটকে পড়েছিল। ছোট দুই যুবতীর সঙ্গে ছেলেদুটির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাকি পাঁচজন বড়ো যুবতীরা ছোট দুই যুবতীদের ভালোবাসার সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। কেননা তারা বড় অথচ তাদের থেকে ছোট যুবতীরা প্রেম করছে। বড়ো যুবতীদের ধারণা ছিল আগে বড়রা প্রেম করবে তারপর ছোটোরা। তখন সিদ্ধান্ত হয় টুডুদের সঙ্গে বেসরাদের বিবাহ হবে না।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহুলবনীর সেরেঞ’ উপন্যাসেও দেখা যায়, সাঁওতাল পরিবারে রয়েছে জন্মের আনন্দ ও মৃত্যুর শোকের রীতিনীতি। সাঁওতালদের পরিবারে শিশুর জন্ম হলে ‘জানাম ছাটিয়ার’ অনুষ্ঠান হয়। শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি ছেলে সন্তান হলে পাঁচ দিনের হয় আর

মেয়ে সন্তান হলে তিনতিনের হয়। ঘরে নাপিত আসে, তাঁর মাধ্যমে নবজাতকের মস্তকমুণ্ডণ করানো হয়। পাশাপাশি গ্রামের পুরুষরাও চুল দাঁড়ি কামিয়ে নেয়। একটা পুকুরে গিয়ে সকলেই স্নান করে ঘরে ফিরে আসে। আর নারীরাও পুকুরে গিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে আসে। স্নান করার পর ঘরের মধ্যে নবজাতকের মা গোবর জল পান করে। তারপর নিম জল পান করে। নিমজল পান করার পর খিচুড়ি হয়। গ্রামের সকলেই খিচুড়ি খায়। এভাবেই সাঁওতালরা 'জানাম ছাটিয়ার' অনুষ্ঠান পালন করে।

সাঁওতালদের প্রথানুসারে অতিথি বরণ একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই অতিথি বরণের প্রথা বেশ আকর্ষণীয়। অতিথি বরণ করা হয় বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে। তবে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে নয়, এমনি দিনেও মান্যগণ্য সম্মাননীয় ব্যক্তিকে খুব যত্ন সহকারে বরণ করা হয়। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র অলক্তক, জাতিতে বাঙালি আর পেশায় ডাক্তার। অলক্তক সকল মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। তাই সাঁওতালদের উৎসবে সে আমন্ত্রিত হয়েছে। সাঁওতালদের কাছেও অলক্তক সম্মাননীয় অতিথি। অলক্তক জুতো খুলে বসে রয়েছে। থালার পাশে প্রদীপের আলো এবং তেলের বাটি আছে- 'নীরবে মেয়ে এসে পা ধোয়ায় অতিথিদের, ছেলেরা খাটিয়া টেনে আনে বাইরের চালায়।' ফুলমণি বলে একটি অল্প বয়সের মেয়ে, অলক্তকের পা দুটো তেলের বাটিতে চুবিয়ে দিয়ে ভালো করে তেল মাখিয়ে দেয়। ফুলমণি তেল মাখিয়ে চলে যাওয়ার পরই অন্য একজন মেয়ে এসে আবার অলক্তকের পা দুটোতে তেল মাখিয়ে দেয়। সর্বশেষে তৃতীয়তম একটি মেয়ে এসে অলক্তকের পা দুটো জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে এবং গামছা দিয়ে মুছে দেয়। তারপর একে একে সবাই অলক্তকে প্রণাম করে। আর এভাবেই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতালদের অতিথি বরণ রীতি বেশ চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন।

সাঁওতালদের প্রায় সব রকম পুজোর স্থান হলো 'জাহেরথান'। 'জাহেরথান' সাধারণত গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলে কিংবা গাছে ঘেরা স্থানে থাকে। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামেই 'জাহের

থান’ থাকে। গ্রাম থেকে একটু দূরে ‘জাহের থান’ বানানো হয়। ‘জাহের থান’ স্থাপিত হয় মূলত শালগাছের নিচে। চারটি শাল ও একটি মহুয়া গাছ, কমবেশি পাঁচটি গাছ জাহেরথানে থাকা আবশ্যিক। চারটি শালগাছের নাম হলো জাহেরদেব, মোরেকোদেব, মারাংবুরু, পরগণা বোঙ্গা এবং মহুয়াগাছের নাম হলো ‘গোসাই এরাঃ’। সব গাছের তলায় গোবর জলে পরিষ্কার করা ও তেলসিঁদুর লেপা পাথরের মধ্যে রীতিনীতি-নিয়মানুসারে পূজা করা হয়।

একটি শালগাছ ‘মারাং বুরু’র উদ্দেশ্যে আর একটি শালগাছ ‘জাহের এরা’র উদ্দেশ্যে পূজা করা হয় সাঁওতালদের অতি পবিত্র ধর্ম বিষয়ক ‘বাহা উৎসব’-এ। ‘শারী সারজম বাহা হো’ বা ‘বাহা উৎসব’ ফাল্গুন মাসে, দোল পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বাহা উৎসব বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয়। বাহা উৎসবের দিন ঠিক করে গ্রামের মোড়লরা। উৎসবের দিন ঠিক হওয়ার পর থেকেই বাহা উৎসবের আনন্দ-উন্মাদনা দেখা যায়। প্রথমদিনেই ‘মারাং বুরু’ ও ‘জাহের এরা’-র দুটি বেদি বানানো হয়। সেখানে সাজিয়ে রাখা হয় বালা, হার, তীর ধনুক ও কুঠার। তার পাশে থাকে সিং আর ঝুড়ি। সন্ধ্যের সময় সাঁওতালরা ‘জাহের থানে’ জড়ো হয়। সেখানেই একজোড়া ছেলে-মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়। ছেলে-মেয়ে দু’টি তখন আর সাধারণ মানুষ থাকে না। দু’জনই দেবদেবী হয়ে উঠে। ছেলে মারাংবুরু আর মেয়ে জাহের এরা। শালজঙ্গলে মারাংবুরুর সঙ্গে জাহের এরার লুকোচুরি খেলা হয়। মারাংবুরু জাহের এরার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। মারাংবুরুর হাতে তীর ধনুক থাকে। জঙ্গলের মধ্যে জাহের এরা বালা ও হার হারিয়ে ফেলে। জাহের এরা আবার জঙ্গলে ফিরে যায় এবং খুঁজে খুঁজে বালা ও হার পায়। তারপর মারাংবুরু আর জাহের এরা জঙ্গলের মধ্যে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। মারাংবুরু ও জাহের এরার অঙ্গভঙ্গি দেখে মরেকো ও গোঁসাই এরাও নানান অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। এভাবেই মরেকো, জাহের এরা, মারাং বুরু ও গোঁসাই-এরা’র বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির

মধ্য দিয়ে নৃত্যানুষ্ঠানের সুত্রপাত ঘটে। এই নৃত্যই সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছে সেই আদিকাল থেকে।

সাঁওতাল জনজাতির বাহা পরবের সময় বনাঞ্চল ফুলে ফুলে ভরে থাকে। শাল-মহুয়া ফুলে বাতাস হয় আমোদিত। 'বাহা' উৎসবের অন্যতম কারণ হলো, ফুল-ফল-নতুনপাতা শোভিত অরণ্যপ্রকৃতিকে বরণ করা। 'শারী সারজম' কথার অর্থ 'সত্য শালগাছ'। সাঁওতালি ভাষায় 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল, বিশিষ্ট্যার্থে 'শালফুল'। যতদিন বাহাপরব হচ্ছে না ততদিন 'শালফুল' তোলা যায় না। বাহাপরবের দিন তাদের প্রিয় শালফুল দিয়ে যুবতীরা সেজে উঠে। মাদলের দিতাং দিতাং বোলের আওয়াজ আর ধামসার দ্রিমদ্রিম শব্দতে জাহের থানের পরিবেশ আশ্চর্য এক মায়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মেয়েরা আনন্দে বাহা পূজায় গান করে-

হালাং আলাং মাজিন মাৎকম্
বাহারে আলং নাজিন সারজম বাহা।
নুইলাং নাজিন মতকম রসা।[১০৯]

অর্থাৎ মহুয়া ফুল সংগ্রহ করে মহুয়া রস পান করা হয়। আর শাল ফুল মাথায় দেওয়া হয়। এই শাল ফুল মাথায় রাখলে সাঁওতাল রমণীদের খাজুরাহো কিংবা কেনোরকের পাথর কোদা মূর্তির মতো যেন দেখতে লাগে। এভাবেই 'জাহের থানে' একসঙ্গে সমগ্র নারী ও পুরুষ আনন্দে মেতে উঠে। সাঁওতালদের কাছে উৎসব-আনন্দটাই আসল জিনিস। 'জাহের থানে' নাচ-গান করতে করতে নারী-পুরুষ মিলেই নায়কিবাবার সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের প্রতিটা ঘরে গিয়ে শাল ফুল বিতরণ করা হয়। আর মেয়েরা নায়কিবাবার পা জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। এভাবেই 'দোল পূর্ণিমা'র রাত শেষ হয়ে যায়। পরের দিন রঙ বা জল খেলা হয়। 'সারজম' বাহার সঙ্গে দোলের কিছু মিল রয়েছে। যেমন রঙ খেলা। তবে সাঁওতালরা রঙ খেলে না। তার পরিবর্তে গায়ে জল ঢালে। আজকাল পিচকিরিও ব্যবহৃত হয়। এই উৎসবে পরস্পর

পরস্পরকে জল ছেটানোর মধ্যে দিয়ে বিগত দিনের রাগ-হিংসা-বিদ্বেষ ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এভাবেই সাঁওতালদের পবিত্র 'বাহা' পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক 'শিকার উৎসবে'র নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। 'মহুলবনী সেরেঞ' উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি মহুলবনী গ্রাম। মহুলবনী গ্রামের আশেপাশে সোনাঝুরি-চিকিনশিরি নামক বহু জঙ্গল রয়েছে। মহুলবনী গ্রামের পরজান বুড়ো আদি সমাজের রূপকার। পরজান বুড়ো গ্রামের সকলকে বুঝিয়ে দেয় সাঁওতাল সমাজে শিকার পরবের গুরুত্ব কতটা রয়েছে। অনেক সময় পরজান বুড়ো একা একা শিকারে যায়। চিকিনশিরি জঙ্গলের মধ্যে পরজান বুড়ো আদিম সত্ত্বা খুঁজে পায়- 'চিকিনশিরি জঙ্গলের আদিম গন্ধে সে পলকে উঠে এক অন্য মানুষ, তখন সে ফিরে পায় তাঁর আদত জীবন। তারা তো জঙ্গলেরই আদত মানুষ।'[১১০] মহুলবনী গ্রাম থেকে পরজান বুড়ো, সহদেব, রতন, লেলহা একে একে সবাই শিকার উৎসবে যায়। চিকিনশিরি জঙ্গল থেকে সোনাঝুরি জঙ্গল বেশ বড়। জঙ্গলে মোরগ, শুয়োর, খরগোশ, পাখি, হরিণ– এমন কি বাঘও পাওয়া যায়। পশুপাখি-জন্তু-জানোয়ারকে শিকার করা হয় তীর-ধনুক-বল্লম-টাঙ্গি-দড়ির মাধ্যমে। শিকার পরবে শুধুমাত্র একটা গ্রামের মানুষ যায় না, মহুলবনীর পার্শ্ববর্তী কুলবনা, শালঘেরী কিংবা ঘড়িগেড়িয়্যার গ্রামের মানুষরাও যায়। শিকার করার পূর্বে মহুলবনীর পরজান বুড়োরা পাঁচভাগে ভাগ হয়। পরজান বুড়োর সঙ্গে থাকে লাদো আর নেগা। রামদাসের সঙ্গে থাকে গিথা আর দীখু। আহার হেমব্রমের সঙ্গে থাকে পরাশর। আর সহদেবের সঙ্গী রতন। তারা শিকারে গিয়ে জঙ্গলের কোনায় কোনায় খুঁজে বেড়ায়। এক সঙ্গে চারিদিকে শিকার করা প্রায় অসম্ভব। তাই আলাদা আলাদা ভাগ করে গোটা জঙ্গল টহল করা হয়। তারা সারাদিন খুঁজে বেড়ায় জীবজন্তুদের। কেউ খুঁজে পায় আবার কেউ খুঁজে পায় না। শিকারে গিয়ে পরজান বুড়ো একটা শুয়োর শিকার করে। আহার হেমব্রমও দুটো মোরগ, খরগোশ-হরিণ শিকার করে। শুধু সহদেব আর রতন শিকার করতে পারেনি। সহদেব একটা

খরগোশ শিকার করেছিল, কিন্তু খরগোশটা কে শিকার করেছে- তা নিয়ে সহদেবের সঙ্গে শালঘেরীর রামলালের ঝগড়া বাঁধে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সহদেব আপোষ মানে। আপোষ করার পরই আসল সত্য বেরিয়ে আসে। আসলে সহদেবই খরগোশটি মেরে ছিল। কিন্তু সহদেবের তীর খরগোশের শরীরে লাগার পরই সে মুগ্ধ হয়েছিল রায়না নামে একটি নারীর কণ্ঠস্বরে- 'তুমি টাকা আনতে যাবে রাচি শহরের দিকে/ আমি বসে থাকব তোমার আশায়।' ওই সময় সহদেব রায়নার ভালোবাসায় অন্ধ হয়েছিল। খরগোশকে হাতছাড়া করার পরই সহদেবের সামনে নধর শুয়োর চলে আসে। সহদেব তীর ছুড়ে শুয়োরকে মেরে ফেলে আর সেই শুয়োর রতন ধরে নিয়ে আসে। শিকারীরা দুপুর থেকে শিকার করা শুরু করলেও একসময় রাত্রি নেমে আসে। এরপর একটা বড় টিলাতে সকলেই জড়ো হয়। সেই সময় দেখা যায় আকাশে চাঁদ আর জঙ্গলের আগুন। ঝলসে যাওয়া আগুনেই মোরগগুলি ঝলসানো হয়। যত রাত যায় ততই তাদের আনন্দ বাড়তে থাকে। মাদল ও ধামসার শব্দে সমগ্র জঙ্গল যেন নতুন রূপে দেখা দেয়। ঝলসা আগুনে জঙ্গল মায়াময় পৃথিবী হয়ে উঠে। আর মাদলের শব্দে মধুময় পৃথিবী হয়ে উঠে। জঙ্গলে সমস্ত মানুষ মাংস খায় আর আনন্দে নাচ-গান করে। মুক্ত পৃথিবীতে এসে ইচ্ছামতো নাচের ভঙ্গিমা দেখা যায়। আর তাদের শিকার গানগুলি জঙ্গলেই গাওয়া হয়, গ্রাম-গঞ্জে গাওয়ার উপযুক্ত নয়। অশ্লীল সব গান। নাচ-গানের পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। দারিদ্র্য সাঁওতালদের বাড়িতে মাছ-মাংস থাকে না। শিকার পরবে এসে মাংসের আয়োজন হয়। সারা বছরের স্বাদ তারা যেন মিটিয়ে নেয়।

ঔপন্যাসিক আদিবাসী কন্যা কাজলের বিবাহের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জনজাতির বিবাহ প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। কাজলের বিবাহ দিনে ঘরের উঠোনে একটা ছোট গর্তে সিদ্ধ চাল, হলুদ, ঝিনুক, দুব্বা ঘাস দেওয়া হয়। তার উপর গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালেই 'জল বিয়ে' উৎসব হয়। 'জল বিয়ে'র মূল কেন্দ্র হলো মেয়ে পক্ষের কোনো একটা

জমি কিংবা পুকুরপাড়। একটা গর্তে জল ভর্তি করা হয়। গর্তে সিঁদুর-কলা-তীর পুতে দেওয়া হয়। তার গোড়ায় ঝিনুক ও একটা মুরগির ডিম দেওয়া হয়। 'জল বিয়ে'তে ঘটি জল, হাসুয়া, সিঁদুর ও ধান খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। মেয়েরা পুরুষের উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া ছুড়ে দেয়। তারপর মেয়েরা নাচ ও গান করতে থাকে। মেয়েরা কাজলের উদ্দেশ্য গান করে-

একি ওদিক চতুর্দিকে
উড়তে থাকে মোরগাগুলো,
একি ওদিক চতুর্দিকে
কালো গরুর মস্ত গোয়াল,
সোনার হারটা পড়ে গিয়েছে গভীর জলের মাঝে
রূপোর বাজুটা পড়ে গিয়েছে গভীর ঝর্ণা-জলের স্রোতে
কে যে এখন তুলে আনবে সোনার হারটা, হায়।
কে যে এখন কুড়োবে ওই রুপোর বাজুটা, হায়।
কাজলেই শেষে তুলে আনল সোনার হার আহা
কাজলই শেষে তুলে আনল রূপোর কাজুরী, আহা।[১১১]

এই রকম গান গাইতে গাইতে গর্তে ভরা জলের চারিদিকে মেয়েরা তিনবার ঘুরতে থাকে। এই গানের মধ্যে একজন নারীর বাস্তব জীবনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে নারীদের নানা অত্যাচার-অপমান সহ্য করতে হয়। তবুও সংসারের মধ্যে ফাটল ধরলে সেই ফাটল মেয়েরাই মেরামত করে। 'জল বিয়ে' হওয়ার পর কাজলের গায়ে হলুদ মাখা পর্ব শুরু হয়। হলুদ মাখা পর্বের মধ্যেও নাচ ও গান চলতে থাকে। কাজলকে উদ্দেশ্যে করে মেয়েরা গান করে-

উমিন মারাঁ ল ল সেতবে
চাবী উমুল বাদল তিরি উমুল?
চাবী উমুল দ ল ল সেতং ভোরগে
তিরি উমুল দ যুগে যুগে।[১১২]

অর্থাৎ এই গানের মধ্যে স্বামীর গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে। গান ও নাচের আনন্দ শেষ হতে না হতেই ‘বরযাত্রী’র আগমন ঘটে। শালগাছের নিচে গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তিরা বরযাত্রীদের বরণ করে। বর ও কন্যা পক্ষ উভয়ের মধ্যে হুকো-তামাক-বিড়ি খাওয়ার বিনিময় ঘটে। বরযাত্রীদের একটা শালগাছের নিচে তখনকার মত থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বরযাত্রীদের বরণ করার সময় কন্যা পক্ষের একজন মস্করা নারীর ভূমিকা অবশ্যই থাকে। এখানে মস্করা নারীর ভূমিকা পালন করে ডাকোহিলি। ডাকোহিলি বরকে বাচ্চার মত করে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির উঠোনে নিয়ে যায়। বর দাড়ি কামায়নি– পাউডার মাখেনি– এমনই অভিযোগ করে ডাকোহিলি একটা শালপাতা বরকে ধরিয়ে দেয়। বর শালপাতাকে আয়নার মত ব্যবহার করে। আর ডাকোহিলি একটা কাঠ দিয়ে ক্ষুরের মতো ঘষে বরের দাড়িতে। সবাই তখন আনন্দে ফেটে উঠে। অর্থাৎ বরকে মজার ছলে নতুন করে পরিস্কার করা হয়। বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে কাজলের বাবা নেগা মাণ্ডি চলে আসে। বর নেগা মাণ্ডিকে একটা মালা পরিয়ে দেয়। নেগা মাণ্ডিও বরকে পাগড়ি পরিয়ে দেয়। তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ততক্ষণে কাজলকে পাত্রীরূপে সাজিয়ে একটা ঝুড়িতে রাখা হয়। কাজল ঝুড়িতে বসে থাকে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর বর দাঁড়িয়ে থাকে পূর্বদিকে মুখ করে। বর কাজলের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দেওয়ার পর ঝুড়ির ভিতর থেকে বর কাজলকে তুলে বার করে আনে। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত হলেও যথারীতি তাদের নাচ ও গান চলতে থাকে। বহু আত্মীয় স্বজন বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়। অলক্তক ডাক্তারও বিয়ের দিনে এসেছিল। অলক্তক মনে মনে ভাবে- ‘বাইরের পৃথিবী যখন অভাবে, দুঃখে শোকে পাথর হয়ে আছে, তখন চারপাশের সমস্ত প্রাণরস নিংড়ে শুষে নিয়ে আদিবাসী মানুষগুলো কী এক আশ্চার্য আনন্দে মউজ হয়ে আছে।’[১১৩]

জীবন ধারণের জন্য সাঁওতালদের কাছে নৃত্যই প্রকৃত উৎসব। সাঁওতাল নারীরা বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন রকম নাচ করে। সাঁওতাল রমনীদের কঠিনতম নাচ হলো ‘ঝিকানাচ’। ঝিকানাচের বৈশিষ্ট্য হলো মাথায় জল ভর্তি কলসি নিয়ে নাচা। নাচের তালে তালে ভরা কলসি থেকে জল মাটিতে ছিটকে পড়ে। অথচ শরীরে জল লাগে না। ঝিকানাচ মেয়েরা সব অনুষ্ঠানে নাচে না। বিশেষ অনুষ্ঠান কিংবা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে এই নাচের আয়োজন হয়। মেয়েরা যেমন মাথায় কলসি ভরা জল নিয়ে নাচতে ভালোবাসে তেমনি হাতে থালা ভরা জল নিয়েও নাচতে অভ্যস্ত। এই ক্ষেত্রে একটি হাতে জল ভরা থালা থাকে আর অন্য হাতে প্রদীপ থাকে। এই ‘ঝিকানাচ’ বেশ আকর্ষনীয় নাচ। ‘ঝিকানাচে’র প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

মহুলবনী গ্রামের মধ্যে সাঁওতাল নারীর সঙ্গে বাঙালি বাবুর প্রেম সম্পর্কই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। অঘোর শিক্ষিত ও বর্তমানে বর্ধমান পুলিশ-ব্যারাকে চাকরি করে। সাঁওতালদের ‘বাহা পরব’ উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে আসে। ঘরে তার স্ত্রী সহেলি। তাদের বাচ্চা হচ্ছে না বলে গ্রামের লোক নানা কথা বলে। দিলীপ হালদারের পরামর্শে অঘোর তার বউকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। অঘোরের কথাতে ডাক্তারের মানবিকতার পরিচয় মেলে, এই ডাক্তার খুব ভালো মানুষ, যত্ন করে চিকিৎসা করে। কারণ আগে যে ডাক্তার ছিল, সে শুধু টাকা চিনতো, মানুষকে চিনতো না। ডাক্তারের নাম অলক্তক, জাতিতে বাঙালি। ডাক্তারকে ‘বাহা পরব’ উপলক্ষ্যে মহুলবনী গ্রামে নিয়ে যায় অঘোর। অবশ্য এক দিকুকে অতিথি হিসেবে বরণ করায় গ্রামের পুরাজান বুড়ো ও নেগা মাণ্ডি ভালো চোখে দেখেনি। কারণ নেগা মাণ্ডির বউ-কে দিকু নিয়ে পালিয়ে গেছে বহু বছর আগে। যাই হোক, অঘোরের বউ সহেলির সঙ্গে অলক্তক-এর পরিচয় হয়। অঘোর ও অলক্তক ঝিকানাচ সম্পর্কে আলোচনা করে। সহেলি পাশে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসে। আর সহেলির সেই হাসি অলক্তকের খুব ভালো লাগে।

গরিব, অসহায় সাঁওতালদের জন্যে কোনোরকম ফি ছাড়াই ডাক্তারবাবু মহুলবনী গ্রামে আলাদাভাবে আউটডোর খোলে। এই কাজে অঘোর, সহেলি ও গ্রামের কিছু লোক খুশি হলেও গ্রামের পাঁচ জন অবশ্য রাজি হয়নি। কারণ বাঙালিদের প্রতি সাঁওতালদের বিশ্বাস বরাবরই ছিল না। তাদের বিশ্বাস বাঙালিরা সাঁওতাল মেয়ে-বৌদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করে। কিন্তু অলক্তক যেন আলাদা, তাই তার আসা-যাওয়া চলে মহুলবনী গ্রামে। একদিন মধ্য-দুপুরে সে অঘোরের ঘরে যায়। অঘোরের ঘরে প্রবেশ করার আগেই অলক্তকের শরীর এক ঠাণ্ডা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সে সহেলির কথা ভাবে, ভাবে তার কথার ঢঙ নিয়ে। সহেলির খিলখিল হাসিতে সে মুগ্ধ হয়। গ্রাম্য রমণী সহেলির কথা বলার ভঙ্গি, চোখের চাউনি, সন্দুর মুখখানা ও খিলখিল হাসি অলক্তকের মনে বার বার ভেসে উঠে। আসলে অলক্তক সহেলির প্রেমে পড়ে যায়। অঘোরের ঘরে সহেলি একা থাকে। অলক্তকের সঙ্গে সহেলির নানা কথা হয়। অলক্তকের বিদায় নেওয়ার সময় সহেলি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসার কথা বলে উঠে। আর তারপর থেকেই অলক্তকের মাথাতে ‘দুলৌড়’ শব্দ যেন ঝিমঝিম করতে থাকে। মহুলবনী গ্রামে নেগা মাণ্ডির মেয়ে কাজলের বিয়েতে ডাক্তারবাবু আসে। গভীর রাত পর্যন্ত বিয়ে হয়। অলক্তক ঘরে ফেরার সময় সাইকেলের দু-চার প্যাডেল ঘোরাতেই হঠাৎ মহুল রস খাওয়া সহেলির সঙ্গে দেখা হয়। সহেলি অলক্তকে বলে- ‘চল্ না, বলে হঠাৎ এসে অলক্তকের হাতটা ধরল, চল বাবু! রাগ নাই করিস।’ খোঁপা বাধা চুলে লাল-সাদা ফুল গোঁজা ও সবুজ ডুরে শাড়িতে হলুদ ফুল-কাটা ব্লাউজ পরে রহস্যময়ী সহেলির নরম হাত দিয়ে অলক্তকে ধরে রাখে। ভারী স্বপ্নময় অন্ধকার শালজঙ্গলে সবুজ তৃণময় মাটিতে সহেলি অলক্তকে নিয়ে বসে পরে শালফুলের ওপরে। সহেলি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করে- ‘এমন রাস্কার দিনে একটু দুলৌড় করবি নে। বলতে বলতে তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে একঝাটকায় টেনে নিল তার শরীরের উপর।’[১১৪]

অলক্তক একটু বিভ্রান্ত ও শঙ্কিত বোধ করে। তার পরেই অলক্তক রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ে। শালজঙ্গলের সবুজ ঘাসের ওপরে তার জীবনে প্রথম নারীর স্বাদ ঘটে।

গ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং গ্রামের সাধারণ লোকজন সহেলি ও অলক্তকের অবৈধ সম্পর্কে জানতে পারে। শুরু হয় উপন্যাসের আর এক নতুন দিক। ভোররাতে সহেলি লুকিয়ে দিকু ডাক্তারবাবুর কাছে যায়। এতে অলক্তক অবাক হয়ে যায়। অবশ্য অলক্তকের মধ্যেও একটা চাপা চিন্তা ছিল যে, অঘোর কালো মানুষ আর বাচ্চার রঙ যদি ফরসা হয় তাহলে তো সমস্যা হবেই। সহেলি ও অলক্তকের মধ্যে একদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা যে এত ভয়ংকর হতে পারে, তা অলক্তক আন্দাজ করতে পারেনি। এর প্রধান সমস্যা হলো- সাঁওতালদের প্রেম-ভালোবাসা হয় নিজেদের মধ্যে। ভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে তাদের প্রেম করা নিষেধ আছে। অলক্তক যে ভিন্ন জাতির পুরুষ। সাঁওতালরা তাকে মেনে নিতে পারে না। একদিন ভোর বেলায় সহেলি কেঁদে কেঁদে অলক্তকের কাছে এসেছিল, আবার কান্না ভেজা চোখে ফিরে যায়। একই সময়ে আবার 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের রাজনৈতিক বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়ে মহুলননী গ্রামে। গ্রামের লোকজন সন্তান সম্ভাবনা সহেলি ও অলক্তকের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে বিচার ডাকে। গ্রামের মানুষরা উত্তেজনায় ডাক্তারকে উচিত শাস্তি দেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। অলক্তক বুঝতে পারেনি কিন্তু এস.ডি.ও বুঝেছিল। ফলে এস.ডি.ও এসে ডাক্তারকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে। অলক্তক এস.ডি.ও-এর মাধ্যমে জানতে পারে সহেলি আত্মহত্যার ঘটনা। তখন অলক্তক প্রবল আর্তনাদে শিউরে উঠে। অবশেষে দুঃখ, কষ্ট, উদ্বেগ নিয়ে নিজের মুখ ঢেকে খড়িকামাথানি, মহুলবনী গ্রাম ত্যাগ করে ডাক্তারবাবু।

কাহিনির সমাপ্তিতে দেখা যায় ভয়ংকর পরিণতি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের জীবনযাপন ও জীবন দর্শন সম্পর্কে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব সচেতন ধারণা রয়েছে। এই সহজ-সরল মানুষের মধ্যে একটা আলাদা

নিয়ম-কানুন আছে। তবুও তাদেরকে বাঙালি জাতির মতো মনে করাটাই অলক্তকের মুখ্য ভুল। ঘটনার উত্থান-পত্তনের মধ্যে দিয়ে শহরের যুবক শহরেই ফিরে আসে। ঔপন্যাসিক যেন জানতেন সহেলীকে আত্মহত্যায় মরতে হবে এ তার প্রাথমিক নির্দেশ। অসহায় নারী বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পায়নি। এখানে নারী চরিত্রের ভূমিকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে এবং সমাজ থেকে মুক্তি পেতে নিজের সিদ্ধান্ত নিজের হাতে নিয়েছে সহেলি। সহেলি নিজেকে মহীয়সী ভাবতে পারেনি, সে নিজেকে তুচ্ছ ভেবেছে। তার কাছে মৃত্যু মধুর নয়, করুণ, বেদনাদায়ক, কঠিন বাস্তব ও মর্মান্তিক।

'মহুলবনী সেরেঞ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এক বিরাট প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, অর্থাৎ এই রকম মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী কে? অলক্তক, সহেলি নাকি গ্রামের মানুষ। জটিল এক প্রশ্নের মুখে ঔপন্যাসিক পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন এই ঘটনার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক বাস্তব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাসের বয়ান নির্মাণ করেছেন। অলক্তক, সহেলি, গ্রামের লোক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাঁওতাল সমাজ এবং সর্বোপরি ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন-সব মিলেই উপন্যাসের কাঠামো ও মূল বিষয় বস্তু গঠিত হয়েছে। চিরকালীন সত্য যে, বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ও গুণে শিল্পীর গতি চলেছে শিল্পের পথে। এই উপন্যাসও ব্যতিক্রম নয়। ভিন্ন জাতির পুরুষ কিংবা সাঁওতাল সমাজও হার মেনে নেয় সাঁওতাল নারীর আত্মহত্যার মাধ্যমে। মৃত্যুই জীবন ও জগতের মুক্তির পথ।

এই আত্মহত্যার মূলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সমকালীন লড়াই ইতিহাসের মূল্যবোধ আধুনিক ইতিহাসে বিরাজমান। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই রকম ইতিহাসকে অস্বীকার করেননি। তাঁর উপন্যাসে সাঁওতালদের রাজনৈতিক যুদ্ধ, জমি দখলের লড়াই ও অস্তিত্বের লড়াই দেখতে পাই। 'মহুলবনী সেরেঞ' উপন্যাসের পাশাপাশি পঞ্চায়েত রাজনীতি নিয়ে রচিত 'দ্বৈরথ' (২০১৪)

উপন্যাসেও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের খণ্ড চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরের গ্রামবাংলার রাজনীতির ইতিহাস নিয়ে 'দ্বৈরথ' উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। এই উপন্যাসের 'পঞ্চরং' পর্বে জমিদার রাজকিশোর সিংহ ও আদিবাসী সাঁওতালের লড়াই হয়। রাজকিশোরের জমিতে বহু বছর ধরে সাঁওতালরা কাজ করে এসেছে। নিরীহ সাঁওতালরা রাজকিশোরকে দেবতার মতো পূজা করত। ভূমিসংস্কারের নতুন আইন অনুসারে সেই জমিতে তাদের বর্গাদার হিসাবে রেকর্ড করার কথা। কিন্তু রাজকিশোর তার জমিদারি প্রথা ভুলে যায় না। যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতির প্রভাব পড়ে গ্রামে সেই একই সময়ে সাঁওতাল গ্রামগুলিতেও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ফলে অত্যাচারিত সাঁওতালরা সশস্ত্র পুলিশের সামনে তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে স্লোগান করতে থাকে 'ষোলো জেলায় মুক্তি চাই'। এস. ডি.ও-এর সামনে সাঁওতালরা একগুচ্ছ দাবি তোলে। দাবিগুলি হলো-

১. চাই আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্বীকৃতি।

২. জনবিরোধী শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন ও বড় বড় বাঁধ নির্মাণের ফলে ঝাড়খণ্ডিরা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করেত হবে।

৩. সমস্ত ঝাড়খণ্ডি ভাষাকে ৮-নং অনুচ্ছেদে স্বীকৃত দিতে হবে।

৪. জমি, অরণ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে প্রাচীন গ্রামপঞ্চায়েত এবং পড়া, পট্টা, মাঝি পরগণার প্রথার কার্যকরণ করা।[১১৫]

বস্তুত সাঁওতালদের দাবিগুলি সরকারের কাছে বিশেষ মূল্য পায় না। এই রকম দাবি সারা ভারত জুড়েই রয়েছে। তবুও সাঁওতালরা জমি ও রাজ্য অধিকারের আন্দোলন সমানভাবে করতে থাকে। 'দ্বৈরথ' উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের চিত্র খুব কম থাকলেও ঔপন্যাসিক 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে রাজনীতি ও লড়াইয়ের ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয়েছে অভিনব ও নাটকীয়রূপে। মহুলবনী গ্রামে বিডিও

সাহেব, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রহ্লাদ টুডু, পঞ্চায়েত মেম্বার কালাচাঁদ হাঁসদা ও গ্রামের লোক মিলে মিটিং হয়। এই মিটিং-এর নোটিশ জারি করে সনাতন, তার উদ্যোগেই এই মিটিং আয়োজন হয়। বি.ডি.ও সাহেব গরিব মানুষদের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ছ'হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সঙ্গে তিনি কৃষিভিত্তিক স্কিম, ব্যবসা করার স্কিম ও আই.আর.ডি.পি স্কিম চালু করেন। কিন্তু সনাতন স্কিমের তালিকাগুলি যখন দেখে, তখন সে মাত্র বাইশজনের নাম দেখতে পায়। স্বভাবতই বি.ডি.ও সাহেব চলে যাবার পর সনাতন প্রধানের বিরুদ্ধে ঝামেলা করে। সনাতন স্কুল মাস্টার, গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন মিটিং-মিছিল করে। তাই নীলমণির মিটিং-এ যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হয় সনাতনকে। নীলমণির মিটিং এর সার কথা হলো- আদিবাসীদের নিজস্ব রাজ্য গঠন করা। সেই উদ্দেশ্যে সনাতনকে ডাকা হয় কারণ সনাতন বি.ডি.ও অফিসের সামনে প্রতিবাদ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সে ছোটনাগপুর আর রাঁচির খবর শুনেছে। তাই সনাতন খুব উত্তেজনায় মিটিং যোগদান করতে চায়।

তিরিশে জুন সাঁওতালদের হুল দিবস রেলাগেড়িয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হয়। হুল দিবসে উপস্থিত ছিলেন বি.ডি.ও সাহেব, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এছাড়া গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তি। এই সুযোগে সনাতন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়। সে সাঁওতাল সমাজের বীর সিধু-কানুর ইতিহাসের কথা বলে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের কথা বলে। তারপর সে ভাষণ দেয় মহুলবনী গ্রামের জমিজায়গা কীভাবে দিকুরা দখল করছে, সরকারের স্কিমগুলো থেকে গরিব মানুষ কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সব শেষে সনাতন বলে- 'আদিবাসীরা নিরীহ জাতি, তারা গরীব, কিন্তু তাদের প্রতি আজো অত্যাচার অব্যাহত আছে। তাদের জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ সেই টাকা ঠিকমতো খরচ হতে দিচ্ছে না। আদিবাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা ঠিকমত পৌঁছেও দেওয়া হচ্ছে না বাইরের জগতের

কাছে।'[১১৬] তবে সরকারি অফিসারের সামনে রাজনৈতিক ভাষণ দেওয়ার জন্য স্কুলের মঞ্চ ছন্নছাড়া হয়ে যায়। তাই সনাতনের ভাষণে আদিবাসী মানুষ দুই দলে ভাগ হয়। ইতিমধ্যেই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন নিয়ে বিনপুর, লালগড়, বেলপাহাড়ির দিকে মিটিং হয়েছে। সরকারি অফিসারও বুঝে গেছে মহুলবনী গ্রামেও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে।

ঝাড়গ্রাম থেকে সনাতনের কাছে খবর আসে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবিতে রাস্তা অবরোধের। এই দিকে লখন হাঁসদার মতে সনাতন নিরীহ লোকগুলোকে মিথ্যে লোভ দেখিয়ে নতুন রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু পৃথক রাজ্য গঠন করা সহজ ব্যাপার নয়। শুধু অবরোধ, হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল ছাড়া কিছুই হয় না। লখন হাঁসদাকে বিন্দু মাত্র পাত্তা না দিয়ে সনাতন খড়িকামাথানির মোড়ে যায়, সেখানে প্রায় দু'শো জনের মতো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে একটা আনন্দের ধারা চলে এসেছে, তাদের ধারণা নতুন রাজ্য হলে জঙ্গল তাদের হয়ে যাবে। তারা জঙ্গলে যখন খুশি শিকার করতে পারবে। সনাতন তার দলবল নিয়ে অবরোধ করে। আর পুলিশের গাড়ির সামনে তাদের স্লোগান ছিল- 'ষোল জেলার মুক্তি চাই' ও 'খাড়খণ্ড রাজ্য চাই।' প্রায় চার'শো জনের মত লোক জড় হয়, তারা সবাই মিলে স্লোগান তোলে। পুলিশ ফায়ারিং করতে পারে না, কারণ এর আগেই গড়বেতা, কেশিয়ারী, লালগড়ে পুলিশের সঙ্গে আদিবাসীদের সংঘর্ষ হয়। তাতে বহু লোক নিহত হয়। তাই এখানে বাধ্য হয়ে পুলিশ সরে যায়। দু'দিন ধরে অবরোধ চলে। এরপর নীলমণির শুভেচ্ছা বার্তা সনাতনের কাছে চলে আসে। সনাতন ঘন ঘন ঝাড়গ্রামে যায়, নীলমণির সঙ্গে বার বার মিটিং করতে থাকে, রাঁচি ও ছোটনাগপুরেও ঘুরে আসে। তারপরেই মহুলবনী গ্রামে পুলিশের গাড়ি ঢোকে, সনাতনকে খুঁজে বেড়ায় পুলিশ। রাস্তার মধ্যে পুলিশ নিরীহ মানুষদের ধরতে শুরু করে। ফলত ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের বিদ্রোহীরূপ আরও বেড়ে উঠে। 'ফুরগৌল' শব্দটা গোটা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়। রাস্তা অবরোধের দিনে বিনপুর, লালগড়, বেলপাহাড়ী প্রভৃতি

অঞ্চলে জনতার উত্তেজনা লাগামছাড়া হয়ে পড়ে। ফলত গোটা রাঁচি ও ছোটনাগপুর অঞ্চল তোড়পাড় হয়ে যায়। সনাতনও নীলমণির সঙ্গে রাঁচি যায়, সেখানেও সবার মুখে শুনতে পায়- ‘আদিবাসীদের দেখ্ভাল আদিবাসীরাই করবে। ষোল জেলার মুক্তি চাই।’ সনাতন টুডু সব সময় খবর রাখে সরকারের স্কিমগুলো কতটা কাজে লাগানো হচ্ছে। এখন তার বিরোধীপক্ষে কাজ করে প্রহ্লাদ টুডু। পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য হলে আদিবাসীদের কতটা সুযোগ সুবিধা হতে পারে, তার আন্দাজ প্রহ্লাদ ধরতে পারে। অথচ সনাতন মনে করে আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে, তারা বেশিরভাগই অ-আদিবাসী মানুষ। তারা আদিবাসী সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষমতা বাড়াতে চায়। এতে আদিবাসীদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার কথা নয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আদিবাসীদের মুক্তি আসবে। আদিবাসীরা নিজের মতো করে নিজেদের রাজ্য পরিচালনা করবে। আদিবাসীদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দিকুরা রাজনীতি করে। তাই সনাতন আরও বলতে থাকে প্রহ্লাদকে- ‘এইসব প্রশাসনের লোক, যারা আমাদের ভাষা বোঝে না, রীতি জানে না, আমাদের এ-দেশের লোক বলে ভাবতে পারে না, ‘ট্রাইবাল’ বলে মনে-মনে ঘেন্নাই করে, তাদের তাঁবেদার হয়ে আর থাকতে রাজি নই। প্রশাসন থাকবে নিজেদের লোক। নইলে ওই আই আর ডি পি-র টাকাই হোক, ফরেস্টের দাবিই হোক, কখনোই আমরা নিজের অধিকার বুঝে নিতে পারব না।’[১১৭]

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দ্বৈরথ’ ও ‘মহুলবনীর সেরেঞ’ উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সম্পর্কে যে তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায় তা আসলে বিক্ষিপ্তরূপে। ‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসে মাত্র একটা অংশে সাঁওতালদের ‘ষোল জেলার মুক্তি’ ও ‘ঝাড়খণ্ড রাজ্য’ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের ঝামেলা হয়। তারা চোদ্দ-দফা দাবি নিয়ে পথ অবরোধ করেছিল। তারপর এই আন্দোলনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কিংবা আন্দোলন কীভাবে কোথা থেকে শুরু হয়েছে- সেই সম্পর্কেও আলোচনা নেই। ‘মহুলবনীর সেরেঞ’ উপন্যাসেও দেখা যায় সনাতন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের

সঙ্গে যুক্ত হয়। সে গ্রামের মানুষকে রাজনীতির গুরুত্ব বোঝায়। রাস্তাঘাট অবরোধ ও আন্দোলন করে, তারপর এই আন্দোলনের কোনো চরিত্র পাওয়া যায় না। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপনা করেছেন। যার মাধ্যমে ঘটমান সময়ের বাস্তবতা, চরিত্র ও পটভূমির আখ্যান খণ্ডিতরূপে ফুটে উঠেছে।

সত্তর দশকের অন্যতম ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র, তাঁর সাহিত্যচর্চার জগৎ বিপুল। তাঁর গল্প উপন্যাস জুড়ে রয়েছে আদিবাসী মানুষের সংগ্রাম, লড়াই, সংস্কার, মিথ ও পুরাণ কথা, আদিবাসী জীবনকে নতুন রূপে অনুমান ও অনুসন্ধান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যায় তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন আখ্যানের কথনে কিংবা চরিত্রের বলনে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামীণ জীবনের আদিবাসী বিশ্বাস ও সংস্কারকে আখ্যানের রূপরীতিকে বৈচিত্রময় করে তুলেছে তাঁর সাহিত্য ভাবনা। একটা ভৌগোলিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে আদিবাসী জীবনের ভাষাগত গরিমা, জীবনচিত্রের সারল্য ও বাস্তব জীবনের বিপুল সংগ্রহ তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র। যে বিশ্বাস ও সংস্কারে বেঁচে আছে আদিবাসী সমাজ, সেই বিশ্বাসের শিকড়কে তিনি তুলে এনেছেন উপন্যাসের কাহিনিতে। ফলত তাঁর আখ্যানের রূপরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলা কথাসাহিত্যে। তাঁর বেশ কিছু জনপ্রিয় উপন্যাস থাকলেও ‘জানগুরু’(১৯৯৫) উপন্যাস ব্যতিক্রম। কেননা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ভারতেও আদিবাসী মানুষ বেঁচে আছে প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারে। আদিবাসীদের লোকবিশ্বাস ও সংস্কারকে তুলে ধরার জন্য ভগীরথ মিশ্র উপন্যাসের নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা দিক বোঝা যায় এই উপন্যাসের ভাষা, চরিত্র, কাহিনির বয়ান, গঠন-কাঠামোর নিরিখে। ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র এই উপন্যাসের কাঠামো সাজিয়ে তুলেছেন ছোট ছোট শিরোনামকে কেন্দ্র করে। প্রতি শিরোনামের মধ্য দিয়ে কাহিনি ও ঘটনার পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার জন্য ঔপন্যাসিক

কাহিনির সামঞ্জস্যকে বজায় রেখেছেন। উপন্যাসের শিরোনামগুলি হলো- সব সুতার কুড় নাই মিলে/সব বিদ্যা ইস্কুলে নাই পড়ায়, পচু বাউলের জনসংযোগ, রুধরা বুডি ওরফে কাসি বুড়ির চাক, বাউরী পাড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে হরিণ বাউরীর দুশ্চিন্তা, আচার্যি বাড়িতে গুপ্ত শিবের পূজা, ফুলমতী সুন্দরী সংবাদ, কুমতি বনাম সুমতি, মানদা শিকারীর কোনও হাঁটুতেই মালাই চাকি নেই, যুগজিৎ স্যারকে ডাইনই খেয়েছিল, নন্দ রায়ের বাড়ির অগ্নিরহস্য, স্বপ্নে দেখা দেবতার সন্ধানে, ও সি লো, যাব পোরকুলের মেলাত্যে/অমন টুসুর মেলা ত' আর নাই বটে এই জেলাত্যে, ঘাতক বধ্য যখন পরস্পর সমব্যথী, সইয়ে সইয়ে দিতে হয় নুনের সেক, সুন্দরীর সুখ অসুখ, ফুলমতীর মনে মংলার স্মৃতি : এক চোখে রক্ত অন্য চোখে জল, ছাত্রী করে দুরু দুরু/রায় দিলেক জানগুরু/কেমন কইর্ বাঁচি বল, খুল্যেছে ডাইন-ধরা কল, নন্দ রায়ের বিত্ত-রহস্য, রাত জাগে ফুলমতী, সুন্দরীর রাগ-অনুরাগ, ষোল-আনার আদালত, ভূত নামাল পচু বাউরী, পচু বাউরীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চোরের উপর বাটপারি, দেবস্থানে ভুট্টা বপণ, ধন কুদরার রোষ, গদাধর রক্ষিত শুধু ডাইন খুঁজে বেড়ায়, বাউরী কুলের অবতার, রায় বাড়ির অগ্নি-রহস্যভেদ, উন্মাদিনীর জবানবন্দি, যেই ডালে বাসা বান্ধি, বাসা ভাইঙ্গে পড়ে, মেঘ জম্যেছে, জামপাকা কালো লো/ মেঘের মধ্যে বিজুলী ঝালকাল লো, সঙ্কটকালে পাশে দাঁড়ায় সুন্দরী, গভীর রাতের ডাইন লাচ, গুপ্ত কালীর পূজা, ভূত ছাড়লেও ওঝা ছাড়ে না, জন কুদরা হইলে সহায়/ আটকড়িও বাচ্চা বিহায়, আরতির আত্মবিলাপ, ভূত থাকে গাছেতে, ভুতের নাচের সন্ধানে, ফুলমতীর অন্তিম রাত ও ফুলমতীর নাকে মংলার শরীরের ঘ্রাণ। এধরনের উপ-শিরোনামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আদিবাসী সমাজের শিকড়কে তুলে ধরা। মানব সভ্যতার বিবর্তন হলেও অতীতের বিশ্বাস ও লোকাচার মানুষের মনে গ্রথিত রয়েছে। যা উপেক্ষা করা যায় না, সেই বিশ্বাস বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি যুগে নিতান্ত অন্ধ বিশ্বাস রূপেই চিহ্নিত হয়েছে। সেই অন্ধ বিশ্বাসে মানুষের সুখ শান্তি নেই, আছে শুধু হিংসা আর ক্ষমতার লোভ লালসা।

গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিবিদ্যার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য, শুধু পার্থক্যই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সমাজ ও সভ্যতায় মানুষের মুখে মুখে রচিত বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে অশিক্ষিত মানুষের, ধনীর সঙ্গে গরিবের, শাসকের সঙ্গে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বারবার চিহ্নিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। তারই বর্ণনা পাওয়া যায় 'জানগুরু' উপন্যাসের শুরুতেই। মুক্ত পৃথিবী বলতে কী বোঝায়, তার আভাস পাওয়া যায় উপন্যাসে। মুক্ত পৃথিবীর আঙ্গিনায় অবস্থিত সীমাহীন আকাশ, নদী, নালা, বন, পাহাড়, ডুংরী, ক্ষেত বিলের মতো যুগ-যুগান্তরের পরিবেশ। এই বিস্ময়কর পৃথিবী কোনো একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে আদিবাসী সমাজ। আদিবাসী বাউরি সমাজের রূপকার ছতর বাউরী, এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। এই উপন্যাস জুড়ে বাউরি সমাজ এবং তাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে ছতর বাউরী। শুধু বাউড়ী সমাজ নয়, সাঁওতাল সমাজও বিশ্বাস করে পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার হাতেই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিদ্যমান। অথচ আধুনিক শিক্ষিত মানুষ সেই অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের মধ্যে নতুন চিন্তা চেতনার আগমন ঘটেছে। তারা শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করে। এরকম শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষের পরিচয় মেলে উপন্যাসে, নাম তার মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি, হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক। ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি মানুষ সৃষ্টির কথা বলেন, যেখানে বানর থেকে মানুষ হওয়ার বিবর্তনবাদ উল্লেখ করেন। তার এই বিবর্তন তত্ত্ব আদিবাসী মানুষ বিশ্বাস করে না। তাদের বিশ্বাস কোনো এক সৃষ্টিকর্তা আছেন, যার হাতের মুঠোয় পৃথিবী বিরাজমান।

এই অন্ধ বিশ্বাসের আখ্যানই 'জানগুরু' উপন্যাস। বেঁচে থাকার মূলে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারটায় বড় আকারে দেখানো হয়েছে উপন্যাস জুড়ে। মানুষের রূপেই ধারণ করে আছে বেশ কিছু অশুভ শক্তি। এই অশুভ শক্তির নাম ডাইনিবিদ্যা। এই বিদ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় জানগুরুর হাতে। জানগুরুর বিশেষ ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতার জোরে ডাইনিকে সাব্যস্ত-শায়েস্তা

করতে পারে। ফলত আদিবাসী সমাজে জানগুরুর আধিপত্য বিশাল। আদিবাসী সমাজে ভগবানের সমতুল্য হিসাবে ধরা হয় জানগুরুকে। জানগুরুর মন্ত্র সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। এমনকি সাধারণ মানুষও যদি অযথা বিড় বিড় করতে থাকে তবুও মানুষের বিশ্বাস হয়। তার নিদর্শন পাওয়া যায় সুনুকপাহাড়ীর হাটে। সেই হাটে বহু মানুষের সমাগম হয়। সুনুকপাহাড়ীর হাটে জীবিকার সন্ধানে মানুষের যাতায়াত কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। এই হাটের কোনো এক রাস্তার ধারে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রামের তালপুকুর। সেই পুকুরের পাশেই সাঁওতাল গ্রামের জাহের থান। এই থানের লাগোয়া পচু বাউড়ী প্রথম ভূত দেখেছিল। তারপর থেকে গ্রামের মানুষ সেই স্থানে ভূত দেখতে থাকে ক্রমাগত। হাটের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন শাল বৃক্ষ। এই গাছের তলায় কিনু মাণ্ডি মাথা ঝাঁকিয়ে তালে তালে নৃত্য করে এবং ভূতের বিশ্বাস মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে। বিশ-পঁচিশ জন লোক কিনুর নৃত্য দেখে। লোকজন তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে এবং কিনু মাণ্ডি সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে উত্তর দেয়। তার বিনিময়ে সে খুচরো পয়সা পায়। শিব মোড়ের সামনে কিনু মাণ্ডির কাকা সাহেব মাণ্ডি নৃত্য করেছিল কিন্তু বিশেষ লাভ করতে পারেনি। উপার্জন না থাকার কারণে নন্দ রায়ের পাথর খাদানে তাকে কাজ করতে চলে যেতে হয়।

ভূতে বিশ্বাস গ্রামের সকল মানুষই করে থাকে। কেননা তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অভাব। এই রকম এক অশিক্ষিত ব্যক্তির নাম হলো সুধীর লোহার। সে মড়াশোল গ্রামের বাসিন্দা। সেই গ্রামের মানুষ একের পর মারা যায়। শুধু মানুষ নয়, মানুষের সঙ্গে গরুও মারা যায়। ফলত সেই গ্রামের মানুষ আতঙ্কে দিনযাপন করে। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অশুভ শক্তি প্রবেশ করেছে মড়াশোল গ্রামে। তাদের সন্দেহ ডাইনির দিকে। তারা মনে মনে বিশ্বাস করে বাউরীর মা রুধরা বুড়ি হচ্ছে ভূত। তারই নির্দেশে গ্রামের মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর মৃত্যু হয়। রুধরা বুড়ির ডাইনিবিদ্যা নিয়ে সেই গ্রামের লোকের কাছে নানা জনশ্রুতি

পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতির মধ্যে ডাইনিবিদ্যা চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়। মোটের উপর ডাইনিবিদ্যা শেখা সহজ ব্যাপার নয়। এই বিদ্যা ধাপে ধাপে শিখতে হয়। তারই আলোচনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসে দেখা যায় স্বামীর পায়ে সুচ লাগিয়ে রক্ত খাওয়া কিংবা কিশোরী বউয়ের ডাইনিবিদ্যার শেখার পদ্ধতি। গাছে চড়ে মন্ত্র বলে যেত কাউর কামাখ্যা, এক মকর পরব রাতে নিজের একমাত্র ছেলের বউকে বলেছিল তুষার ভাতারের পায়ের তলার রক্ত নিয়ে খেতে। পিঠে খেতে বসেছিল শাশুড়ি ও বউ মিলে। তখন গুড় শেষ হয়ে যায় এবং পিঠে রয়ে যায় দুজনের পাতে। বউয়ের ইচ্ছা না থাকলেও শাশুড়ি বারংবার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে স্বামীর পায়ের পাতায় ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে আসে। সেই রক্ত দিয়ে তারা পীঠে খেয়েছিল সেই রাতে। এবং এখান থেকেই কিশোরী বউয়ের ডাইনি বিদ্যার অভিষেক ঘটে। সেই রাতে ভুতু বাউরির ছাতি ধড়পড় করে, শরীরে জ্বর আসে, খিঁচুনি শুরু হয় এবং ভুতু বাউরি ভাব লীলা সাঙ্গ করে। রুদ্রা পুরীর ডাইনিবিদ্যা বহু বছর বেঁচে থাকলেও বিগত আট বছর বয়সে তার নাতির বেটা হাতেনাতে ধরা পড়ে। তার পরেই ক্ষিপ্ত মানুষ তাকে হত্যা করে। দ্বিতীয় যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তা হলো- শাশুড়ির নির্দেশ বউ কোনোমতেই পালন করতে চায়নি অথচ শাশুড়ি তখন বউকে অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ দিয়েছিল। বউয়ের উপর অত্যাচার করার পরেও ডাইনিবিদ্যা শিখতে বউ রাজি হয়নি। শাশুড়ির সমস্ত রকম অত্যাচারের কথা বউয়ের কাছ থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে। তারপরেই বউ অচেতন হয়ে পড়ে এবং সেই বুড়িকে গ্রামবাসীরা হত্যা করে। গ্রামের মধ্যে এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা দিনের-পর-দিন ঘটেই চলেছে। পৌষ সংক্রান্তির রাতে পায়ের তলায় তিল মাখতে হয়। তার কারণ সেই রাতে পায়ের তলা থেকে ডাইনিরা রক্ত চুষে খায় কিন্তু ডাইনি যত বড় শক্তিমান হোক না কেন পায়ের তলায় তেল থাকলে ডাইনি কোনোমতেই পায়ের তলা থেকে রক্ত চুষে খেতে পারে না। কেউ মন্তরের শক্তিতে, কেউ ডাইনিবিদ্যার্জনে এ ধরনের রক্ত চুষে খায়। আর যারা জানগুরু কিংবা সখা বাবা

আছে, তারা দিনের পর দিন মানুষকে ডাইনি শক্তি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা এই বিদ্যাটা শিখেছে মারাংবুরুর নিকটে। মেয়েদের জুলুম সইতে না পেরে পুরুষরা মারাংবুরুর কাছে গিয়েছিল এবং তারা অভিযোগ জানিয়েছিল যে নারীদের অত্যাচার থেকে তারা বিরত থাকতে চায়। মারাংবুরু তাদেরকে একটা শালপাতায় রক্তের দাগ কাটিয়ে দিয়েছিল এবং তাতেই মেয়ে শাসনের গুপ্তবিদ্যা তারা শিখতে চেয়েছিল। ঘটনাচক্রে পুরুষদের সঙ্গে মারাংবুরুর আলাপচারিতা নারীরা শুনেছিল। সেইরাতে নারীরা বুদ্ধি করে স্বামীদের আদর যত্নে খাওয়া-দাওয়া দিয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে নেশাজাতীয় পানীয় খাইয়েছিল। তারপর সেই রাতে নারীরা পুরুষের পোশাক পরে মারাংবুরুর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। ছন্দবেশী নারীর সামনেই মারাংবুরু পাতার উপরে রক্ত দিয়ে দাগ কেটেছিল এবং সেই বিদ্যাটা মেয়েরা শিখেছিল। মারাংবুরু তাদেরকে পুরুষ ভেবে মেয়েদেরকে বিদ্যা শিখিয়েছিল এবং তাতে পুরুষের উপরে মেয়েদের জোর জুলুম আরও বাড়তে থাকে। পুরুষদের অভিযোগ যখন আরও কঠিন হয়ে উঠল তখন তারা মারাংবুরুর কাছে জানতে চাইলো, সেখানেই তারা পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারে এবং তখন মারাংবুরু তাদেরকে এক বিদ্যা শেখালো, যে বিদ্যার মাধ্যমে তারা মেয়েদেরকে শাসন করতে পারে। তখন থেকেই জানগুরুদের নিয়ন্ত্রণে ডাইনিরা থাকে। এবং ডাইনি ধরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে জানগুরু বা সখা বাবা।

'জানগুরু' উপন্যাসে জানগুরু বা সখা বাবার ভূমিকা অপরিসীম। জানগুরুদের সঙ্গে সমাজের ক্ষমতাবান মানুষের সম্পর্ক গভীরে। ক্ষমতাবান মানুষ যা কিছু বিধান দেয়, তা সখা বাবার মারফতে জনগণকে জানানো হয়। আর সাধারণ মানুষ সখাবাবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। উল্টে সখাবাবার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং খুশি মনে তারা জানগুরুর নির্দেশকে পালন করে। নারীকে ডাইনি চিহ্নিত করার কারিগর জানগুরু। এই উপন্যাসে নারীর মর্মান্তিক ঘটনা পাওয়া যায়। যার সূত্রপাত ঘটেছে ফুলমতীকে কেন্দ্র করে,

উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র। ফুলমতীর প্রিয় পাত্র ছিল ছোট বালক মংলা। এই মংলা চরিত্রের স্মৃতি ফুলমতীর মনে বারে বারে ফিরে আসে। গ্রামের লোক মংলাকে পশু বলে আখ্যা দেয়, তবুও ফুলমতী তাকে খুবই আপনজন ভাবতো। ছোটবেলা থেকেই মংলার আচার-আচরণ ভারী অদ্ভুত ছিল এবং এই পৃথিবীতে এসে মংলা শুধুমাত্র ফুলমতীকে চিনত। মংলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, ফুলমতীর তিরস্কার নিঃশব্দে শুনত। ফুলমতীর সোহাগে-আদরে মংলার বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। কিন্তু তার এই স্বাভাবিক জীবন হঠাৎ করেই উলটপালট হয়ে যায়। মংলাকে গ্রামের লোক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। গ্রামের মাতব্বর মংলাকে অশুভ শক্তি রূপে চিহ্নিত করে এবং মংলাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। অথচ মংলা জানতোই না তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাকে জোর করে বেঁধে দেওয়া হয় এবং বাসের মধ্যে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ি থেকে নামিয়ে ডাঙ্গার উপরে তার পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। তখন মংলার মনে হয় সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিপদ। সে উপলব্ধি করে মরণকাল এসে গেছে। যে করেই হোক সেখান থেকে ছুটতে শুরু করে মংলা। তার পিছনে ষোলআনা লোকজন তাকে বল্লাম দিয়ে খোঁচা দেয়, পাথর দিয়ে ছুড়ে মারে এবং সে প্রাণপনে জঙ্গলের দিকে ছুটে যায়। একটা সময় সে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করে। তারা জঙ্গলের ভিতরে তন্নতন্ন খোঁজার পরেও মংলাকে খুঁজে পায়নি। ফুলমতীও মংলাকে খুঁজতে গিয়ে ছিল জঙ্গলে কিন্তু সেও তাকে পায়নি।

ফুলমতীর স্বামী চুনারাম, এদের সুখের সংসার। তাদের দীর্ঘ দিনের সংসার জীবনে কোনোরকম ঝামেলা হয়নি। তাদের সংসারে যখন থেকে সুন্দরী বলে এক মহিলার আগমন ঘটে, তখন থেকেই তাদের সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দেয়। তাদের সংসারে অশান্তি শুরু হয় সুন্দরীর জন্য। অথচ সুন্দরীর কোনো দোষ নেই। দেখে শুনে সুন্দরীকে ভালো পাত্র খুঁজে দিয়েছিল পীতাম বাউরী। রতনপুরের পরশ বাউরীর লম্বা-চওড়া শরীর, তার সাথে সুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল। সংসারের ঘরদুয়ার সুন্দরী সাজিয়ে তুলেছিল। ঘরের দেওয়াল ও

উঠোনকে সে নানারকম আলপনার মাধ্যমে সুন্দর করে রং করেছিল। সুন্দরী তার স্বামীকে অনেক ভালোবাসতো। তার কোনোরকম দোষ ছিল না, দোষ বলতে বিয়ে হওয়ার চার বছর পরেও কোনো সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের আশায় কবরস্থানে জল-পড়া, তেল-পড়া, ঠাকুর থানে মানসিক দেওয়া কোনও কিছুকেই বাদ দেওয়া হয়নি। তবুও তার সন্তান হয়নি। চার বছর পরে হঠাৎ করেই তার স্বামী মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পরে ফুলমতী বাপের বাড়ি কুসুমডংরিতে ফিরে আসে। স্বামী হারা মেয়ে সুন্দরী, হাড়মাসড়াতে তার মামাবাড়ি, সেখানেই তার ছোটবেলা কেটেছে। ফলত মামাবাড়িতেই আবার নতুন করে থাকতে শুরু করে সুন্দরী। সে নতুন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে বর্তমানে। অতীতের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে সুন্দরী নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে সবার সঙ্গে কথা বলে এবং হাসিখুশি থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার আনন্দ হারিয়ে যায় মানুষের কথা ভেবে। মানুষের আচরণ দেখে সুন্দরী চিন্তিত অথচ সুন্দরী বিশেষভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না। সুফলের সঙ্গে তার একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু সুন্দরীর জমিজায়গার প্রতি লোভ বাড়ে চুনারামের। চুনারামের রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হয়। যেভাবেই হোক তার স্ত্রী ফুলমতীকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হবে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে চুনারাম মোড়ল পীতাম বুড়ার সঙ্গে গভীরে আলোচনা করে।

তারপরেই উপন্যাসের কাহিনি পরিবর্তন হতে থাকে। হঠাৎ করে যেন মানবিক ফুলমতী অশুভ শক্তির নারী হয়ে উঠল। ফুলমতীও জানে তাকে যদি ডাইনি রূপে চিহ্নিত করা হয় তাহলে তার রক্ষা নেই। সেই কারণেই ফুলমতীর ঘুম উড়ে যায়। গ্রামের লোক ডাকিনি হিসেবে তাকে চিহ্নিত করলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। কেননা ফুলমতী ছোটবেলা থেকেই দেখেছে বহু ডাইনি হত্যার ঘটনা। পশুপতির সন্তান মারা যায় এবং খবর পেয়ে অনেকেই চলে যায় সেখানে, কিন্তু নিঃশব্দে ফুলমতী দেখেছিল এবং তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তার পায়ের তলা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল শক্তি। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে বসে পড়লো ফুলমতী,

কিছুক্ষণ পরে মৃত বাচ্চাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শিলাবতী তীরে মহাশ্মশান, সেখানেই প্রাচীন শিমুল গাছের মধ্যে শকুনদের বসবাস। চারিদিকে খড় পুড়িয়ে বালি উঠছে বিস্তীর্ণ বালুচরে। পোড়া কাঠ, কলসি ছড়ানো ছেটানো জিনিস রয়েছে শ্মশানে। সেই আগুনে বাচ্চাকে দাহ করার সময় বিকট গন্ধ হয় এবং পড়ন্ত বেলায় গ্রামের লোক বাড়িতে ফিরে আসে। সেই গন্ধর জন্য ফুলমতী গা গুলোতে গুলোতে সে প্রাণপণে ফিরে আসে।

অন্যদিকে চুনারাম ও গ্রামের লোক মিলে সালিশি সভায় বসেছে। বাচ্চার মৃত্যু হলো কী করে, তারই বিচার হয় গ্রামে। সন্ধ্যার সময় রাস্তার ধারে ফুলমতী অপেক্ষায় থাকে এবং সন্ধ্যার আঁধারে চুনারাম নিঃসন্দেহে ঘরে ঢুকে। তখনই ফুলমতী বুঝতে পারে গ্রামের লোক তাকে ডাইনি সাব্যস্ত করেছে। তারা যা বিধান দিয়েছে বিচারে, তা বাস্তবায়ন ছাড়া উপায় থাকে না। উলটে চুনারামের কথা কেউ শুনেনি। চুনারাম জরিমানা দিতেও রাজি হয়েছিল কিন্তু গ্রামের লোক ফুলমতীকে মেরে ফেলবে বলে অনড় থাকে। সেই অন্ধকার রাতেই চুনারাম আবার পীতাম জেঠার কাছে যায়। আর ফুলমতী ঘরের মধ্যে একা বসে থাকে। সেই সময় সুফল মুর্মু তাকে পালাবার জন্য নির্দেশ দেয়। সুফলের কাছ থেকে আসল ঘটনা জানতে পারে ফুলমতী। সুন্দরীর সাথে চুনারামের বিয়ে হবে। এই কারণে ফুলমতীকে ডাইনি সাব্যস্ত করা হয়। সুফলের সহযোগিতায় ফুলমতী ঘর থেকে খুলিয়ামনির জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। খুলিয়ামনির জঙ্গলে এক প্রাচীন কুচিলা গাছের চারেপাশে ছোট ছোট গাছ-পাথর-ঝোপঝাড়ে ফুলমতী বসে থাকে এবং তার পাশেই একটা গর্ত আছে। সেই গর্তের সামনে গিয়ে ফুলমতী নাকের উপর একটা গন্ধ পায়। মংলার গায়ের গন্ধ যেন সেই গর্তের মধ্যে তার ভারি চেনা মনে হয়। রোদ-বৃষ্টি যেখানে হোক না কেন এই আশ্চর্য একটা গর্ত এবং এই গর্তের মধ্যে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে মংলার শরীরের ঘাম যেন রয়েছে। এই মুহূর্তে সেই চেনা গান তার স্মৃতিতে বারেবারে ঘুরতে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে গর্তের মধ্যে ফুলমতী বেঁচে থাকে। গর্তের গভীরতা বিশেষ

নেই। গুটিসুটি করে সে বসে থাকে। তার মুখখানা যেন খেলনা বাঁদরের মতো ওঠানামা করে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সে বেঁচে আছে এবং সে শুনতে পায় মানুষের চিৎকার। গ্রামের লোক জঙ্গলের দিকে তার পিছনে পিছনে পিছনে ছুটে চলেছে। আর ফুলমতীর মনে পড়ে যায় তার ছোটবেলাকার মংলা ও সুন্দরীর কথা। সবকিছুই যেন তার কাছে ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে উঠে। গ্রামের লোক অন্ধকারেই তীর ছুড়ে মারে, ফুলমতীর স্বামী চুনারামও তাকে তীর দিয়ে মারার চেষ্টা করে জঙ্গলে। চুনারাম ফুলমতীকে বারেবারে ডাক দিয়েছে কিন্তু সে কোনো মতেই শোনেনি। জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটিয়েছে সুফল মুর্মুর অপেক্ষায়। যতক্ষণ না সুফল আসছে না ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে থাকে। এভাবেই যেন তার জীবন বেঁচে থাকে।

এই উপন্যাস জুড়েই ডাইনিবিদ্যা ও ডাইনিহত্যার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাড়মাসড়া গ্রামের আশেপাশে অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে ডাইনিরা বসবাস করে বলে লোকশ্রুতি আছে। হাড়মাসড়া গ্রামের মনসারামের মতে রাতের বেলায় তারা ডাইনির নৃত্য দেখতে যায় জঙ্গলে। সেই জন্যই হাড়মাসড়া হাইস্কুল মাঠে সবাই সুফল মুর্মুর জন্য অপেক্ষা করে। তারা খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের দিকে যায়। মনসারামের দলে আটাত্তর জন মানুষ আছে তারা ডাইনির নাচ দেখার জন্য অনেক আগ্রহে বসে থাকে। গভীর রাতে ডাইনির আসর বসে এবং তারা ঝোপঝাড় জঙ্গলে বসে ডাইনিদের নাচ দেখবে। তারা শিকারীর নাম করে গিয়েছিল কিন্তু ডাইনি নাচ দেখতে পায়নি। তবে 'জানগুরু' উপন্যাসে ডাইনি বিরোধী আন্দোলন অল্পবিস্তর উঠে এসেছে। বিশেষ করে উপন্যাসের অন্ত্যভাগে ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পার্সাল কিস্কু, মহাদেব হাঁসদা, গুরুদাস মুর্মু, বালিশ্বর সরেন, কলেন মান্ডি আরও অনেকেই আছে যারা বাঁকুড়া থেকে ডাইনি বিরোধী নেতারা আসে হাড়মাসড়া গ্রামে। বিশেষ করে বাঁকুড়ার সুবল টুডু ও ঈশ্বর হাঁসদা ডাইনি বিরোধী নাটক লিখেছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানে ওই

নাটকটি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু হাড়মাসড়া গ্রামের মানুষের কাছে প্রচার পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই সেই গ্রামে ডাইনিহত্যার ঘটনা লাগাতার চলে।

ভগীরথ মিশ্রের ‘জানগুরু’ উপন্যাসে গ্রামের রাজনৈতিক ব্যভিচার, অন্ধবিশ্বাসের ব্যবস্যা ও সমাজ অবক্ষয়ের চিত্র ভয়ংকর রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতে অবস্থিত আদিবাসীদের অকথিত ঘটনা উঠে এসেছে সভ্য সমাজের পরিবেশে। আদিম অরণ্য মানুষের শাসক-শোষিত মানুষের অকথিত আখ্যান যেন নতুনরূপে চিহ্নিত হয়েছে। লেখক সমাজ সতেচনতার ভূমিকা পালন করেছেন ‘জানগুরু’ উপন্যাসের মাধ্যমে। আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাসের বিধানে বহু নিরীহ নারীর জীবন অকালে বিনষ্ট হয়ে যায়। আদিবাসী সমাজে নারীর স্থান উঁচুতে থাকলেও ডাইনি অপবাদে বহু নারীর হত্যা ক্রমাগত চলছে। বাস্তবে নারীদের করুণ ঘটনাকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন লেখক। যেখানে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নারীর দুঃখ যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। অসহায় সাঁওতাল নারী যেন প্রতিবাদ করতে পারে না। বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয় ডাইনির মতো ভয়ংকর প্রথাকে। তার পরিণাম মৃত্যু, তার বিকল্প পথ নেই বললেই চলে। কিন্তু ‘জানগুরু’ উপন্যাসে বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র ফুলমতী। ঔপন্যাসিক ফুলমতীর জীবন কাহিনিকে পরিস্ফুট করার জন্য বহু ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন। আদিবাসী সমাজের গঠন প্রণালী থেকে শুরু করে আদিম বিশ্বাসের আরাধনা পর্যন্ত। ভগীরথ মিশ্র দেখিয়েছেন আদিবাসী সমাজের গঠন প্রণালী থাকে মাতব্বরদের হাতে। তারাই নির্ধারণ করে সমাজের সমস্ত রকম বিধির বিধান। মাঝখানে শুধু জানগুরু কিংবা সখা বাবার ভণ্ডামি। অথচ জানগুরুর ভণ্ডামি আদিবাসী সমাজের মানুষ বুঝতে পারেনি। আর তারা বুঝতেও চায় না। বরং তারা খুশি মনে গ্রহণ করে জানগুরুর সিদ্ধান্তকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় আধুনিক শিক্ষার অভাব। উপন্যাসের শুরুতেই ভগীরথ মিশ্র দেখিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন লোকবিশ্বাসের পার্থক্য। আদিম অন্ধবিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরেছেন

ধাপে ধাপে। প্রথমে ডাইনিবিদ্যা চর্চার বৃত্তান্ত। তারপর ডাইনি হত্যার ভয়ংকর দিক। যেখানে মংলার মতো নিষ্পাপ বালককে হত্যা করা হয়। মংলার পরিণাম যেভাবে শেষ হয়েছে, ফুলমতী চরিত্রের পরিণামও অনেকটা একইরকম। ঔপন্যাসিক মাংলা চরিত্রকে ডাইনি হত্যার প্রথম দৃশ্য হিসাবে উপস্থাপন করেছেন আর ফুলমতীর মর্মান্তিক ঘটনাকে উপন্যাসের অন্তিম পর্যায় হিসাবে তুলে ধরেছেন। উভয় ঘটনার মধ্যে মিল থাকলেও যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মংলার পাশে সেদিন কেউ ছিল না, পরোক্ষভাবে ফুলমতী মংলার পাশে ছিল। কিন্তু ফুলমতী মংলার প্রাণকে বাঁচাতে পারেনি। অন্যদিকে ফুলমতীর সেই ভয়ংকর রাতে সুফল মুর্মু পাশে ছিল। সে ফুলমতীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ফুলমতীর প্রাণ বেঁচে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভগীরথ মিশ্রের শিল্প দর্শন উচ্চমানে পরিণত হয়েছে। এখানে তিনি মানুষের প্রাণকে বেঁচে থাকার নিধান দিয়েছেন। অপর প্রান্তে লেখক অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি লাভের উপায় জানিয়েছেন। লেখক ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি লাভের আশা প্রকাশ করেছেন।

সত্তর দশকের অন্যধারার লেখক হলেন নলিনী বেরা। গ্রাম জীবনের কালপ্রবাহকে তিনি তুলে ধরছেন উপন্যাস জগতে। তাঁর বাড়ির আশেপাশে অবস্থিত সাঁওতালদের নিয়ে বেশ কিছু জনপ্রিয় আখ্যান পাওয়া যায়। এধারার অন্যতম উপন্যাস হলো ‘শাল মহুলের প্রেম’, এই উপন্যাসের ‘যৌবন মেলার সন্ধানে’ অংশে ‘নলিনী বেরা সাঁওতালদের বিভিন্ন রীতিনীতি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এই রকম একটি রীতির নাম হলো সাঁওতালদের ‘দাঁশাই’ নাচ। ‘দাঁশাই’ নাচের মূলে আছে ‘ভুয়াঙ নাচ’। ‘ভুয়াঙ নাচ’ বিজয়া দশমীর দিনে হয়। ‘ভুয়াঙ নাচ’ এর মূল গানটি হলো- ‘হায় রে! হায় রে! অকারেদ হো গুরু হো ভুয়াঙ জানাম লেন–’। এই গানের উদ্দেশ্য হলো শোক প্রকাশ করা। কীসের কারণে শোক প্রকাশ করা হয়। সেই কারণগুলি মঙলু অনুসন্ধান করেছে। সাঁওতালদের লোককাহিনি অনুসারে দেখা যায় যে, সাতভূম অঞ্চলে হুদুড় দুর্গা নামে সাঁওতালদের এক রাজা ছিল। দয়ালু রাজা প্রজাদের খুব

ভালবাসতো। রাজা প্রজাদের নিয়ে খুব ভাবত এবং প্রজাদের অনেক উপকার করত। তাতে প্রতিবেশী ‘দিকু’ রাজার খুব হিংসা হত। বিজয়া দশমীর দিনে ‘দিকু’ রাজা হিংসায় হুদুড় দুর্গার রাজ্য আক্রমণ করে এবং সাঁওতাল রাজা হুদুড় দুর্গাকে হত্যা করে। সেই দিন থেকে বিজয়া দশমীর দিনে দিকুরা সাঁওতাল পুরুষদের হত্যা করত। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমীর দিনটি সাঁওতালদের শোকের দিন। আর সেই কারণেই সাঁওতালরা জোট হয়ে নাচ ও গানের মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে।

নলিনী বেরার ‘শাল মহুলের প্রেম’ উপন্যাসের ‘যৌবন মেলার সন্ধানে’ অংশে ‘ইতুৎ সিঁদুর বাপলা’ প্রসঙ্গ এসেছে। সাঁওতাল নর-নারীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে, পুরুষ নারীর কপালে যে কোনো স্থানে ‘সিন্দুর দান’ করতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে ছেলেদের পছন্দ ও চাহিদার গুরুত্বই বেশি থাকে। সাঁওতালদের সহরায় পরবে নাচ গানের সময় পুরুষ জোর করে নারীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে থাকে। দু’জন নর-নারীর মধ্যে দীর্ঘ দিনের ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে, আর সেই সম্পর্ক যদি মেয়ের বাড়ির লোক মেনে না নেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে কোনো মেলায় কিংবা পরবে, এমন কি নাচগানের আসরেও ছেলেটি মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দিতে পারে। তখন মেয়েও বাঁধা দেয় না।

এই উপন্যাসে সাঁওতালদের ‘কাদো ঘাটি’ প্রসঙ্গ এসেছে। কুসুম গ্রামে ‘নামো-কুলহি’র বিয়ের সময়ে বর-কনে ঘরে প্রবেশ করলে নদী কিংবা পুকুরের ধারে ‘কাদোঘাটি’ রীতি পালন করে। সাঁওতাল রীতি অনুসারে সাঁওতাল নর-নারীর অনুষ্ঠান বিয়ের অন্তিম পর্যায় হলো ‘কাদো ঘাটি’ অর্থাৎ বর-কনে এবং তাদের বোন-ভাই– সবাই মিলে নদী কিংবা পুকুর জলে স্নান করতে যায়। সেখানে জলে নেমে এর-তার গায়ে জল ছিটাছিটি করে। বর কনেকে কাদো করে, আবার কনে বরকে কাদো করে। তার পর স্নান করে ঘরে আসার সময় বরকে হরিণ শিকার করতে হয়। কিন্তু হরিণ পাওয়া যায় না বলে বরকে তীর-ধনুক দিয়ে মহুল পাতা

বিঁধতে হয়। অর্থাৎ বর মহুল 'পাতা বিঁধা' করে ঘরে প্রবেশ করে। এটা খুব উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় রীতি।

'যৌবন মেলার সন্ধানে' অংশে নলিনী বেরা পাহাড়পুজোকে কেন্দ্র করে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে নলিনী বেরা মঙলু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জীবনের গভীর দিকগুলিকে স্পর্শ করেছেন। আষাঢ় মাসে মঙলু 'তিরিয়ো' বা আড়বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায় বুড়বুড়ি ঝরণা, কদমডাঙায় ও পাকুড়তলায়। মোষের পিঠে চড়েই মঙলু 'বুরুপূজা' বা পাহাড় পূজা করতে চায়। গত বছরে 'দিশম সেঁদরায়' মোষটাকে নিয়ে যেতে পারেনি কিন্তু এইবারে কানাইসর পাহাড়ের 'পাহাড়পূজা'তে মোষকে নিয়ে যায়। তারই আনন্দে মঙলু বাঁশি বাজায় আর গান করে– 'জজ-দ জইনা ঝামকা ঝীকুর নুলে-দ জইশা থোপা থোপা-।' ঝাড়গ্রাম থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বেলপাহাড়ী। বেলপাহাড়ী আর চাকুলিয়ার মাঝখানে কানাইসর পাহাড়। বহু মানুষ কানাইসর পাহাড়ে পূজা দেখতে যায়। পায়ে হেঁটে কিংবা গরু-মোষের গাড়ি করে মাদল ধামসা বাজিয়ে একদল একদিকে যায়, অন্যদল উলটো দিকে যায়। বেশিরভাগই আদিবাসী সাঁওতাল, কচি-কাঁচা থেকে বুড়োবুড়ি সবাই পাহাড়ের সাতশো ফুট উঁচুতে 'ঠাকুর দেখতে' আসে। 'পাহাড়পূজা'য় জল হাতে মুখ ধুয়ে নেওয়া হয়, সেই জল আবার পান করা হয় যাতে পেটের যাবতীয় রোগ ঠিক হয়। অনেকেই আবার 'মান্‌সিক্‌' করে। পাঁঠা, ভেড়া, 'সাঁভি' (মোরগ), 'সিম হপন' (মুরগীর ছানা), হাঁস, পায়রা বলি বা উড়িয়ে দেওয়া হয়। 'মান্‌সিক্‌' করার পর সাঁওতালরা নানা জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। মেলাতে বিক্রি হয় পাথরের ধূপদানী, পাথরের শিব, পাথরের শিল নোড়া, থালা, পাথরের পানবাটা ও বাটি-গেলাস। কিন্তু সব থেকে বেশি বিক্রি হয় ময়ূয়ের পালক লাগানো তালপাতার পাখা। পাহাড়ের উপরে কেনাকাটার পর পাহাড়ের নিচে 'দেহুরির থানে' পূজা হয়- 'সূর্য ডোবার আগে, আকাশে তারা ফোটার আগেই পূজা সেরে নিচে নেমে আসত 'লায়া'। তার আগে থলিতে ভরে নামিয়ে দিত বলির ধড় ছাড়া

পশুপাখির মাথাগুলো। পূজার জায়গাটা হয়ে থাকত লালে লাল। পূজারীর পায়েও চটচটে রক্ত। একটাও মানুষজন নামতে আর বাকি থাকত না।'[১১৮] 'দেহুরির থানে' পূজার সময়ও সাঁওতালরা মহুল রস পান করে 'লাঁগড়ে', 'দং', 'ঝিকা' ও 'দুংগেড়' গানে 'হেতাং দাঃ দিং হেতাং দাঃ – হেতাং হেতাং দাঃ' মাদলের তালে আনন্দ করে। আনন্দ উৎসবের মাঝেই 'দেহুরির থানে'ও 'মান্‌সিক্' দেওয়া হয়। মঙলু 'মানসিক্' দেয়- 'আমলকী আর ফুল নিয়ে চাতালের ফুটোয় দিল ছুঁড়ে। ছোঁড়া মাত্রই ফুল আর আমলকী তলায় পাতা মঙলুর হাতে এসে পড়ল টুপ্ করে।'[১১৯] কিন্তু লায়ার ফুল ও আমলকী দেবতা গ্রহণ করেনি বলে রাগে দুঃখে ছাগলের 'আঁতি ভাজা' চাট খেয়ে কানাইসর পাহাড় থেকে ফিরে আসে।

'যৌবন মেলার সন্ধানে'র দ্বিতীয় পর্বে সাঁওতালদের 'পাতা বিঁধা' পরবের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। 'পাতা বিঁধা' পরব অনুষ্ঠিত হয় শিলদাতে। অনেকেই এই পরবকে 'শিলদাপাতা' বলে থাকে। শিলদা স্থানটির ইতিহাসগত গুরুত্ব আছে। ইতিহাসে যে 'চুয়াড় বিদ্রোহে'র কথা বলা হয়েছে সেই 'চুয়াড় বিদ্রোহে'র প্রধান ঘাঁটি ছিল শিলদা। 'শিলদাপাতা'র একটা বিশেষ ধারণা আছে, সেটি হলো- যদি কোনো সাঁওতাল পুরুষ 'শিকার' পরবে না গিয়ে থাকে, তাহলে সেই পুরুষ সাঁওতাল সমাজের রীতি অনুসারে বিয়ে করতে পারে না। অবিবাহিত পুরুষ 'শিকার' পরবে যাওয়ার পর 'পাতা বিঁধা' পরবে যেতে পারে। লায়া যখন মঙলুকে 'পাতা বিঁধা' পরবের গুরুত্ব বলে, তখন মঙলুর 'পাতা বিঁধা' মেলা সম্পর্কে উৎসুক বাড়ে। মঙলু ও লায়া দুই বন্ধু মিলে 'শিলদাপাতা'র মেলাতে গিয়ে দেখতে পায় হরেক রকম জিনিস-পত্র বিক্রি হচ্ছে- মাদল-ধামসা, তিরিয়ো-আড়বাঁশি, কেঁদরি, ভুয়াং, চ্যাচ্চেড়ি ঘন্টি, গরুর গলার 'ঠরকা', শিকড়-বাকড়, শতমূলী, চুরকা, বাঘনখী, কানকুলি, মেঢামারী, দধিগড়া, ঘৃত কুমারী, বহেড়া, চিহড়ের মূল, ফল-ফুল, হাড়-গিলের ঠোঁট, বাজপাখির নখ, ঝিঁকুর-কাটা, ঘোড়ার ল্যাজের চুল। বিক্রি হচ্ছে কুমীরের দাঁত, ভালুকের লোম, বাঘের গা-রগড়ানো গাছের ছাল ও ময়ূরের পেখম।[১২০] এছাড়া

ঘোড়ার ল্যাজের চুল, কাঠের হাতা খন্তি, লাউয়ের চাটু, তীর-ধনুক ইত্যাদি। লাইয়া ও মঙলু মেলার জিনিস পত্র দেখতে দেখতে 'ভৈরবথানে' যায়। সেখানে দুজন মিলে 'ভৈরবথানে' সাধুবাবার গলায় নানা রকম আজগুবি কথা শোনে। লায়া ও মঙলু শুনতে পায়- 'ধলভূম গড়ের ঘাটশিলা। ঘাটশিলায় থাকে ওঁড়োদার ভৈরবের ভৈরবী। নাম রংকিনী। রংকিনীর 'থানে' দুর্গাপূজার মহাষ্ঠমী ও মহানবমীতে হয় 'বিঁধা' বা 'বেঁদা' পরব। আর দশমীতে ওঁড়গোদার 'ভৈরব মাড়ো'তে হয় পাতাবিঁধাঁ।'[১২১] ঘাটশিলার পরব শেষে পাতালপথে লায়া ও মঙলু 'মা রংকিনী' দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় –

> রংকিনী ধলভূম রাজার কুলদেবী। থাকে ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার নাম হয়ে গেছে তাই 'রংকিনী ভূম'। সাধুবাবা হেঁইয়ালী করে বলল- 'মিল্লে বা শিখরে পা, সাক্ষাৎ দেখবি ত ধলভূমে যা! মানেটা বলে দিল- মল্লভূমে আওয়াজ শোনা যেত। পায়ের ছাপ পড়ত শিখরভূমে। আর রংকিনীকে চোখের দেখা যেত ধলভূমে। মল্লভূম শিখরভূম ধলভূম মানভূম সিংভূম – এসব নিয়েই সাঁতভূম। সাঁতভূমের সব জায়গাতেই রংকিনী আর রংকিনী।[১২২]

এই রংকিনী নিয়ে লোককাহিনি রয়েছে। সেই লোককাহিনিতে দেখা যায় ধলভূম-মানভূম অঞ্চলে এক রাজা ছিল। সেই রাজার সঙ্গে পঞ্চকোটের রাজার একটা চুক্তি ছিল। রংকিনী 'ভোগ' হিসাবে রোজ একটা করে মানুষ খেত। একদিন এল এক চাষির ছেলের পালা। চাষি কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু গরু বাগাল চাষিকে বাঁচানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়। গরু নিজে যেতে রাজি হয়। সেই দিন গরু বাগাল খুব দেরি করে যায়। এদিকে রংকিনী অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল, ফলে খিদার জ্বালায় রংকিনী রেগে গিয়ে গরু বাগালকে তাড়াতাড়ি খেতে চায়। কিন্তু গরু বাগাল খাওয়ার আগে বলে- 'আমাকে ত খাবেই, তার আগেই এই নাও দুটো ছোলাভাজা খাও!'। বাগাল তখন রংকিনীকে লোহার ছোলা দেয়। লোহার ছোলা খেতে খেতে নাজেহাল রংকিনীর দাঁত ভেঙ্গে যায়। ফলে রংকিনী ভাবল যে বাগাল বড় বীর। তার ভয়ে রংকিনী পালিয়ে যায়।

লায়া ও মঙলু ‘রংকিনী’ মেলা থেকে থেকে আবার ‘পাতা বিঁধা’ মেলাতে যায়। সেখানে লায়া ও মঙলু দেখে সাঁওতালরা আনন্দ করে -

আমের পাঁচটা পল্লব
আর জলভরা একটা ঘটি
জানি না
তুমিই আমার উপর জল ছিটালে কিনা
জানি না
তুমি আমার ভিজালে কিনা।[১২৩]

মঙলু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মেলাতে হাতে ফোন নিয়ে লোকজন ঘুরছে। শিক্ষিত নারীর পরনে শহরের পোষাক। বহু বই পত্র বিক্রি হয়। মঙলু দেখতে পায় ‘খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি’ বই বিক্রি হয়। বইয়ের দোকান থেকে কিছু দূর থেকে এগিয়ে দেখছে যে সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে নাচ করে। নাচের আসরে মঙলু এক নতুন সঙ্গীর সন্ধান পায়। মঙলু বাঁশি বাজায় ও তার সঙ্গী গান করে। এভাবেই গল্পকার নলিনী বেরা মঙলুর জীবন বর্ণনা করেছেন।

গ্রাম জীবনকে কেন্দ্র করে নলিনী বেরার বিখ্যাত উপন্যাস হলো ‘দুই ভুবন’, এই উপন্যাসে দুইটি খণ্ড, ‘ভাসান’ এবং ‘ভাসমান’। প্রথম খণ্ড ‘ভাসানে’র ঘটনা ও বিষয়বস্তু হলো লেখকের গ্রাম ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা। লেখক যেখান থেকে ছোট থেকে বেড়ে উঠেছেন, সেই মাতৃভূমির নানা চরিত্র ও ঘটনাকে এই আখ্যানে উপস্থাপন করেছেন। তার বড় দিদির কাছ থেকে কথকচরিত্র মুনিবাবু শিশুকালের কথাকাহিনি শুনে বেড়ে উঠেছেন। গ্রামবাংলার যাত্রা উৎসবের প্রেক্ষাপট মধ্যযুগীয় রীতিতে বর্ণিত হয়েছে ঘটনার প্রারম্ভে। লেখক দুটি চলমান সময়ের সমাজ ও তার পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন শৈশবকালের সমাজের কাঠামো, জীবনযাপনের ধরন, যৌথ পরিবারের সুখ দুঃখের সংসার, গ্রামের মানুষ ও তাদের নিত্যদিনের কার্যকলাপ ও গ্রামবাংলার শান্ত পরিবেশের সৌন্দর্য। এই আখ্যানের

নিরীক্ষণ বিন্দু চলমান সময়ের জীবনচিত্র। কথক চরিত্র যে ভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছেন, তার সূত্রপাত ধরেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে কথকচরিত্র দেখেছেন পরিবারের মানুষজনকে। মা ও বাবার কলহ, সারদা মাসির দোকান, নাথবাবাজীর আশ্রম, ভুবন জেঠা, প্রমথদা, হরিবাবু, গোপাল হালদার, দীনুমাস্টার প্রভৃতি চরিত্রের ছোট ছোট ঘটনা কথকের বয়ানে ধরা পড়েছে। প্রত্যেকটা চরিত্র লেখকের চেনা জানা মানুষ, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে লেখকের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও এই আখ্যানে অবস্থিত সুনা মুর্ম, ধনা মুর্মু, সুনি সাঁওতাল, সোমাই সোরেন, মোগলা সোরেন, গুরাবুড়া প্রভৃতি সাঁওতাল চরিত্র। বহুজাতির বসবাস এই হদহদি গ্রামে। তাদের পরিবর্তন লেখকের সচেতন দৃষ্টিতে রূঢ় বাস্তবরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যভাগে দেখা যায় অঘ্রাণ কার্তিক মাসে ধান কাটার সময়ে ধনুকাকা পতলি দিত আর গরু দিয়ে ধানমাড়ানোর কাজ চালাত। ধনুকাকার বউ দশরথদের পুকুর থেকে জল আনত। সেই জলে ধানের খড় মিশিয়ে ঘোড়াকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হত। ধনুর বউ একবেলা আর সন্ধ্যাবেলা তার মেয়ে সুনি জল বন্দোবস্ত করত। রাতের সময় ধনুকাকা তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। সুনির যখন অল্প বয়স ছিল তখন গ্রামের ছেলেমেয়ে মিলে খেলা করত। মঙ্গল সোরেন সুনির পিছু নিয়েছিল, চিঁয়াপাড়ার হাটে তারা হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের বয়স হয়েছে। মঙ্গল এখন বিশ বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে, লম্বা লম্বা চুল রেখেছে। দাঁশাই পরবে মঙ্গল ভুয়াং বাজায়। শুধু পরবে নয়, চিঁয়াপাড়ার হাটেও বাজিয়েছিল এবং সেই হাটে মাছও বিক্রি করত। গুড়াবুড়ারটারে পরব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সোরেন মাদল ধামসা বাজানোর সময় সুনির নাচে মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়। সুনি সাঁওতালকেই বিয়ে করবে বলে মন স্থির করে সোরেন। অন্যদিকে ধনুকাকার বউ সোরেনকে পছন্দ করে না। তার মেয়ের সাথে সোরেনের বিয়ে মানতে রাজি নয়। ঘটনার শেষে জানা যায় সুনি সাঁওতাল ও মোগলা

সরেনের বিচ্ছেদ ঘটে। বিষ্টু বাগালের বউ মঙ্গলকে পছন্দ করত। শেষ পর্যন্ত মোগলা সোরেন বিষ্টুর বউ এর সাথে সংসার সাজিয়ে তোলে।

এই উপন্যাসের ঘটনা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক থেকে জটিল হয়ে উঠার সূত্রাপাত ঘটেছিল সরকার থেকে রিলিফ কাজের সময়। হদহদি গ্রামের মানুষ বাঁধের কাজে নিযুক্ত হয়। বাঁধের রিলিফ কাজে মুনিবাবুর চেনাজানা বিস্তর মানুষ খাটে। মলির মা-এর পরনে ছেড়াকুটা থান, আচলে পুঁটলি, পুঁটলিতে রয়েছে চিড়া, নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ ও রসুন। বাঁধের ধারে সুনা সংসার সাজিয়েছে। বহু মানুষের সমাগম, সকলেই কাজে মেতে আছে। রিলিফের কাজ সবে শুরু হয়েছে, কম করে ছ'মাস কাজ হবে। বাঁধের কাজ শেষ হলেই বড়সোল থেকে চাঁদাবিলা রাস্তার কাজ হবে। কিছু দিন পরে বাঁধের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কুলিকামিনরা হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সুনা মুর্মুর দলবল ক্ষেপে যায়। কারণ দু'সের অতি সামান্য গমের বিনিময়ে তারা বাঁধের কাজ করে। যা দিয়ে কুলিকামিনদের সংসারে অন্নের অভাব দেখা দেয়। মুনিবাবু কথক চরিত্র, সরকারের লোক। তার কাছে অভিযোগ না জানিয়ে কাজ বন্ধ করা হয়। মুনিবাবু সুনা মুর্মুকে আবারও কাজের নির্দেশ দেয়। কিন্তু দাবি না মানলে তারা কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের একটাই দাবি গমের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। ছোটরাই, সোমাই, সনা খুড়া সবাই মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দেয় কাজ বন্ধ রাখার। সাঁওতালরা কাজ থেকে বিরত থাকার কারণ সত্য আর শিখাদের উস্কানি। অনিল সুপারভাইজার বি.ডি.ও অফিস থেকে জানতে পারে কুলিকামিনদের দাবি মানা সম্ভব নয়। বি.ডি.ও জানেন কাজ না করলে তাদের পেটে ভাত জুটবে না। তারা বাধ্য হয়ে কাজ করবে।

উস্কানিমূলক ঘটনা থেকেই হদহদি গ্রামের রাজনীতি ও আন্দোলন শুরু হয়। এই ধরনের রাজনীতিতে মাতব্বর সম্প্রদায়ের ভূমিকা যথেষ্ট আছে। এরা সরকারের বিরুদ্ধে সামাজিক অসুবিধাগুলি অভিযোগ করতে থাকে এবং গ্রামে গ্রামে নতুন সংগঠন তৈরি করে।

অশিক্ষিত মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের সংগঠনে যুক্ত করা এদের লক্ষ্য। এদের নীতি হলো মানুষের অর্থ-সম্পত্তি লুট করা এবং সরকারের টাকা আত্মসাৎ করা। যাতে করে তারা সশস্ত্রদলকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এদের আচরণ ও অত্যাচারে হদহদি গ্রামে বেশ কিছু চাঞ্চল্য ঘটনা ঘটে। যা থেকে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের সন্দেহ বাড়তে থাকে, দিনে দিনে গ্রামে আজগুবি ঘটনা ঘটতে থাকে। অঞ্চল প্রধানের ছেলে সত্য ঘর থেকে পালিয়ে যায়। সত্য কেন ও কীসের জন্যে কোথায় পালালো গ্রামের লোক বুঝতে পারে না। সত্য কোথায় থাকে জ্যেঠু জানত। সেই কারণেই মৃত্যুর আগে মুনিবাবু জ্যেঠুকে জিজ্ঞেস করেছিল। জ্যেঠুর মৃত্যু হয় ফলত মুনিবাবু প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেনি। সত্যের উদ্যোগে গ্রামে বড় হাইস্কুল হওয়ার কথা। ফলত স্কুলের কাজ জোর কদম শুরু হয়। কিন্তু সত্য পালিয়ে যাওয়াতে স্কুলের কাজ বন্ধ থাকে টাকার অভাবে।

বেশ কিছু ঘটনা থেকে বোঝা যায় গ্রামের পরিবেশে একদল সশস্ত্রবাহিনী শাসন চালায়। জাহাজকানার জঙ্গলপানে রাতের সময় মানুষের ঘোরাঘুরি। হদহদি গ্রামে প্রবেশ করেছে সি.আর.পি মতো পোশাকপরা সশস্ত্রবাহিনী, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ভিন্ন ধরনের। তাদের মাথায় লোহার টুপি আর হাতে ভিন্ন জাতের বন্দুক। ডিলার সতীশ কাপড়ির গুদাম থেকে গম চুরি হয়ে যায়। অথচ কারা চুরি করলো তা বোঝা যায়নি। থানা থেকে পুলিশ এসে গোপালকে গ্রেফতার করে। এছাড়া গরু, মুরগি, ছাগল, কুমড়ো ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিস প্রায় দিনই চুরি হয়। তিনকড়ি বাগ নদীর ধারে খুন হয়। কালো পোশাকধারী মানুষের মাথামুখ ঢাকা ছিল। গ্রামে পুলিশ আসে তিনকড়ির খুনিকে খুঁজতে থাকে। সতীশ কাপড়ির গুদামচোর সনা মুর্মুকে পুলিশ হাজতে নিয়ে যায়। ডাঙাসাহির গ্রামের প্রিয় দঁড়পাটের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চারিদিকে ত্রাসের যুগ চলে। তিনকড়ি ভূষির খুন হওয়ার পরেও দু'চারটে মানুষ খুন হয়। সত্যদাদা সুনি সাঁওতালদের দলে যোগদান করে। চক্রা মাঝিও মুনিকে গ্রাম থেকে পালিয়ে

যেতে বলে। গ্রামের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়। চক্রা মাঝি বরাবরই জানিয়েছে ভিন্ন দেশের কথা। যেখানে বিরাট নদীর পরিষ্কার জলে, কালবুয়াল, মিরগেল, কাতলা, রুই মাছের মতো বড়ো বড়ো মাছ থাকবে। রাজপ্রসাদের ঘরে রাজা ও রানী থাকবে। সেই স্বপ্নের দেশ ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। মুনিবাবুর প্রিয় সন্নদিও আত্মহত্যা করে। তার প্রেমিক বাসির বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সঙ্গে।

হদহদি জঙ্গলে সত্যের খুন হয়। তার মাথা মুণ্ড কাটা পড়ে থাকে জঙ্গলের ভিতরে। তার উপরে ভার ছিল নিজ জমিদার জোতদার বাবাকে খুন করার। কিন্তু বাবাকে খুন করতে না পারলে দলের লোকেই তাকে খুন করে। হদহদি গ্রামে তপোবন জঙ্গলের ভিতরে রাতের বেলায় বাঁউড়িদের মেলা বসে। সেই মেলায় হ্যাজাক লম্প ও কাঠের আঁচে আলোয় জ্বলমল করে। তখন টুসু গানে গানে বিবাদ কিংবা লড়াই হয়-

বারে বারে বারণ করি লখীধারে যাইও না

টুসু, লদীধারে যাইও না

লদীধারে ছি আর পির ডেরা গ'

ধরতে পেলে ছাড়বে নাই।।[১২৪]

সুনির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মুনি কথক লক্ষ্য করে সুনি সাঁওতালদের সংসার। টুসুর মা হয়ে উঠেছে সুনি। সে মাহাতোদের মেয়েকে যত্ন করে রেখেছে। সুনি সাঁওতালও সশস্ত্রবাহিনী যুক্ত হয়েছে। গ্রামের যাবতীয় খবর রাখে এবং তাদের দলবলকে খবর দিয়ে থাকে। মণিবাবুর সঙ্গে সুনি সাঁওতালের ভালো সম্পর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষিত হয়নি। মুনিবাবুর প্রিয় সত্যকে সুনি সাঁওতালের দলবল খুন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা- এই সময়কালের স্মৃতিচারণা বাংলা কথাসাহিত্যের জগতকে এক নতুন ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এই সময়কাল পর্বে ব্যক্তি

ও সমাজের সংকটকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্যের কিছুটা সময় লেগেছিল। সেই সময় বাংলা ঔপন্যাসিকদের ঝোঁক ছিল অন্য বিষয়ের প্রতি। অর্থাৎ বিষয়গত দিক থেকে শুধুমাত্র বাঙালির জীবনকে তুলে ধরা নয়, সাঁওতাল জীবনকে তুলে ধরার এক প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তরকালে, পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকে প্রকৃতির নিরিবিলি কোলে অবস্থিত সাঁওতাল জীবন নিয়ে নতুন বিষয় ও আঙ্গিকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলা জগত। পাঁচ ও ছয়ের দশকে সাঁওতালদের কয়লাখনির চিত্র উঠে এসেছে, তাতে ভূমিহীন মানুষের আর্থিক সংকট ও সংগ্রামশীল জীবনের স্বরূপ খুব বাস্তবরূপেই চিত্রিত হয়। এই সময় পর্বে বাংলা উপন্যাসে উঠে এসেছে সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম ভালোবাসা, দুঃখ, বিষণ্নতা, ব্যর্থতা, জ্বালা যন্ত্রণার মতো ট্র্যাজিক ঘটনা। সাঁওতাল নর-নারী নিয়ে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধারা তৈরি হয়, এই ধারায় নারী চরিত্রে থাকে সাঁওতাল নারী আর পুরুষ চরিত্রে বাঙালি বাবু। অথচ উভয়ই ভিন্ন জাতের। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এর পরিণতি কি হতে পারে! স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় সমাজের মানুষ এধরনের সম্পর্ককে মেনে নিতে পারে না। সাঁওতাল সমাজের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা আর বাঙালির কাছে জাতিভেদ প্রথা। বাস্তবের ঘটনা যখন সাহিত্যে স্থান পায়, তখন কিছুটা হলেও বাস্তবের বাস্তব পরিবর্তন হয়ে সাহিত্যের নতুন বাস্তব স্থাপিত হয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ উপন্যাসেই দেখা যায় সাঁওতাল নারী দেখতে সুন্দর অথচ গরিব আর বাঙালি বাবু কোনো একজন আমলা কিংবা অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি। আসলে এধরনের উপন্যাসে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাসে সাঁওতালদের বহুস্বর উঠে এসেছে। এই সময়ে সাঁওতালদের অতীত ইতিহাস নতুন করে আখ্যায়িত হয় বাংলা উপন্যাসে। এতো দিন ধরে যে বিষয়গুলি ইতিহাসের পাতায় অবহেলিত ছিল, সেই সমস্ত অবহেলিত বিষয়গুলি উপন্যাসের পাতায় প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু অতীত ইতিহাস নয়, সত্তর দশকের সমকালীন বাস্তব ঘটনাও উপন্যাসের বয়ানে উপস্থিত।

এই ধারা আশি নব্বইয়ের দশকেও অব্যাহত। একুশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা যায় মূলধারার রাজনীতি প্রবেশ করেছে সাঁওতাল জনজীবনে। এতে সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যেই দলাদলি, খুনোখুনি, লড়াই, দ্বন্দ্ব, ঝগড়া করেই প্রকৃতির পরিবেশকে নষ্ট করেছে। এর পিছনে দিকু রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাশীল মানুষের রাজনীতি আছে, যা আসলে সহজ সরল সাঁওতালরা বুঝতে পারে না। একুশ শতকের বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনকে খুব গভীরে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের চেতনায় ব্যাক্তিগত ধ্যানধারণা খুব বেশি প্রকাশ পায়নি, কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ও একুশ শতকের আখ্যানে সাঁওতাল জীবনে ব্যক্তি মানুষের চিন্তাধারা নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৩

২। ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৩

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ৮৩৮-৩৯

৪। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ৫২

৫। চৌধুরী, কমল (সম্পা.), *সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৯৮

৬। তদেব

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০৩

৮। বনফুল, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প,* সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৬৪, পৃষ্ঠা- ২৬

৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৬৭, পৃষ্ঠা- ২১৭৮

১১। দত্ত, দেবাশিস (সম্পা.), *অভিনব বাঙ্গালা অভিধান,* দ্য ইউনিক বুক সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০৭৬

১২। কার্মাটাঁড়ে রয়ে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর, রয়েছে নানা গল্প, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:১২, https://www.anandabazar.com/editorial/vidyasagar-s-last-days-were-not-so-well-1.1049818 , Accessed 12th July, 2020

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ৫৭২

১৪। ঘটক, শ্রীকালীপদ, অরণ্য-কুহেলী, পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ মহালয়া, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা- ২৮৫

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *সপ্তপদী,* তারাশঙ্কর রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২৭৮

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আমার কালের কথা,* তারাশঙ্কর রচনাবলী (দশম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৭৫, পৃ- ৫১৯

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *ইতিহাস ও প্রবন্ধ,* তারাশঙ্কর রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩৬১

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *অরণ্য-বহ্নি,* তারাশঙ্কর রচনাবলী, *অষ্টাদশ* খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ২৬৫

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৬

২০। তদেব

২১। তদেব

২২। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮০

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮১

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮২-৮৩

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৩

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৬

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪৭

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬০

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩১

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৭

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৯

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬৯

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃষ্ঠা- ৫৫৯-৫৬০

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক গ্রন্থাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৬৬

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *দর্পণ,* সেরা মানিক, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা মাঘ ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৩৬২

৩৭। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, *পঞ্চতপা,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ৪১

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৫

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৮

৪২। সত্যজিৎ রায়ের ছবি *অরণ্যের দিনরাত্রি* : পঞ্চাশ বছর পর আবার অরণ্যে – মানবেন্দ্রনাথ সাহা, লিঙ্ক- https://aponpath.com/aranyer-dinratri-abar-aranye-manabendranath-saha/, (তারিখ ২৩-১০-২০২২, সময়- সন্ধ্যা ৭টা)

৪৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অরণ্যের দিনরাত্রি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা- ৫৮

৪৪। তদেব

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৪

৪৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৭

৫০। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ, *দৈনিক কবিতা,* শরৎ-শীত সংকলন ১৯৬৮

৫১। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *তৃণভূমি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৫২

৫২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭০

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭২

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২২৩

৫৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৪

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৪

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ২২২

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৫

৬০। জব্বার, আব্দুল, *মাতালের হাট,* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৬

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৫

৬২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

৬৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

৬৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮

৬৫। দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩ পৃ- ভূমিকা

৬৬। দেবী, মহাশ্বেতা, *আমার কথা,* কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৬৭। দেবী, মহাশ্বেতা, *শালগিরার ডাকে,* রচনা সমগ্র, একাদশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪২২

৬৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩২

৬৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪৬

৭০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫৮

৭১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫৯

৭২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬২

৭৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৫

৭৪। (আমাকে ডাকো তোমাদের বাহা আর সহরায় পরবে/সত্যি বলতে কি দাদা/আমি তোমাদের একজন হয়ে গেছি/তোমাদের পরবপূজার স-ব আমার জানা/সত্যি বলতে কি

দাদা/আমি তোমাদের একজনই হয়ে গেছি/যখন শিকার যাও তখনো ডেকে নিও আমাকে/সত্যি বলতে কি দাদা/আমি তোমাদেরই একজন হয়ে গেছি।), তদেব

৭৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৫-২৬

৭৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৮

৭৭। আমাদের পাশে কেউ দাড়াঁবে না, আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব। আমরা সত্যি বিদ্রোহ করব দেশের মাঝি পরাগণা মিলে। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫৬

৭৮। দেবী, মহাশ্বেতা, *সিধু কানুর ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১, পৃষ্ঠা- ২৪

৭৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১

৮০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৮১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৩

৮২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২

৮৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

৮৪। চৌধুরী, কমল (সম্পা.), *সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৫২

৮৫। দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* দশম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৯৮

৮৬। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়,* জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৪

৮৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১১

৮৮। চক্রবর্তী, মানব, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ১৪০

৮৯। তদেব

৯০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯

৯১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬২

৯২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৩

৯৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৫

৯৪। (তোমার শিক্ষার পথ আমাদের দেখাও, এখানে থেকো না এই অন্ধকার জগতে, সামনের দিকে তাকাও, তোমার শিক্ষায় আমরা আলোকিত হবো) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০

৯৫। (ও ফুল এস/রেলগাড়িতে ওঠো/দুমকা জেলা দেখ/রেলগাড়িতে আমি উঠব না/দুমকা জেলা আমি দেখব না/দুমকা জেলার মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে আছে।) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১

৯৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৬

৯৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮১

৯৮। তদেব

৯৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

১০০। (ঝরণা ঝরে ঝরণা ঝরে/ সহজ সুরে ওড়না ওড়ে। আমাকে দাও গো কাঁটা,/ দাও গো দ্যড়া নক্সাটা। আনবো আমি জলের ধারা/ ঝরণা ধারা হতে।) তদেব

১০১। তদেব

১০২। (এস আদিবাসী বীর সব আমরা উঠে দাঁড়াই। এস আদিবাসী বীর সব আমরা উঠে দাঁড়াই।। ভারাতমাতার স্তন্য পানের জন্য আমরা তৎপর হই/ঘুমিয়ে অচোইতন্য পড়ে থকে/এখন আর নীরব থাকব না/এস আদিবাসী বীর আমরা উঠে দাঁড়াই।। আমরা দুনিয়ার

সঙ্গে লড়াই করব/টাকা শষ্য উৎপাদন করব/দেশে আমরা প্রতিষ্ঠা করব/মান-মর্যাদা-সম্মান।)

তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯

১০৩। (বুকের ভিতর ঝড় উঠেছে/দারুণ দামাল ঝড়/মনের মানুষ কোথায় থাকে/কোন্‌ পাহাড়ের ঘর...) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৩

১০৪। (আমরা তাঁতবুনি/আমরা কাপড় তৈরী করি/আমরা তোমাদের লজ্জা নিবারণ করি/কিন্তু আমাদের লজ্জা কে বাঁচায়।) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬

১০৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

১০৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩

১০৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

১০৮। ঘোষ, দীপঙ্কর (সংকলন ও সম্পা.), *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩৫১

১০৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৩০

১১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

১১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫

১১২। তদেব

১১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯

১১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৬

১১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *দ্বৈরথ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩০৩

১১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহুলবনীর সেরেঞ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৩৪

১১৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭২

১১৮। বেরা, নলিনী, *শাল মহুলের প্রেম,* মর্ডান কলাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ২০১০, পৃষ্ঠা- ১০০

১১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৪

১২০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৮

১২১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৯

১২২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১১

১২৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩

১২৪। বেরা, নলিনী, *দুই ভুবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃষ্ঠা- ১১৬

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন (১৯৪৭-২০১৫)

ব্রিটিশ ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে আদিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্ন হওয়া আদিবাসীদের উপর ইংরেজ সরকার নতুন ভাবে উন্নয়নের কাজ করেছিল, বিনিময়ে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া প্রধান শর্ত ছিল। ইংরেজ সরকার পরিচালিত মিশনারির দল আদিবাসীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতে থাকে। যার ফলে আদিবাসীদের উন্নতি ও বিকাশ শুরু হয়। অর্থের অভাবে আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক হয়ে উঠে। আদিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকটি প্রটেস্ট্যান্ট মিশন কাজ করেছে তাদের মধ্যে তিনটি মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১) আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন, ২) মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি, ৩) চার্চ মিশনারী সোসাইটি।[১] এছাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশনও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে। আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারীরা সাঁওতাল, কোড়া, হো ও মুণ্ডা জনজাতিদের উপর ধর্ম প্রচার করার কাজ শুরু করেছিল। এই সময় থেকেই আদিবাসীদের শিক্ষার প্রসার বিস্তার করা হয়- ভীমপুর গ্রামে সাঁওতাল ছেলেদের একটি হাইস্কুল, মেয়েদের একটি এম.ই.স্কুল এবং কাঠের কাজো তাঁতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হয়। এই স্কুলে বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসতো। এখানেই সাঁওতালি ভাষা দিয়েই পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এই স্কুল আদিবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটির কাজকর্ম শুরু হয় ১৮৭০ সাল থেকে। সাঁওতাল ও অন্যান্য তফশীলি সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করার জন্য মেথডেস্ট মিশন হাসপাতাল স্থাপন করে। হাসপাতালে আদিবাসী রোগীদের চিকিৎসার জন্য সব রকম সুবিধা দেওয়া হত। এই সকল খ্রিস্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের সাহায্য করেছিল যেমন, তেমনি আদিবাসীদের নিজস্ব রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল। ফলে আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই বিভেদ থেকেই সাঁওতাল সমাজে ধর্মের রাজনীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে ধর্মের জন্যে লড়াই করে চলেছে ক্রমাগত। ধর্মের রাজনীতি নিয়ে সুবোধ

ঘোষের ‘চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ’ গল্পে দেখা যায় ধর্ম প্রচার ও প্রসারের রাজনীতি। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের গল্প। অতি সামান্য ঘটনাতেই অসামান্য ব্যাপ্তি গল্পের মননে ও চিন্তনে বিরাজ করে। জন বেসরা, রিচার্ড টুডু, স্টীফান হেরো- নামগুলি বললেই বোঝা যায় তারা আদিবাসী এবং খ্রিস্টান। সকলেই মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র স্টীফান হেরো। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে ইন্দুকেও পরাজিত করে বেশি নম্বর পেয়ে। স্টীফান হেরোর নম্বর দেখে অ-খ্রিস্টান ছাত্ররা প্রতিবাদ করে। স্কুলের একজন বাদে সবাই পাদরী শিক্ষক। স্টীফান খ্রিস্টান বলেই বেশি নম্বর পায়, তারা সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে অভিযোগ করে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। স্টীফান হেরোর চরিত্র বিশেষ বদল হয়নি। গল্পের মোড় পালটে যায় যখন স্টীফান হেরো স্টীফান হেরো এডিশনাল বিষয় হিসাবে ইংরাজির বদলে সংস্কৃত বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে। এই ঘটনায় পাদরীরা ক্ষুণ্ণ হয় আর অদ্ভুতভাবে খুশি হয় পণ্ডিত মশাই। স্টীফান হেরো নিউ টেস্টামেন্ট থেকে নির্ভুল কবিতা আবৃত্তি করে ফাস্ট প্রাইজ পায়। ফাদার লিণ্ডন খুশি হয়ে হেরোকে দারোগার চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়। একদিন ক্লাসের মধ্যে ফাদার লিণ্ডন স্টীফানকে বারবার প্রশ্ন করলে উত্তরে বলে- ‘জানি না স্যার’, তাতে ফাদার রেগে যায়। ফাদারের মুখের উপর তর্ক করা সহজ কাজ নয়, স্টীফান হেরোর সাহস স্কুলের সবাইকে হতচকিত করে তোলে। একমাত্র সংস্কৃত পণ্ডিত মনে মনে খুশি হয়েছিল। আদিবাসী ছাত্রকে নিয়ে সংস্কৃত পণ্ডিত ও ফাদারের মধ্যে ভিতরে ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি হয়। বলা যেতে পারে তার ধর্ম নিয়ে বাঙালি ও মিশনারিদের মধ্যে টানাটানি রাগারাগি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। যার ফলে স্টীফান হেরোর শাস্তি হিসাবে পরীক্ষার মূল্যায়নে প্রভাব পড়ে। পণ্ডিত মশাই স্টীফান হেরোকে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর নম্বর দিয়েছে একশোর মধ্যে। কিন্তু খ্রিস্টান শিক্ষকরা স্টীফানকে সব বিষয়ে খুব কম নম্বর দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার ফলাফলে অখুশি স্টীফান হেরো। ফাদারের রাজনীতির মূলে যে ধর্ম চক্রান্ত ছিল ধীরে ধীরে বুঝতে পারে স্টীফান।

স্টীফান হেরোর চরিত্র ও আচরণের বিবর্তন সুবোধ ঘোষ অসাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্কুল জীবনে তার আচার আচরণ একরকম আর ঘরোয়া জীবনে ভিন্ন ধরন। ছাত্রদের পিকনিক হয়েছিল শিলোয়ারার জঙ্গলে। পোলাও, মাংস, দই, ময়রার সন্দেশ- এই সব খাদ্যগ্রহণ করেনি হেরো। সে জঙ্গলের মধ্যে আদিম সত্তাকে ফিরে পায়। সেখানে সে গুলতি দিয়ে কাঠবিড়ালীকে শিকার করে।[২] হেরো জঙ্গলের মধ্যে জংলির মতো আচরণ করে। এমন হতবাক আচরণে স্কুলের সমস্ত ছাত্র আশ্চর্য হয়। এই ক্ষেত্রে ফাদারের চরিত্র বেশি রুক্ষ হয়ে উঠে। ফাদার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে বার্তা ও নির্দেশ পাঠায় যে স্টীফান হেরোর সঙ্গে মেলামেশা বারণ। ইদানিং সে পাগল হয়ে গেছে। টুডুর কাছ থেকে জানা যায়, হেরো চার্চে যায় না, হোস্টেলে থাকে না, তিন দিন ধরে পাহাড়ে ছিল। সেখানে নেশা করে নাচ-গান করে। সেখানে চির্‌কি মুর্মুর সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা হয়। মুর্মুরা বোঙ্গা পূজা করে। এই পুজো খ্রিষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে মেলে না। অথচ হোস্টেল থেকে হেরোকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, সেখান থেকে ইচ্ছা-মত ক্লাসে আসা-যাওয়া করে। একদিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ বিখ্যাত শিক্ষক ফাদার লিন্ডন আর অন্যদিকে বর্বরবেশী জংলি মানুষের যাদুমন্ত্র। পাহাড়ের বুকে ফাদার তৈরি করে গির্জা ঘর। ফাদার লিণ্ডনের মিশন হাজারিবাগের কনভেন্টে চির্‌কি মুর্মু চলে যায়, সেও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলি হেরো একাই প্রতিবাদ করে কিন্তু মিশনারিদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি।

এই গল্পে আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস রীতিনীতির অবসান ও বিপর্যয়ের চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনভাবেই আছে খ্রিস্টান মিশনারিদের জোরজুলুম ও অত্যাচার। মিশনারিরা

অর্থের লোভ দেখিয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের ধর্মান্তরিত করে। অসহায় ও নিরুপায় মানুষ বাধ্য হয়ে নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ করে। আগ্রাসী শক্তির শোষণে আদিবাসী সমাজের সামাজিক কাঠামো ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংকটের মুখে। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ইংরেজ সরকারের ক্ষমতা ও মিশনারিদের চক্রান্ত দেখিয়েছেন, যেখানে আদিবাসী ব্যক্তিদের মেরুদণ্ড মূল্যহীন হয়ে উঠে। তারপরেও আদিবাসীদের প্রতিবাদ লড়াই ও সংগ্রাম থেমে থাকেনি। 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে' দেখা যায় মুসলিম শক্তির কাছে পরাজিত হয় মারাঠা গোষ্ঠী। আবার মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তখন ইংরেজ মিশনারিরা নিম্নশ্রেণির মানুষের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে থাকে। আদিবাসী সমাজের সামাজিক ও ধার্মিক পতন ও প্রতিবাদের নিদর্শন 'চতুর্থ পানিপথের গল্প'।

আদিবাসী সাঁওতাল জীবন নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী কিছু ছোটগল্প রয়েছে। যা গল্প বলার ধরন ও উপস্থাপনা ভঙ্গি হিসাবে লেখককে কথক চরিত্রের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে অবলম্বিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের লেখক সত্তা নানা প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে আছে গল্প ভুবনে। গল্পের মধ্যে দেশকালের ঘটনা সুগভীরভাবে নির্মিত, পাশাপাশি অবস্থিত বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরোক্ষে কল্পনা জগতের স্মৃতি ও ছন্দের তাৎপর্য। মানব জগতের সঙ্গে শিল্প জগতের মেলবন্ধন গল্পের সত্তাকে পৃথক করে। এতে পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের বৈচিত্র্য বিন্যাস নানা মাত্রায় উন্মোচিত হয়। বিভূতিভূষণের 'কালচিতি'(১৯৪৮) গল্পে দেখা যায় শিল্প নির্মাণের বহুস্বর। প্রান্তিক অঞ্চলে আধুনিকতার সূচনা ও বিকাশের সংকেত গল্পের কাঠামোয়। গল্প কথক গল্পের ভাবনা ও ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন অন্তর্নিহিত মানবিক আবেগ ও ভালোবাসায়। মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের গল্প নয়, বনজঙ্গলে অবস্থিত নিম্নবর্গের মানুষই তাঁর গল্পে বিদ্যমান। গল্প কথক বিশেষ কোনো চরিত্রকে গুরুত্ব দেয়নি। একটা ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপই গল্প

কথকের আকর্ষণ। কালচিতি একটি গ্রামের নাম, এই গ্রামের বাসিন্দা গল্প কথকের মক্কেল নরেন হাঁসদা। একটা পুকুর, শাল মহুয়ার জঙ্গল সমেত ত্রিশ বিঘা জমি কেনার আশায় গল্প কথক সেই গ্রামে যায়। পথে যেতে যেতে গল্প কথকের দৃষ্টিতে নানা ঘটনার ইতিবৃত্ত শিল্পরূপ ভাষায় স্থান পেয়েছে। একখানা গরুর গাড়িতে দশ মাইল পথের অভিজ্ঞতা কথকের জীবনে। পথে যেতে যেতে সে দেখতে পায় শালচরার বন ও ডিবুডুংরি পাহাড়। পাহাড়ের উপরে আঁকাবাঁকা রাস্তা, সেই রাস্তায় গরুর গাড়ি থেকে রোদ দেখা যায় না। বৃষ্টিহীন পরিবেশে শীতল হাওয়ায় ছোট ছোট বাঁদর গাছের ডালে খেলা করে। শাল, করম, আসান গাছের ছায়া মণ্ডলে হলদে ফুলের পাপড়ি কথককে আপ্লুত করে। পাহাড় পেরিয়ে ঢালু বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে মিশে গেছে পাহাড়ি নদী। পার্বত্য নদীর তটভূমির পাশে শালগাছ ও কুসুমের সভা। গরুর গাড়ি থেকে নেমে গল্প কথক শিলাসনে বসার আগেই গাড়োয়ানের ইশারায় ভালুক দেখতে পায়। সাময়িকভাবে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়। এই পাহাড় পেরিয়ে একটা বন্য গ্রামে পৌঁছালো কথক। গ্রামের নাম কাড়াডোবা, কুড়ি-বাইশ মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি। আধুনিক যুগে তারা খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিতে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে মুণ্ডা জাতির যুবক যুবতীরা। বাঙালি মেয়ের মতো মুণ্ডা সমাজের নারীর পরনে শাড়ি। তাদের ঘরবাড়ি খুবই সুন্দর, রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধভাবে খড়ের বাড়ি। ঘরগুলির মেঝে মাটির রং দিয়ে নিকানো মোছানো। ঘরের দেওয়ালে ধনেশ পাখি, ভালুক ও বিভিন্ন ফুলগাছের ছবি আঁকানো।[৩]

কাড়াডোবা গ্রাম পেরিয়ে নির্জন বনপথ, সন্ধ্যার সময় বনের হাতি পাহাড় থেকে ধানক্ষেতে নেমে আসে। আকাশের মেঘপুঞ্জে জমে থাকে শৈলযাত্রার শিখরে শিখরে, এই বিস্ময়কর প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে গল্প কথক কালিদাসের দেশকে উপলব্ধি করেছে। ‘মেঘদূত’ কাব্যে উল্লেখিত প্রাচীন ভারতীয় সুখমন্থর দিনগুলির স্মৃতি ফিরে আসে। ধনেশ পাখি কিংবা

ময়ূরের কেকাধ্বনি কথকের প্রাণস্পন্দনে বাজতে থাকে। এই নির্জন পথ পেরিয়ে সাঁওতালদের ছোট একটি ঢেঁড়াপানি গ্রাম। গ্রামের পাশেই অবস্থিত পাথরের চবুতরা এবং তার চারদিকে পয়ঃপ্রণালী। প্রাক ব্রিটিশ যুগে কোনো এক বন্য রাজা আসামীদের প্রাণদণ্ড দিত। আসামীদের শিরচ্ছেদের রক্ত পয়ঃপ্রণালী দিয়ে গড়িয়ে যেত।

ঢেঁড়াপানি গ্রামের পর সারোয়া পাহাড়, এই পাহাড়ের চড়াই থেকে দেখা যায় দুর্গম বনপথের ছোটখাটো রাস্তা এবং বহু দূরে অবস্থিত টাটা নগরের ডালমা পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় একজন বুড়ো কাঠুরে গাছের কাঠ কাটে। নাম তার গণু সর্দার, বছর পঞ্চাশের বৃদ্ধের বাড়ি ঢেঁড়াপানি গ্রাম। সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা তার, ধনুকবাণ দিয়ে বাঘ, ভালুক, বুনো হাতি কিংবা বিষধর সাপ শিকার করে। গণু সর্দার পাহাড়ের শিখরে নির্ভয়ে কাজ করে। সে ভিজে চাল আর নুন খেয়ে দিনযাপন করে। এই অঞ্চলে আটা ছাতু প্রভৃতি খাবারের অভাব, ভাত ছাড়া এদের জীবন অচল। তরকারিও বিশেষ থাকে না, শাকভাজা, নুন এবং পান্তাভাতই এদের প্রধান খাদ্য। গণু সর্দার কাচা শালপাতার পিকা খায়। বাজারের তৈরি করা বিড়ি এরা খায় না। সারোয়া পাহাড়ের ঢালু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কালচিতি গ্রাম। এই গ্রামে অনেক সাঁওতালদের বসবাস, কিছু বাঙালি অধিবাসীও আছে। বাঁকুড়া মেদিনীপুর থেকে বহু যুগ আগেই বাঙালিরা এই গ্রামে বসতি স্থাপন করে। গল্প কথক নারান হাঁসদার বাড়িতে উঠেছে। খড়ের বাড়িতে চুন সিমেন্টের বালাই নেই। খরচহীন মাটির ঘরে শালকাঠের দরজা জানলা। শহর থেকে বহুদূরের পাহাড়ি বন, শাল মহুলের রূপকথার গ্রাম। নিস্তব্দ, শান্ত ও নির্জন গ্রামের মাঠ। বাঘ ভালুকের আনাগোনা, বর্ষায় ময়ূরের নাচ, গাছের ডালে চাহা, তিত্তির পাখির কলরব। গ্রামের মেয়েরা ব্লাউজ শাড়ি পরে, অন্যান্য প্রান্তিক গ্রামের মেয়েদের থেকে এরা অনেকটা সভ্য ও মার্জিত। তাদের কথাবার্তায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নারান হাঁসদা গল্প কথককে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। গ্রামের প্রান্তসীমায় বনের ফাঁকা মাঠে অবস্থিত বিদ্যালয়। নারান হাঁসদার মেয়ে সুশীলা স্কুলের শিক্ষিকা, বাইশ তেইশ বছরের যুবতী। সুশীলা মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ, খ্রিস্টান মিশন থেকে ইংরেজি ও সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। সে রবীন্দ্র সংগীত না পারলেও গান শুনতে ভালোবাসে সুশীলা। স্কুলের দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো, তার পাশে আছে মহাত্মা গান্ধীর ছবি ও বাংলা ক্যালেন্ডার।[৪] মেঝেতে ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে। ছোট একটি ছেলের রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি শুনে গল্প কথক বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। স্কুল ছুটি হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের তিনবার জয় হিন্দ ধ্বনিতে দেশাত্মবোধ ভাবনা প্রকাশ পায়। পাহাড় অঞ্চলের সাঁওতাল গ্রামের অভিজ্ঞতা কথককে আপ্লুত করে তোলে, সাঁওতালদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, তবুও বাংলায় সাবলীলভাবে কথা বলে।

বিভূতিভূষণের 'শিকারী'(১৯৪৯) গল্পে উল্লেখিত গ্রামের নাম ঝাঁপড়িশোল। এই গ্রামের বাইরে একটা শালগাছের নিচে রয়েছে বোঙ্গাপূজার স্থান। গ্রামের সকল মানুষ সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে মুরগি বলি দেয়, বছরের একদিন পুজোর রীতিনীতি পালিত হয়। 'শিকারী' গল্পের অন্যতম চরিত্র জংলী বালক মাগনিরাম, ষোল বছর বয়সের ছেলে, ম্যালেরিয়া রোগে জর্জরিত। বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণ বাড়বাড়ন্ত এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামে। বেশিরভাগ মানুষের সুঠাম শরীর ও সাবলীল। ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ মাগনিরাম দুঃখকষ্টে উদাস হয়ে থাকে। ঝাঁপড়িশোল গ্রামের পাশেই বরজোর নালা, সেই নালার ধারে গ্রামের লোক কান্দা ফুল তোলে। পাহাড়ের শিখরে কান্দা আলুলতার নীল ফুল ফুটে থাকে। এই ফুলগুলি মাগনিরামকে আকৃষ্ট করে। মুগ্ধ হয়ে থাকলেও মাগনিরাম উচ্চ স্থানের ফুল তুলতে পারে না। সমবয়সী মেয়েরা মাগনিরামকে ক্ষেপায়, গালিগালা দেয়। মেয়েদের রাগ দেখে মাগনিরামের হাসি পায়। মেয়েদের প্রতি তার রাগ বিতৃষ্ণা বেশিক্ষণ থাকে না। বোঁঙ্গা পরবের সময় তার সমবয়সী

ছেলেমেয়েদের গান শোনায় ও শেখায়। কবি বংশের ছেলে মাগনিরাম, তার বাবা রাঁচি শহরে থেকেছে কিছুদিন। সেই সূত্রে 'মাগনি' শব্দের সঙ্গে 'রাম' শব্দ যুক্ত হয়েছে। নিবিড় বনপ্রদেশে রামভক্তির প্রচলন দেখা যায়। তার বাবা ছিল বিখ্যাত মানুষ, কেননা সে রাঁচি শহরে মোটর গাড়ি, টেলিফুক, বিজলি বাতি, বিজলি পাখা, কলের গান প্রভৃতি জিনিস দেখেছে। মাগনিরামের বাবার কাছে গ্রামের লোক গল্প শুনতে আসে। বাবার মতোই ছেলের অবস্থাও, কবিতা আর গান নিয়ে মেতে থাকে। গ্রামের লোক মাগনিরামকে নিন্দা করে। কিন্তু মাগনিরাম বাবাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। সে তার বাবাকে অনেক ভালোবাসে। সে বাবার মতো বড় মানুষ হতে চায়। মাগনিরাম সমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান পেতে আগ্রহী। তার বৃদ্ধ বাবার জন্যে অনেক কিছু কাজ করতে চায় কিন্তু পারে না ম্যালেরিয়া রোগের কারণে।

প্রতি বছর বর্ষার সময়ে ধানক্ষেতে হাতির আগমন ঘটে। ক্ষেতের ধান নষ্ট করে হাতির দল। ঘাটোয়ালি কাছারি এলাকায় পাগলা হাতির অত্যাচারে ক্ষেতের ধান ক্ষতি হয়েছে সর্বত্র। পাগলা হাতিকে মারার জন্য সরকার থেকে একশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। গ্রামের জোয়ান শিকারীর দলও পাগলা হাতিকে মারার সাহস দেখাতে পারেনি। যে সাঁওতাল পুরুষ বাঘ শিকার করেছিল, সেও রাজি হয়নি। কিন্তু মাগনিরাম বাস্তব জগতকে কবির দৃষ্টিতে দেখে, সে তার বাবাকে সাহায্য করতে চায়। কল্পনা হৃদয়ের যন্ত্রণা মাগনিরামকে সাহসী করে তোলে। সে নিজেও জানে না, বাস্তব আর কল্পনা এক নয়। কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে ক্ষমতা ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। যার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, সেই মাগনিরাম বাবার ইচ্ছা পূরণ করার আশায় পাগলা হাতিকে মারার পরিকল্পনা করে। মাগনিরাম একশো টাকায় মহিষ, মহিষের দুধ, সরকারের মিষ্টি কেনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠে। সন্ধ্যার সময় থেকে বরজোর নালার ধারে মাগনিরাম অপেক্ষা করতে থাকে পাগলা হাতিকে শিকার করার লক্ষ্যে। সন্ধ্যার আগের মুহূর্তে পাগলা হাতি নিমপুরের বুড়ো ক্ষেতপাহারাদারকে হত্যা করে। উত্তেজিত

মাগনিরাম বাবার স্বপ্নকে পূরণ করার স্বার্থে পাগলা হাতির উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। পরের দিন সকালবেলায় বাজরা ক্ষেতে মাগনিরামের রক্তাক্ত দেহ টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়। তার তিনদিন পরে সরকুন্দ জঙ্গলে পাগলা হাতির প্রকাণ্ড মৃতদেহ পাওয়া যায়।[৫] তারপর ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে চারজন সাঁওতালদের সাক্ষাতে মাগনিরামের বাবাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভূতিভূষণের গল্পের জগৎ বহু মাত্রিক এবং গল্প বলার কলাকৌশলও একমুখীন নয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা তার কাছে গুরুত্বহীন নয়, বরং ছোট ছোট ঘটনাগুলি তার জীবনের দৃষ্টিতে বিস্ময় রূপে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণের ভাবমূর্তি বারে বারে পরিবর্তন হয়েছে। চেনা জগতের আখ্যান নয়, বরং দূর বিস্তৃত অঞ্চলের নির্জন স্নিগ্ধ পরিবেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রবহমানতা গল্প নির্মাণের নতুন দিক। প্রকৃতি চেতনা ও মানব চেতনার গভীর অনুভূতি তাঁর গল্পের শিল্পজগৎ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষকে নতুন করে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর 'শিকারী' ও 'কালচিতি' গল্প স্বাধীনতা উত্তর কালে প্রকাশিত হয়। 'শিকারী' ও 'কালচিতি' গল্পের মধ্যে অর্থনৈতিক টানাপড়েনের ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে। 'কালচিতি' গল্পে কালচিতি গ্রাম যেতে বিভূতিভূষণের মুগ্ধময় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাঁওতাল গ্রামগুলি অন্বেষণ করেছেন। কালচিতি গ্রামে পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসের আধুনিতার ছোঁয়া লেগেছে। নারান হাঁসদার মেয়ে সুশীলা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। সুশীলা স্কুলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ায়, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও শেখায়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বদেশচেতনামূলক 'জয় হিন্দ' শ্লোগানও বলতে পারে। এই গ্রামে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। কিন্তু পাশের ঢেঁড়াপানি গ্রামে কেরোসিন আলোয় দুর্গম বন-জঙ্গল দেখা যায়। অর্থাৎ সাঁওতাল সমাজে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে আদিবাসী সমাজে সর্বত্র শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েনি। শিক্ষাহীন ভারতবর্ষের করুণ চিত্র গল্পের অন্তিমে

অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ‘শিকারী’ গল্পের মাগনিরামের কবিকল্পনা স্বভাব- এ সাঁওতাল সমাজের পৃথক চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে তার বাবাকে বাঁচানোর জন্য তার কবিসত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে। পাগলা হাতিকে হত্যা করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জীবনদান করে মাগনিরাম। পাগলা হাতি মারার জন্য দরিদ্র মাগনিরামকে ব্যবহার করেছিল উচ্চশ্রেণির মানুষ। আদিবাসীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা উচ্চশ্রেণির মানুষের। মাগনিরাম শিকারী হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল কিন্তু নিজেই শিকার হয়ে যায়। ‘শিকার’ গল্পে শিকারীর মর্মান্তিক মৃত্যু। সাঁওতাল সমাজের শিকার উৎসবের আনন্দ উল্লাস অনুপস্থিত গল্পে। শিকারী হয়ে অসহায় মানুষের জীবনযুদ্ধে পরাজয় ঘটে। অর্থের লোভ দেখিয়ে মানুষ মারার অভিনব পন্থা ব্যবহার করে ক্ষমতাবান মানুষ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প রয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত ছোটগল্প হলো ‘শিলাসন’(১৯৫২)। এই গল্পে সাঁওতাল চরিত্রের নাম না থাকলেও আদিবাসীদের কাহিনি রয়েছে। এই গল্পের বিষয়বস্তু ও ঘটনাকাল বর্ণনা করেছে কথক চরিত্র। সে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তথ্য সংগ্রহ করেন সহজেই, কেননা তাদের ভাষাও কমবেশি জানে। সে লক্ষ্য রাখতো আদিবাসী জীবনের গভীরতম অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা যাতে ক্ষত না হয়। কথক আদিবাসী বিশ্বাসকে অহিংসার প্রতিমূর্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। গল্পে আদিম বিশ্বাস-সংস্কার ও অলৌকিক সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাস্তববোধ একাত্ম হয়েছে। অলৌকিক মিথ ও বাস্তব ইতিহাসের সংমিশ্রণে নান্দনিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ‘শিলাসন’ গল্প। এই গল্পে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকলেও গল্পের মূলে রয়েছে আদিবাসী জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কার। একদিকে ভারতের প্রাচীনত্বের কথা, অন্যদিকে আধুনিক ভারতের

কথা। প্রাচীন সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের বিপরীতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নতুন ভারত।

এই গল্পের অন্যতম চরিত্র মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরী। বিলেত পাস বিজ্ঞানবাদী অমলের আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হয়, যে পরিবর্তন থেকে এই গল্পের কৌতূহল শুরু হয়। পরিবর্তনের কথা সূত্রেই অমলের উপলব্ধি ও ধ্যান ধারণায় তারতম্য দেখা দেয় অমৃত সমান মহাভারত এবং আধুনিক ভারতবর্ষের। দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টে অমল যুক্ত হয়। এই অঞ্চলে তার সঙ্গে অনুচর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সবসময়ই থাকে। কারণ ঘন অরণ্য ঘেরা পাহাড়ি স্থান, আর্য জাতির ইতিহাসের আড়ালে আদিবাসীদের বাসস্থান। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে রয়েছে ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট গ্রাম। ঘরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাটির দেওয়ালে সুন্দর ছবি। ঘরের উঠোনে মাটির পুতুল ও পাত্র সাজানো থাকে। সহজ সরল মানুষ বনে কাঠ কেটে বিক্রি করে, শাল পাতার নানা জিনিস তৈরি করে, ধান চাষ করে, ধান কাটে, কয়লা খনিতে কাজ করে- এভাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। চাষাবাদ ছাড়াও এদের পেশা হলো মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরি করা। গ্রামের মোড়ল হলো শিল্পী মানুষ, অন্য পেশায় যুক্ত হওয়া তার নিষেধ। মোড়লের কন্যার নাম শুচিস্মিতা, শুচিস্মিতার স্বামীর নাম কাঁদন।

এই আদিবাসী গ্রাম স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। এই গ্রামে আছে ‘শিলাসন’ পাথর, তাদের বিশ্বাস এই পাথর সাধারণ পাথর নয়। পাথরকে ঘিরে আদিবাসীদের যাবতীয় আচার-আচরণ ও বিশ্বাস রয়েছে। তাদের কাছে ‘শিলাসনে’ই ভগবান। প্রাচীনকালে সেই গ্রামে দেবতা এসেছিল, দেবতাই শিলাসন স্থাপন করে। জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্যের উপরে। সেই সত্যযুগে আদিনাথ ঋষভদেব মহাতপস্যায় এই ধর্ম স্থাপন করেছিল। এই ধর্মের অন্যতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ। অরণ্যভূমের পার্বত্যশিখরে শিলাসনেই প্রভু পার্শ্বনাথের আনন্দধাম গড়ে উঠে। মন্ত্র

ছাড়ায় কাঠের উপরে মূর্তির পর মূর্তি গঠন করা হয়। তারপর থেকেই আদিবাসীরা সেই মূর্তিগুলি তৈরি করে। কেউ পাপ কাজ করলে শিলাসনে ক্ষমা চাইতে হয়। কাঁদনও পাপ কাজ করেছে, তাকে ক্ষমা চাইতে হয়। কিন্তু কাঁদন এই সব বিশ্বাস মানে না। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, কাঁদন ক্ষমা না চাইলে কাঁদনের নরক দশা হবে। সারা গ্রামের সর্বনাশ হবে, পাহাড়ের সাদা পাথর কালো হবে, কালো পাথরের আকাশে নীল রঙ তামা হবে, বাতাসে বইবে মড়া পড়ানোর গন্ধ, নদীর জলে পোকা হবে, বনের গাছপালাতে শুয়াপোকা হবে, প্রভৃতি অমঙ্গল ঘটনা ঘটবে। তাই মোড়লের তাগিদে পূজা দিতে বাধ্য হয় কাঁদন।

এই গল্পের একদিকে আছে কাঁদন এক অনার্যদের প্রতীক, অন্যদিকে সে আধুনিক আগ্রাসী মানুষ। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে কাঁদন লড়াই করে। আর্য সমাজ অনার্য কাঁদনকে রেলস্টেশনে মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি দিয়েছিল। কাঁদন তারই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল অমল চৌধুরীর কাছে। কাঁদন চরিত্রে আন্দোলন ও সন্ত্রাসের ছায়া দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদী চিন্তা ভাবনায় কাঁদন চরিত্র নির্মিত হয়েছে। সরকারের পুলিশ সেই পাহাড়ে বোমা ফাটায়। শিলাসন ধ্বংস হওয়ার সময়ই কাঁদনের মৃত্যু হয়। আধুনিক সভ্যতায় প্রাচীনকালের শিলাসনকে ধ্বংস করলেও ধ্বংসস্তূপ আকঁড়ে ধরে থাকে সুচিস্মিতা। অর্থাৎ আধুনিক যুগে আর্য-অনার্য ভেদাভেদের যুক্তি খুব স্পষ্ট হলেও সভ্য সমাজ অনার্যদের স্বতন্ত্র ধারাতে বিশ্লেষণ করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন-সংস্কারমুক্ত, বিশ্বাসবাদী-বুদ্ধিবাদী- দুটি বিশেষ ধারা তৈরি হয়েছে।[৬]

সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও আদিপ্রথা নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'কমল মাঝির গল্প'(১৯৫৬)। এই গল্পের শুরুতেই দেখা যায় আধুনিক যুগেও সাঁওতালরা আদিম বিশ্বাসকে আকঁড়ে ধরেছে কীভাবে, তারই নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে গানের মাধ্যমে- 'আমার ছত্রছায়া আজ উড়ে গেল!...হায়রে হায়রে আমার মহুয়া বনের

টিয়া- আমার মহুয়া বনের টিয়া উড়ে গেল!'[৭] এখানে কমল মাঝির মৃত্যুতে সাঁওতাল সমাজের শোকের ছবি উঠে এসেছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র কমল মাঝি, তারাশঙ্করের সঙ্গে তার পরিচয় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স থেকে। গল্প রচনার সময়ই কমলের মৃত্যুকাল, কমল মাঝির বয়স নব্বই-এর মতো। কমল মাঝি প্রায় সত্তর বছর বসবাস করেছে কালকেতু গ্রামে। সে কৃষিজীবি মানুষ, লেখকের বাড়িতে কাজ করে। কাজের সূত্রে লেখকের সঙ্গে কমলের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। কমল মাঝি সাঁওতালদের সমাজপতি, লেখক যখন সাহিত্যসেবা এবং দেশসেবার কাজে যুক্ত থাকতেন না তখন তিনি সাঁওতাল সমাজের পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস বুঝতেন। কীভাবে পৃথিবী তৈরি হলো! কীভাবে পৃথিবীতে মাটির উৎপত্তি হলো! অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত কথক শুনতেন। মূলত সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব শুরু হয় মাটির উৎপত্তি থেকে। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি অনুসারে ঠাকুর নিজের বুকের ময়লা দিয়ে দুটি পাখি সৃষ্টি করে। পাখি দুটির নাম রাখা হয় হাঁস ও হাঁসালী। তারা আকাশে উড়ে বেড়ায় কিন্তু জলমগ্ন পৃথিবীতে কোথাও বিশ্রামের স্থান নেই। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে পাখি দুটি পুনরায় ঠাকুরের হাতেই ফিরে আসে-

> 'সেই সময় সিঞ সাদম' ওড়ে সুগম অর্থাৎ সূর্যের ঘোড়া পবিত্র সুতোর সাহায্যে জল খাবার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসে এবং জল খাবার সময় 'সিঞ সাদম' মুখের ফেনা ফেলে যায় জলের উপরে। সিঞ সাদম ফেনা জলে ভাসতে থাকে এবং এই থেকেই জলের ফেনা সৃষ্টি হয়।'[৮]

জলের ফেনাতেই হাঁস ও হাঁসালী আশ্রয় গ্রহণ করে। বাসস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে ঠাকুর চিন্তিত, তাই সে পৃথিবী সৃষ্টি করার কথা ভাবে। 'সিঞসাদম' ও 'ওড়ে সুগম' সাহায্যে মাটি উৎপত্তির সন্ধানে কুমির, চিংড়ি, রাঘব-বোয়াল, কাকড়ার ব্যর্থতায় 'ঠাকুরজীউ' ক্লান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরজীউ-এর নির্দেশে কচ্ছপের সাহায্য নিয়ে কেঁচো মাটি তোলে এবং পৃথিবী সৃষ্টি হয়। কচ্ছপ জলে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে, আর কেঁচো কচ্ছপের নিচে চলে যায়।

জলের ভিতর থেকে কেঁচো মাটি তুলতে থাকে কচ্ছপের পিঠে। সেই মাটি দিয়েই পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে উঠে। পৃথিবীতে যখন মাটি পূর্ণ হয়ে উঠে, তখন মাটি তোলার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেই মাটিগুলি ঠিকমতো সমান না হওয়ার কারণে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু স্থানের অসমতল পৃথিবী সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর চারিদিকে জলের রাশি, সেই জলের ফেনাগুলি মাটিতে আটকে যায়, সেই মাটিতে ঠাকুর বীজ রোপণ করে এবং তাতে বেনা গাছের জন্ম হয়। এরপর ঠাকুর দূর্বা ঘাসের বীজ বুনে, তার পিছনে কদম গাছ বেড়ে উঠে, তারপরে শালগাছ, মহুয়াগাছ প্রভৃতি গাছ-গাছালির জন্ম হয় ক্রমে ক্রমে। ঠাকুরজীউ-র নির্দেশে হাঁস-হাঁসালী দুটি ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হয়-

হায় হায় দুঃখ সাগরে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় জন্ম নিল যে
হায় হায় এই মানব শিশু।[৯]

শিশু দুটির নাম রাখা হয় পিলচু বুড়ো এবং পিলচু বুড়ি। তাদের বেঁচে থাকার জন্যে বাসস্থানের অভাব। তাই পাখি দুটির সাহায্যে পিলচু বুড়ো এবং পিলচু বুড়ি ‘হিহিড়ি-পিপিড়ি’ দ্বীপে চলে যায়। ‘লিটা’ ঠাকুরের নির্দেশে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি কাপড় পরতে শিখলো, তারপরে বুড়ো-বুড়ির সন্তান হয়। তাদের সন্তানেরা এদেশ-ওদেশ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতো। এই সময়ে কারোর সাদা রঙ হলো, কারোর কালো কিংবা হলুদ রঙ। এভাবেই সারা পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে পড়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট একটি গল্পের মধ্যেই সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসকে যেমন করে তুলে ধরেছেন তেমনি বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সেই সমস্ত বিশ্বাস ও পরম্পরা ভাঙ্গনের চিত্রও তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল সমাজের কাঠামো ও তার সাংগঠনিক বিচারব্যবস্থার পরম্পরা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরম্পরা বিংশ শতাব্দীতে ধ্বংসের মুখে। পৃথিবী সৃষ্টি

হওয়ার বহু পরে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটে, চিনে গৃহযুদ্ধ লাগে, কোরিয়ার উত্তর-দক্ষিণে লড়াই হয়, তখন ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্যে সংগ্রাম করে। সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ-অনাহারে বহু মানুষ মারা যায়। এই রকম দুঃসময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কমল মাঝির সঙ্গে দেখা করতে যান। সাঁওতাল জাতির সম্পর্কে তার নতুন ধারণা হয়, সাঁওতালরা যেমন সহজ সরল তেমনি সাঁওতালরা রাগী জাত। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। কমল মাঝির শিষ্য সোনা মাঝি, গ্রামের মুখ্য মোড়ল। সে তার গুরুদেব কমল মাঝিকে অস্বীকার করে। বুড়ো কমল মাঝির ভীষণ রাগ ও জেদ, কারণ সোনা মাঝি তাকে উপযুক্ত সম্মান দেয়নি। সাঁওতাল সমাজের সব থেকে শক্তিশালী দিক হলো গ্রামের সাংগঠনিক প্রণালী, যা সোনা মাঝি অস্বীকার করে। অন্যদিকে বৃদ্ধ কমল মাঝি ধ্বংস হয় অহংকারে।

সাঁওতালদের প্রেম ও সংসার বিষয়ক উপাখ্যান হলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘একটি প্রেমের গল্প’(১৯৬৪)। এই গল্পে রয়েছে বাঙালি পুরুষের সঙ্গে সাঁওতাল নারীর প্রেম। এই প্রেম দীর্ঘ স্থায়ী নয়, পুর্বরাগ পর্যায়ের প্রেম। এই প্রেমের কেন্দ্রে আছে সাঁওতাল নারী ফুলমণি। সুন্দরী কালো দেখতে, লম্বা শরীর এবং পরিশ্রমী। দুটি চোখের সৌন্দর্য তার দেহের সঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ফুলমণি মনোহর থেকে মনোহারিণী হয়ে উঠে। ফুলমণির সৌন্দর্য লেখকের দৃষ্টিকেও এড়িয়ে যেতে পারেনি। লেখকের বাগানে ফুলমণি সারাদিন কাজ করে। সে বাগানের সাদা ও গোলাপি রঙের ফুল মাথায় গুঁজে রাখে। যারা কলকাতা থেকে যেতেন, তারাও সেই বাগানের ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। লেখকের নাতনি শকুন্তলা দেবী, কলেজের ছাত্রী। কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এসেছে, শহরেই বড় হয়েছে। এই বাগানেই শকুন্তলার সঙ্গে ফুলমণির মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। শকুন্তলা রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উঠে আর ফুলমণি সাঁওতালি গান করে-

উপর কুলি - নামো কুলি মিলিন গা -
সিখানে সি জোড়া কদমগাছ।
কদমতলা যেয়ো না রে যেয়ো না-
তুমারো বিয়া হবে না!
তুমারো বিয়া চুড়া হবে না রে হবে না-
কদম্ব গাছে ফুল ফুটেছে!
কদম ফুলে হলুদ রঙে সাদা দাগ-
গায়ে লেগে বিয়া হবে না![১০]

ফুলমণির এই গান পছন্দ করে শকুন্তলার দাদা, মেডিকেল কলেজের ছাত্র। শকুন্তলার দাদা ফুলমণিকে পছন্দ করতে শুরু করে। ফুলমণি শকুন্তলার বৌদি, তাই শকুন্তলাও ফুলমণির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা পরিহাস করে। ফুলমণির সঙ্গে দাদার বিয়ে যদি হয় তাহলে লুপ্ত হয়ে যাবে সাঁওতাল সমাজের আদিম সংস্কৃতি। বাঙালি গৃহবধূর মতো তাকে ঘোমটা দিতে হবে। সে বন-জঙ্গলের পশুপাখি খেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, সাঁওতাল নারী যদি অন্য জাতের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করে তাহলে ফুলমণিকে সমাজচ্যুত হতে হবে। গল্প কথকও জানেন সাঁওতাল নারীর সঙ্গে বাঙালি পুরুষের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না। ফলত সাঁওতাল রমণীর সঙ্গে পরিহাস বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাঁওতাল পাড়ায় ঘরবাড়ি-রাস্তাঘাট-ক্যানেল গড়ে ওঠে। মাইলের পর মাইল জুড়ে সাঁওতাল পাড়া তৈরি হতে থাকে। সাঁওতাল গ্রামগুলি বড় হয়ে উঠে, একশোর উপরে সাঁওতালদের বাস। এখানেই অন্ত্যত ষাট বছর ধরে তারা বসবাস করছে। সাঁওতাল সমাজ বসবাস করে একটা সরদারের অধীনে, বুড়ো মেঘলাল সরদার ছিল সমাজের প্রতিনিধি। দুর্ধর্ষ সরদার তিন-চারটে গ্রামের মোড়ল ছিল। পশ্চিম পল্লীর সাঁওতাল পাড়ায় ফুলমণিদের বাড়ি। ফুলমণির বাবা ছিল চাষি। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ধান চাষ করে সংসার চালাত এবং বাকি সময়ে মাটিকাটার কাজ করতো। ফুলমণির যখন এগারো বছর বয়স তখন তার দুই ভাই অন্য গ্রামে চলে যায়। ফুলমণির বাবাও ছিল গ্রামের সরদার। তিন জনের সংসার ভালোই

চলছিল। ফুলমণির বয়স যখন চৌদ্দ-পনেরো তখন তার বাবা মারা যায়। ফুলমণি তার সমবয়সী ঝুমরীর সঙ্গে কাজ করতে যেত। তবে পুরুষদের সঙ্গে কাজে যেত না, কেননা তার বিয়ে হয়নি, যতদিন না তার বিয়ে হবে না ততদিন সে পুরুষের সঙ্গে কাজ করতে পারে না। তবুও তাকে কাজে যেতে হয় কলকারখানায়, সেখানকার মানুষের অত্যাচারে ফুলমণি পালিয়ে আসে গ্রামের বাড়িতে। গ্রামে ফিরে এসে সে মাটি কাটার কাজ করে। ধীরে ধীরে ফুলমণি যুবতী সুন্দরী নারী হয়ে উঠে এবং তার প্রতি সাঁওতাল জওয়ানদের দৃষ্টি বাড়তে থাকে। ঠিক তখনই মামুদ বাজারের বুধন মুর্মুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ঊনিশ-কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে, কাজ করার ক্ষমতা রাখে। বাঘ শিকার করার অভিজ্ঞতা আছে তার। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হয়েছিল, প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। ময়ূরাক্ষী, কোপাই ও বক্রেশ্বর নদীর জল সাঁওতাল পল্লীতে উঠেছিল। বঙ্গদেশে ধ্বংসের তাণ্ডব ও হাহাকার চলছিল। বৃষ্টির কারণেই জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে এসেছিল ডাঙ্গায়, সেই সুযোগে বুধন মুর্মু বাঘ শিকার করেছিল। সাঁওতাল সমাজের বীর চরিত্র বুধন। কোপাই নদীর ধারে অর্জুন গাছের জঙ্গলে সাঁওতালরা পূজা করে, তাই তারা কোপাই নদীর উপরের দিকে সাঁওতাল পরগণার শাল বনের জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিল। সেখানেই সাঁওতালরা শিকার করেছিল বনবিড়াল, খরগোশ, গোসাপ, কাঁড় প্রভৃতি জীবজন্তু। একমাত্র বুধনই বাঘকে শিকার করেছিল। বুধনের সাহস ও পরিকল্পনা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, বাঘের লেজ টেনে ধরেছিল প্রাণপণ শক্তি দিয়ে। বাঘের মুখোমুখি হয় পালোয়ান বুধন, বাঘের কামড়ে বুধনের কাঁধ রক্তাক্ত হয়ে যায়। এভাবেই বুধন বাঘ শিকার করে। গ্রামের সমস্ত মানুষ খুবই আনন্দ ও খুশিতে বুধনের নাম প্রচার করতে থাকে। সাঁওতাল রমণীরা বুধনকে বিস্মিতদৃষ্টিতে দেখে। ফুলমণিও বুধনের কাছে হার মানে এবং বুধনের প্রেমে পড়ে। বাঘ মারার দেড় মাস পর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে গল্পকথকের ভাই বুধনকে

হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। বাঘের কামড়ে বুধনের ক্ষতচিহ্নে ব্যান্ডেজ দিয়েছিল চিকিৎসকরা। সেই দিন থেকেই ফুলমণি বুধনকে সেবা যত্ন করতে থাকে।

বস্তুত গল্পের মূলে রয়েছে ফুলমণি ও বুধনের প্রেমকাহিনি। ফুলমণির মতোই বুধনও শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষ। দিন আনে দিন খায়। বুধন সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যার সময় মাদল বাজায়। মাদল বাজানো ও শিকার করা সাঁওতাল পুরুষদের ঐতিহ্যগত পরিচয়। বুধন চরিত্রের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের যাবতীয় দোষ-গুণ এ গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শ্রমজীবি বুধন মুর্মুর সঙ্গে ফুলমণির বিয়ে হওয়ার কথা। কিন্তু ফুলমণিকে ছেড়ে দিয়ে বুধন এক রঙ্গিনী, বিলাসিনী ও রঙিন শাড়ি পড়া হাসিকে বিয়ে করে। বুধন হাসিকে নিয়ে আমোদপুরে পালিয়ে যায়, সেখানেই সংসারী জীবন শুরু করে। এইদিকে ফুলমণি বুধনকে ফেরাতে পারেনি, শুরু হয় ফুলমণির অন্তর্দ্বন্দ্ব। বুধনের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে, সে আমোদপুরের ভাইয়ের বাড়িতে যায়, সেই বাড়ির পাশেই বুধন ও হাসি থাকে। ফুলমণি বুধনকে হত্যা করতে পারেনি, বরং নিজেকেই হত্যা করতে চেয়েছে। হিংসার বোধ থেকেই আত্মহত্যা করার চেষ্টা। নরহত্যা চরম অপরাধ, অপরাধ করতেও রাজি হয়ে উঠে ফুলমণি। হত্যার সুযোগ পেয়েও সে নর হত্যা থেকে আত্মসংবরণ করে। বুধন ও হাসির সুখের দাম্পত্যের কাছে ফুলমণি অসহায় ও নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতার বোধ মাথা থেকে বেরিয়ে যায় প্রেমের বাস্তব রূপ দেখে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদালতের জবানবন্দিতে-

> ‘কাঁদতে কাঁদতে মনে হলো-লে-লে তুর সুখ হোক। তু সুখ কর-খুব সুখ কর। আমি মরব। আমি মরব। বলে মুখটো উপর দিকে তুলে মারলাম এক কোপ।’[১১]

দুই বছরে জেল জীবন অতিবাহিত করার পর ফুলমণির জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসে। ১৯৬৪ সালে গল্পকথক দেওঘর গিয়েছিলেন। দেওঘরের হাসপাতালে আদিবাসী ফুলমণির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কথকের। সে এখন নার্স, এই হাসপাতালেই থাকে। আদিম ফুলমণি এখন আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে। রূপে গুণে লাবণ্যে ভরপুর দেহ তার। আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়,

আদব-কায়দায় আধুনিক মানুষ হয়ে উঠে। শকুন্তলার দাদাও বিয়ে করেছে, নার্সিং হোম আছে তার। ফুলমণিকে সেই নার্সিং হোমে কাজ করার প্রস্তাব দেয় গল্পকথক, কিন্তু লোভনীয় প্রস্তাবেও রাজি হয়নি ফুলমণি। ফুলমণি আর বিয়ে করেনি, সে তার প্রেমিকের ভালোবাসা ভুলতে পারেনি। ফুলমণির সাজানো স্বপ্ন নষ্ট করে দেয় বুধন। ফুলমণি ও বুধনের সাংসারিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেনি সমকালীন রাজনীতির নেতারাও। ১৯৫৬ সালে গল্পকথকের ভাই কংগ্রেসি লিডার ছিল। কংগ্রেস লিডার সাঁওতাল সমাজের জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারেনি বলেই ঘটনার স্থানকাল আদালতে স্থানান্তরিত হয়। এতে প্রেমের সারবস্তুতে রাজনীতির ছোঁয়া আছে কিন্তু রাজনীতি প্রেমের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বুধন ও ফুলমণির প্রেম সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে পরিণতি পেয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতির উপরে ব্যক্তির মানসিক চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্বাধীন ভারতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে দূরে সরে এসেছেন। ঈশ্বর ভাবনা ও বিশ্বাস তার জীবনে ফিরে এসেছে। তাঁর বিরোধীতা মার্কসবাদকে নয়, মার্কসবাদের নাস্তিকতা নিয়ে। স্বাধীনতা পরেই তিনি কংগ্রেস পার্টিতে পুনরায় যোগদান করেন। হিংসা ও অহিংসা, নাস্তিক্যবাদ ও আস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্ব থেকে তারাশঙ্কর বিরত থাকলেন এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেন। যে মুক্তিতে তারাশঙ্করের কল্পনা শক্তি প্রখর হয়ে উঠে। সাহিত্যে কল্পনা মিথ্যা নয়, কল্পনা যখন সত্য হয়ে উঠে, তখনই সাহিত্যের বাস্তবতা সার্থক লাভ করে। অতীত কল্পনা, ইতিহাসের মিথ এবং বাস্তব চিত্রের বাস্তবরূপ 'শিলাসন' গল্প। বামপন্থী মনোভাব থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস এবং অতীত অলৌকিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে প্রাচীন ভারতের পুনর্নির্মাণই গল্পের প্রাণবিন্দু। মানুষের জীবন একমুখীন নয়, জীবনে অনুকূল-প্রতিকূলের ঘটনা প্রতিনিয়ত থাকে, কমল মাঝি তারই বহিঃপ্রকাশ। প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতিনিধি

কমল মাঝি, তার নীতি নিয়মের বিরোধী দলনেতা সোনা মাঝি। সোনা আধুনিক সভ্যতার প্রতীক। একই সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় গল্পে। আত্মপ্রকাশেই শিল্পীর মুক্তি হয়, তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ অন্ধকার থেকে আলোকে, চৈতন্য থেকে চেতনায়। বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তাঁর বারে বারে মনে হয়েছে ভারতের নতুন ইতিহাস ও উপাখ্যান রচিত হোক। 'বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে বিভিন্ন পর্ব রচনা হলেও সমগ্রভাবে তা হবে 'ভারতকথা'। কেননা, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের বিচিত্র ধারাকে ভারতবর্ষ একটি নিজস্ব ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলেছে। সুতরাং ভারতের কথাশিল্পী তিনি যে প্রদেশের শিল্পী হোন না কেন- অন্তিম বিশ্লেষণে তিনি ভারতশিল্পী। এই অর্থেই মুখ্যত বাংলার শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর ভারতশিল্পী।'[১২] তিনি ভারতশিল্পী হয়েও সার্বভৌম জীবনশিল্পী। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসীদের বসবাস। তিনি তাদের জীবনের পরম সত্যকে উৎঘাটন করেছেন। সময় ও স্থানকালেই তাঁর লেখনী নিত্যবিবর্তমান ও নিত্যগতিশীল। ফুলমণি চরিত্রের মধ্যে বিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। আদিম নারী থেকে আধুনিক শিক্ষিত নারীর উত্তরণ। ফুলমণি অসৎ চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি লাভ করে মানবিক সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে, বাস্তব ও কল্পনায়, প্রাচীন ও আধুনিকতার অন্যতম সৃষ্টি ফুলমণি চরিত্র।

সাঁওতাল জনজাতির বৈচিত্র্যময় বিষয় নিয়ে রমাপদ চৌধুরীর গল্পবিশ্ব। তাঁর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী'(১৯৫২) গল্পে সাঁওতাল সমাজের অন্ধ বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। অন্ধ বিশ্বাসের আড়ালে সাঁওতাল নর-নারীর জীবনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পকার সাঁওতাল নারীর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে যৌবনের সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। লাটুয়া মাঝির বাইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে সুরমণি। সে খুব লাজুক প্রকৃতির। দিকুদের দেখলে আরও বেশি করে লজ্জা পায় সুরমণি। তার বাবা অন্ধ, তাই সুরমণি সব কাজ করে। সুরমণি কালো কুচকুচে মেয়ে কিন্তু রঙের মধ্যেও যে রূপ থাকে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একটি নিটোল

কালো পাথরের মূর্তি সে। তার টানা-টানা শরমকাতর চোখ, টিকোলো নাক। আর তার বুকের উদ্দীপ্ত যৌবনের তরঙ্গ। কোমরের কাছ থেকে হাটু অবধি শুধু একখানা শতছিন্ন ময়লা কাপড় তার দেহে। সুরমণি ভরা যৌবনের মেয়ে। মাথায় চুলের জট, স্বাস্থ্যের জোয়ার তার লাবণ্য ছিটানো মুখ। তার বুকের উদ্দাম তরঙ্গের মাঝখানে লাল পুথির হার। সুরমণির কানের লাল কুণ্ডল দুটো জ্বলে রক্তপলাশের মতো। তার সঙ্গে জাংলোর বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের আগে থেকেই তাদের মেলামেশা। সন্ধ্যার আলোয় রূপ আর দারিদ্র্যের হাত-ধরাধরি। যৌবন আর অলজ্জতা। দূর থেকে দেখার বর্ণনাতেও যৌনতার ঝলক- 'গাড়ায় স্নান সেরে আসছে মনে হলো। সারা শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, আর মুখে খিলখিল হাসি।'[১৩] সাঁওতাল সমাজে বিয়ের আগে নর-নারীর মেলামেশা করা অপরাধ নয়। তাদের প্রেমের মধ্যে সমাজের কোনো বাধা-নিষেধ থাকে না। গরিব সুরমণির শরীরে কাপড়ের অভাব, সেই শরীরে যৌনতার ইঙ্গিত রয়ে যায়। অভাব-অনটনের আড়ালে গল্পকার সাঁওতাল নর-নারীর প্রেমের রূপ-রস রূপায়িত করেছেন।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'রেবেকা সোরেনের কবর'(১৯৫৩) গল্পে সাঁওতাল সমাজের গভীর সমস্যা ও নর-নারী সম্পর্কের জটিল পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছেন। অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গল্পের বিষয়বস্তু বিবৃত হয়েছে। ক্ষমতাশীল মানুষের কাছে অর্থহীন মানুষের ট্র্যাজিক দিক উন্মোচিত হয়েছে এই গল্পে। গল্পের পটভূমি কারানপুরা খাদান, কারানপুরা একটি গ্রামের নাম, যার আদিনাম হলো কর্ণপুর। অর্থাৎ মহাভারতের চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিল কর্ণপুর। পাহাড়ের গাঁয়ে এক সারি প্রাচীন গুহার ভিতরে তাদের দরবার ছিল। একলব্যের বংশধর অরণ্যচর বীরহড়রা। এই কারানপুরায় ভিকারিয়ারা নৃত্য প্রদর্শন করে, নৃত্য শুধু নাম মাত্র, আসলে এরা সুর ও তাল মিলিয়ে গান করে। গানের লড়াই কবি গানের মতো, তাদের ডুগডুগির শব্দ শুনেই গ্রামের অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা ভিড় জমায়েত করে কারানপুরা

রামলীলার মাঠে। হড়, হো, ভূমিজ, সাঁওতাল, খাড়িয়ারা দল বেঁধে গান শোনার অপেক্ষায় থাকে। ভিকারিয়া হলো গ্রামের নাম, তার থেকে ভিকারিয়া নাচ। তোতা পাখি আর ময়ূর সেজে দুজন লোক অভিনয় করে, যারা নাটকীয় ভাবে কাহিনি উপস্থাপন করে –'তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুটি। ম্যোর অর্থাৎ পেখম আঁকা আরেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মতো চেহারা হয়েছে দুজনেরই। দুজনেই সুর করে গান শুরু করেছে। মূল গায়েন যতক্ষণ না এসে পৌঁছয় দলবল নিয়ে, ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।'[১৪] ছড়ার মতো করে গান, গ্রামের লোকও গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে ভিকারিয়াদের। উত্তর না দিতে পারলে গ্রামের লোক তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়, এমন কি খুন পর্যন্ত করে দেয়।

কারানপুরা খাদানে তিন খাদে সাঁওতাল মেয়ে রূপমতী কাজ করে। ফার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুসাহেব রূপমতীকে পছন্দ করে। 'সবাই লক্ষ্য করেছে জল-কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। ...রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখাচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্ণা নামে বাউণ্ডুলে সাহেবটার মুখে-চোখে।'[১৫] এভাবেই রূপমতী ম্যাকু সাহেবের প্রেমে পড়ে যায়। ম্যাকু সাহেবের সঙ্গে রূপমতীর প্রেম সম্পর্ক সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারে না। ফলে সাঁওতালপাড়ার মেয়ে সোনামিরু কিংবা লালোয়া রূপমতীকে সাবধান করে, কিন্তু সাবধানের কথা রূপমতী শোনেনি। সে ম্যাকু সাহেবকে ভালোবাসে। রূপমতী আর লালোয়া দুজনেই ভিকারিয়াদের গান শুনতে যায় কিন্তু গান শুনতে লালোয়ার ভালো লাগেনি, ফলে লালোয়া একজন ভিকারিয়াকে ছুড়ে মারে। শুরু হয় গণ্ডগোল। পালাতে থাকে সবাই। একদিকে গায়েনের দল, অন্য দিকে লালোয়া, মাঝখানে রূপমতী একা হয়ে যায়। সেই সুযোগে ম্যাকু সাহেব রূপমতীর হাত ধরে পালিয়ে যায়। তাদের প্রেমের সম্পর্ক সাঁওতাল সমাজের কাছে

পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজ জাতির সঙ্গে প্রেম করাটা সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি সাঁওতাল সমাজ। পঞ্চায়েতের লোক রূপমতীর বিরুদ্ধে নালিশ করে এবং তাকে অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের খবর সোনামিরু বেশি করে জানে, ফলে সোনামিরু ম্যাকু সাহেবকে সাবধান করে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। রূপমতীকে নিয়ে গ্রামে বিচার হয়, বিচার শুনে রূপমতী কেঁদে একাকার। বিচার হওয়ার পরেই রূপমতীকে 'বিটলাহা' করে দেওয়া হয়। 'আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাঁজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেলল রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে পিছনে আরেক দল এল তীর-ধনুক উঁচিয়ে।'[১৬] গ্রামের মানুষ অশ্লীল গান করে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে রূপমতীকে। তার শাড়ির আঁচল খোঁচা ও টান দেয় সমাজপতির দলবল। চিৎকার করতে করতে বাচ্চাগুলো রূপমতীর উপর হামলে পড়ে। রূপমতীর ডেরার সামনে যাবতীয় জিনিসপত্র ছিল, সবগুলো তারা নষ্ট করে দেয়। সাঁওতাল সমাজের ভয়ংকর অত্যাচার থেকে রূপমতীকে ম্যাকু সাহেব বাঁচিয়ে তুলে। সাঁওতাল সমাজের অত্যাচারকে সহ্য করে এবং সমাজকে অস্বীকার করে রূপমতী তার বুড়ো বাবার দুশ্চিন্তা ছেড়ে অন্ধকারে ছুটে পালায় ম্যাকু সাহেবের বাংলোয়। এদের সম্পর্কে লালোয়ার আপত্তি ছিল, ইংরেজ জাতকে সে কখনোই বিশ্বাস করে না। সে প্রতিবাদ করে উঠে– 'সাহেব। ও হলো আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বঙ্গা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধরম নষ্ঠ করতে এসেছে ওরা। চান্দো বঙ্গার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা।'[১৭] কিন্তু লালোয়ার প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে রূপমতী ম্যাকু সাহেবকে বিয়ে করে। রূপমতী থেকে রেবেকা সোরেন হয়, সাঁওতাল থেকে খ্রিস্টান হয়। তাদের ফুটফুটে একটা সাদা পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে।

গল্পের প্রথম পর্বে প্রেম ও সাঁওতাল সমাজ। কিন্তু গল্পের দ্বিতীয় পর্ব সমাজকেন্দ্রিক নয়, একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রূপমতী যাকে নিয়ে খুব গর্ব করে, যাকে নিয়ে এত অহংকার করে,

সেই ম্যাকুসাহেব তাকে ছেড়ে চলে যায়। রূপমতীকে নিয়ে গ্রামের লোক হাসা-হাসি করে। জনগণ তাকে খাদান কাজের কথা বলে অথচ রূপমতী খাদানের কাজ করে না, কারণ সে ম্যাকুসাহেবের স্ত্রী। খাদানে কাজ করলে ম্যাকুসাহেবের মান-সম্মান-ইজ্জত শেষ হয়ে যাবে। কতবার ইংরেজের গাড়ি এসেছে, কিন্তু ম্যাকু সাহেব আসেনি। রূপমতী সোনামিরুকে বহুবার বলেছে- 'ফিরব রে, ফিইরা আসব। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা ক্যানে। লালোয়াও এসেছে কোনো কোনো দিন। সোনামিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করছে, রূপমতী পাগল হইছে।'[১৮] শেষ পর্যন্ত রূপমতী পাগল হয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুতে সাঁওতাল সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। রূপমতীর কবর দেওয়া হয় 'খ্রিস্টান ধর্ম' অনুসারে-

> ওরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিল রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধল সাদা ও কালো খ্রিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খিস্টানরাই জিতল শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।[১৯]

রূপমতী সাঁওতাল সমাজে ফিরে গেলে পাগল হয়ে মরে যেত না, বরং নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত। কিন্তু রূপমতী সেই পথে যায়নি, বরং ভালোবাসার মানুষের জন্য অপেক্ষা করেছে। আর সাঁওতাল সমাজের কাছে লজ্জায় ফিরে যেতে পারেনি। নিজের মান-সম্মানের কাছে সাঁওতাল সমাজ ছটো হয়ে যায়। কেননা সেই সমাজ তাকে অনেক অত্যাচার করেছে। সেখান থেকে তার প্রেমিক তাকে বাঁচিয়ে ছিল। এই ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজের ধারণা সত্যি হয়, ইংরেজরা সাঁওতাল মেয়েদের ব্যবহার করে ফেলে দেয়। সাঁওতাল সমাজ জানে বলেই রূপমতীকে বারবার সাবধান করেছিল। কিন্তু সমাজের বাঁধা প্রেম মানে না।

এই গল্পের শেষে আর এক ট্র্যাজেডি দেখা যায়। লালোয়া রূপমতীকে মনে প্রাণে ভালোবাসতো। তার ভালোবাসার মানুষকে পায়নি, তাই সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কবরের পাশে বসে থাকতো। তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ত কবরের মাটিতে। কবরে মাটির প্রদীপ জ্বেলে

দিয়ে চলে যেত লালোয়া। এই দিকে সোনামিরু লালোয়ার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে সঙ্গ দেয়- 'কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিবে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জ্বালাতে পারত। যে আলো জ্বলত শুধু সোনামিরুর বুকে।'[২০] লালোয়ার প্রেমে সাড়া যদি রূপমতী দিত তাহলে প্রেমের পরিণতি এই রকম হত না। কিন্তু গল্পকার ম্যাকু সাহেবের প্রেমের বদলে লালোয়ার প্রেমকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে অন্ধ বিশ্বাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক টানাপোড়নের বৃত্তান্ত চিত্রিত হয়েছে। বাবা-ছেলের রেষারেষি থেকেই বুধন কিস্কুর মৃত্যু। এই মৃত্যু থেকেই গল্পের সূত্রপাত। বুধন কিস্কু একজন ডাকাত চরিত্র। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা কোলিয়ারি অঞ্চলের বাসিন্দা ডাকাত বুধন কিস্কুর ভয়ে আতঙ্কে থাকে। বুধনের সঙ্গে ঝুমরা বিবির গোপন সম্পর্ক তৈরি হয়। ঝুমরা বিবি ডাইনি বিদ্যা জানে, সে বুধনকে ঝাড়নি মন্তর শিখিয়ে দিয়েছিল, ফলে থানা-হাকিমের সাধ্য ছিল না বুধনকে ধরার। লোকের মুখে মুখে বুধন কিস্কুর নাম শোনা যায়, কিন্তু কখনোই দেখতে পায়নি কেউ। আর কেউ যদি দেখে থাকে তাহলে পুলিশকে বলবার মতো কারোর সাহস ছিল না। গল্পের ভিতরে আরও এক নতুন গল্পকথা শুরু হয় যখন বুধন কিস্কুর বিস্তারিত ঘটনা জানা যায়, তখন ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার খুনের তদন্ত হয়। এই খুনের তদন্ত থেকেই পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয় যে সোনাডিতে বুধনকে গ্রেপ্তার করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বুধনের বাবা মিঞামাঝি নিজের ছেলেকে ফাঁসি দিতেও রাজি হয়। সে থানা পুলিশ, হাকিমের কাছে আবেদন করে, যাতে তার ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে ফাঁসি না করায় মিঞামাঝি নিজের ছেলেকে হত্যা করে। কারণ- 'হুজুওর জন্ম দিয়েছি আমি, জীবনও নিয়েছি আমি। এখন আইনে ফাঁসি দিতে হয় দে। যে ছেলেকে কোলে-পিঠে করে আদর-যত্নে মানুষ করেছি, সে যখন ভালো হলো না, ডাকাতি রাহাহানি করে, মেয়েদের বেইজ্জত করে এল্লা বোঙার কাছে বেইমান হলো তখন

তাকে ফেলব না তো মুর্গি বলি দিয়ে তার পুজো করবো।'[২১] গামছায় ছেলের কাটা মুণ্ডটা নিয়ে থানায় হাজির হয়। লেখক এই খুনের পিছনে অলৌকিক বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে বাস্তবের সংযোগ গভীরভাবে আবদ্ধ থাকে। গল্পের কাহিনিতে মিথ্যার আড়ালে সত্য লুকিয়ে থাকে।

গল্পকার এই গল্পে বুধন কিস্কুর বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে গল্পের চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। সাঁওতাল সমাজের রক্ষণশীল বেড়াজালকে অতিক্রান্ত করে বুধন কিস্কু মুসলিম মেয়ে ঝুমরা বিবির বশে ধরা দেয়। বুধন কিস্কুর প্রবৃত্তি লোভ আর ঝুমরা বিবির অর্থের প্রয়োজনে তাদের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। সাঁওতাল ও মুসলমান সমাজকে অস্বীকার করে উভয়ের প্রেম পর্ব শুরু হয়। ঝুমরা বিবির অপরাধ পর-পুরুষের সঙ্গে প্রেম করা। তাই গ্রামের লোক তাকে জরিমানা করে, কিন্তু ঝুমরা বিবি জরিমানা দিতে চায়নি, ফলে গ্রামের লোক ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। গ্রামের বাইরে মা-মেয়ে একটা ডেঁরা বাঁধল। দশ বছরের বড় ঝুমরা বিবির সঙ্গে বুধন কিস্কুর প্রেম। জাত ও বয়স আলাদা হলেও প্রেমের জাত-বয়স থাকে না। তাছাড়া বুধন কিস্কু ছিল বলেই ঝুমরা বিবি ও আসমিনা খেতে পেত। ঝুমরা বিবি তার মেয়েকে নিয়ে যখন গ্রামের বাইরে থাকতে শুরু করে। তখন বুধনই তাদের পাশে ছিল। তাদের কোনো রোজগার ছিল না। বুধনের লুট করা চাল-ডাল, সোনা-দানা এনে দিত ঝুমরা বিবিকে। সে নেশা করে ঝুমরা বিবির সঙ্গে রাত কাটাত, ভোর হতেই চলে যেত। এই ভাবেই চলছিল বেশ কয়েক বছর। কিন্তু হঠাৎ বুধনের চরিত্র বদল হতে থাকে। ভালো মানুষ নেশার কারণে খারাপ হয়ে যায়। ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার উপর তার নজর পড়ে। বুধন আসমিনার সঙ্গে রাত কাটাত। একদিন বুধন কিস্কু আসমিনাকে খুন করে বলে অভিযোগ করে ঝুমরা বিবি -'আসমিনা সাঁজের বেলায় সোনা-তুলসী থেকে পানি আনত। তো বেটী গাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙ্গিটা লিয়ে চলে গেল বুধন। তারপর তো তুরাই জানিস

হুজুর। বলে কাঁদলে ঝুমরা, ঠিক সেদিন মেয়ের মৃত্যুদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে যেভাবে কেঁদেছিল।'[২২] তবুও বুধন কিস্কুর মৃত্যুতে ঝুমরা বিবির কান্না থামানো যায়নি। বুধন কিস্কু ঝুমরা বিবিকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। তার সংসারে অর্থের জোগান দিত বুধন।

এই গল্পের অন্তিমে অন্ধবিশ্বাসকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। গ্রামের লোক মনে করে, মা ও মেয়ে দুই-ই ছিল ডাইনি। নির্মল সিংকে বশ করেছিল আসমিনা, আসমিনা তার মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংহকে খায়। রেগে গিয়ে ঝুমরা বিবি তার মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের করে খায়। আর বুধন কিস্কু ডাইনি ঝুমরা বিবির সঙ্গে প্রেম করত। গ্রামের লোকের বিশ্বাস বুধন মরে যায়নি। এই সব ঘটনার বহুদিন পর-

> একরাম পুরের থানা উঠে গেছে বরকাডিহিতে, বন-পুলিসের দপ্তরে এসেছে নতুন লোক, সবাই ভুলে গেছে ঝুমরা বিবিকে, বুড়ো মিঞামাঝিকে, ডাকাত বুধন কিস্কুকে। কিন্তু সোনাডিহির তুড়ুক চাষিরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনো শীতকালে দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়- ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ সকলে দিনরাত নাদে গায়, দোকানীদের সারি বসে-মিঠাই, মাণ্ডী, রঙিন কাচের জলচুড়ি। আর ভিড়ভেং পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে।[২৩]

এই গল্প জনসমাজে বহু বছর ধরে চলে। যা এই অলৌকিক গল্পকথা এক আঞ্চলিক ইতিহাসরূপে পরিণত হয়।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'নারীরত্ন' (১৯৫৫) গল্পে নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর মনে এক চিন্তা আর কর্মে আরেক চিন্তা গল্পের মর্মে মর্মে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে লেখক ও পাঠকের কথোপকথনে। এই সম্বন্ধে রমাপদ চৌধুরী জানিয়েছেন- 'এলাহাবাদ থেকে সুজাতা মল্লিক আমার গল্প সম্পর্কে কটাক্ষ করে চিঠি লিখলে এ গল্প আমি সত্যিই লিখতাম না।'[২৪] লেখক গল্পটি শুনেছেন একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর কাছে। এইগল্প শুধু জংলা মেয়েদের কীর্তি নয়, নারী জাতি নিয়েই গল্পের পটভূমি তৈরি হয়েছে। নারী জাতিকে কীভাবে, কেমন করে বোঝা যায়- তারই বয়ান এই গল্প।

সুধীরবাবুর কথায়, নারী হলো নরকের দ্বারী। তবে সবমেয়েই যে সমান হয়, তা কিন্তু নয়। সুধীরবাবু বলেন- 'মুশকিল কি জানো, সব মেয়েদের তো আমরা ঠিক আগে থেকে চিনতে পারি না। এই যেমন ময়না কিস্কু।'[২৫]

ময়না চরিত্রে দুইটি সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। একদিকে ময়নার জবানে ধরা পড়ে মিথ্যার আখ্যান আর অন্যদিকে ময়নার মেয়ের জবানে ধরা পড়ে বাস্তব সত্যের বয়ান। গল্পের মূলে ভুখন কিস্কুর খুন। স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রী ময়না ও মেয়ে মিলে শোক পালন করে। নিজের স্বামী মারা গেলে যে কোনো নারীই কাঁদে। ঘরের মেঝে রক্তাক্ত ভুখনের দেহ পড়ে থাকে। ময়না কাঁদতে কাঁদতে জানায়, তার স্বামীকে নাকি টাঙ্গির কোপে সাবাড় করে দিয়েছে ধুলন টুডু। এখান থেকেই প্রশ্ন জাগে কে কাকে, কখন এবং কেন খুন করে? তার উত্তরে ময়নার পরকীয়া সম্পর্কের ঘটনা জানা যায়-

> হরকরার কাজ করত ভূখন, নির্মল সিং মারা যাবার পর ভূখন হয়েছিল রানার। সোনাডি থেকে বরহাডিহি মেল পৌঁছে দেওয়ায় ছিল ওর কাজ। তা সেদিন রাত্তিতে ভুখনের লাঠি ডগায় ঘুঙুর বাজতে বাজতে সোনাতুলসী ওপারে মিলিয়ে যেতেই ময়না কপাট বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় নাকি হঠাৎ ধুলন এসে জাপটে ধরলে ওকে, জড়িয়ে ধরে ঘরের ভিতরে এনে ফেলল।[২৬]

বহুদিন থেকে ধুলন ময়নার উপরে নজর রাখত। সেইদিন সুযোগ পেয়ে জোর করে ময়নার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ময়না চিৎকার করতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে তার স্বামী ভুখন ফিরে আসে। তখনই তাদের মধ্যে ঝামেলা হয় এবং ধুলন ভুখনকে খুন করে। কিন্তু এইটা শুধু ঘটনা মাত্র, আসল সত্য নয়। নারী জাতিকে বোঝার প্রথম ধাপ।

আসল ঘটনা জানা যায় ময়নার মেয়ের জবানীতে। মেয়ে তার মা-কেও ভয় করে। সে ময়নার সঙ্গে থাকতে চায়নি। মেয়ের কাছে মা ডাইনি। মেয়ের বাবা ভুখন মেল ট্রেনে বেরিয়ে গেলে, ময়না মেয়েকে ঘুমের ঘরে পাঠিয়ে দিত। মেয়ের সন্দেহ তখন থেকেই শুরু হয়। মেয়ে

দেখতে পায়, একদিন মাঝপথে তার মা ধুলনের সঙ্গে গল্প করে। তারপর থেকেই রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে দেখত ধুলন আর ময়নার প্রেম। অর্থাৎ ময়নার সঙ্গে ধুলনের একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেটা ময়নার মেয়ে পছন্দ করে না। অথচ সে সাহস করে তার বাবাকেও বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ে তার বাবা ভুখনকে সমস্ত ঘটনা জানায়। তারপর একদিন ময়না তার স্বামীর মাথাতে টাঙ্গি দিয়ে মেরে ফেলে। ঠিক সেই সময়েই ধুলন এসে হাজির হয় রোজকার মতো। আতকে উঠে ধুলন, বলে ফেলে- 'তুই খুন করেছিস ময়না, নিজের স্বামীকে খুন করেছিস?' ময়না জবাব দেয়- 'তোর জন্যেই খুন করেছি ধুলন, তোকে বাঁচাবার জন্যেই খুন করেছি।'[২৭] কিন্তু সোনাডিহিতে মৃত দেহটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে রাজী হয়নি ধুলন, ফলে ময়না খুনের দোষটা ধুলনের উপরে চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ধুলন সত্য ঘটনা আদালতে স্বীকার করেনি। বরং নিজেই ভুখনকে খুন করেছে বলে স্বীকার করে। কারণ ধুলনের কাছে ভালোবাসাটায় সত্য উঠে- 'যাকে সত্যি ভালোবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক।'[২৮] ধুলন নিজের ভালোবাসার মানুষের কাছে শাস্তি পায়- যেটা সে অপরাধ বলে গণ্য করেনি। গল্পকার নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবৃত্তির জিঘাংসা তুলে ধরেছেন। উল্টে পুরুষের প্রেম মহানরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পে সাঁওতালদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জীবন ধরা পড়েছে। বৃদ্ধ ও অন্ধ লাটুয়া ওঝার ঝাঁড়ফুকের ওষুধ খাটে না, মানুষ সুস্থ হয় না। তবুও অর্থাভাবের কারণে লাটুয়া ওঝা অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে সাঁওতাল মেয়ের উপর ইংরেজদের লোভ ও লালসার ছবি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে সাঁওতাল নারীর করুণ কাহিনি উপস্থাপিত। প্রেম ভালোবাসার জন্যে সমাজের মান-সম্মানের গুরুত্বকে অস্বীকার করার সাহসিকতা যেমন ভাবে বর্ণিত, তেমনি নীচজাতির নারী ভিন্ন সমাজে একা ও অসহায়। 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে বাস্তব ও মিথের পরম্পরা ঘুরে ফিরে এসেছে। ঝুমরা

বিবির ডাইনি ইতিহাস বহু বছর ধরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতাল সমাজের অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই ঝুমরা বিবির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের জীবনে বোঙা আর ডাইনিই সত্য। তাঁর 'নারীরত্ন' গল্পে সাঁওতাল মেয়ের মানসিকতার বিবর্তন ও প্রবৃত্তের উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। গল্পকার সাঁওতালদের সংগ্রাম কিংবা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ তুলে আনেননি, বরং বন-জঙ্গলে অবস্থিত সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের কাহিনি ছোটো ছোটো গল্পে সাজিয়েছেন। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে আদিবাসী জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাস ও ঐতিহ্য মিশে আছে। ছোটগল্পের বিন্যাস অনুসারে লেখকের অনুভব ও দক্ষতার পরিচয় অসাধারণ।

সত্তর দশকের বিখ্যাত কথাকার হলেন মহাশ্বেতা দেবী। সত্তর দশক মানেই নকশালবাড়ি আন্দোলন, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হচ্ছে 'অপারেশন? বসাই টুডু'(১৯৭৭)। গল্পের প্রধান চরিত্র হলো বসাই টুডু। বসাই টুডুর বন্ধু হলো কালী সাঁতরা। আর এই দুই বন্ধুর মধ্যে একটা আদর্শগত সম্পর্কও আছে। বস্তুত মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালিবাবু কালী সাঁতরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। 'নকশালবাড়ি আন্দোলনে'র জন্যে কালীবাবু সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না বলে বসাই টুডুর কাছে সাহায্য চায়। কালী সাঁতরা ও বসাই টুডুর মধ্যে সবসময় তাত্ত্বিক তর্ক চলতে থাকে। কালী সাঁতরা যুক্তি দিয়ে অহিংসার কথা বলে। প্রসঙ্গক্রমে কালী জানায়, 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে বিপ্লবী পূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামী অস্ত্রত্যাগ করে অহিংসা আন্দোলনের পথে গিয়েছে। কিন্তু বসাই টুডু অহিংসা মতাদর্শকে বিশ্বাস করে না। সে অহিংসা মতাদর্শ কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ- এমনকি নকশাল মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে সাওঁতাল বুদ্ধিতে নতুন সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। তার মতে সাওঁতালরা মিশনে লেখাপড়া করে অথচ তারা খেতমজুর। সে সাওঁতালদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না- 'সাঁতালরে ভুলায়ে দিবু সান্‌তাল, সি কেমুনে কর‍্যে পারবু তুমরা? আজও দেশ চিন না? তেমন দেশ গড়্যে দাও যেথা সান্‌তালে কাওরায়-উচা ঘরের কমরেটে

তফাত রয় না।'[২৯] বাঙালিদের অকেজো অসৎ মতাদর্শ ত্যাগ করে সে খেতমজুর সমাজের কথা এবং পার্টির কথা তুলনা করে। মানুষ যখন কমরেড, তখন তাদের চিন্তা ভাবনা ভিন্ন ধরনের কিন্তু খেতমজুর একই রকম থেকে গেছে। বসাই টুডু খেতমজুরের কিষানসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বহু সভা করেছে। সে প্রতিবাদ করে বলে উঠে-

> দেখ, স্বাধীনতা পর হথে সভার চ্যাহারা পালটে গেলু। লদীয়ার পীরিতের বান ডাকায়ে দিলু সভা। ভাগচাষি, খেতমজুর, বড় কিষান, মধ্যম চাষি, শয়ড়া বাবু, সকলের এক চোখে দেখলু সনহা। মরল ছোটচাষি, মরল খেতমজুর।[৩০]

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে কিষানসভার বিরাট স্থান আছে। তবুও পার্টির লোকের কাছে বসাই টুডুর সেভাবে কোনো স্থান নেই। রজনী পালকে নকশাল পার্টি হত্যা করে। আর পার্টির লোক বসাইকে দোষারোপ করে। ১৯৫৩ সাল থেকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় খেতমজুরের পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির লিডারের পদে আসীন হয় ভদ্রলোকেরা। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের কথা সেসময় ভাবা হয়নি। ফলে বসাইয়ের মনভঙ্গের অন্যতম কারণ হলো খেতমজুরের উপর অবিচার। কমিউনিস্ট পার্টির মানুষ সাধারণ খেতমজুর নয়, তারা মধ্যবিত্ত বাঙালি। তাই তাদের মধ্যে এই মধ্যবিত্তের চিন্তা-চেতনা থেকেই যায়। সত্তর দশকে তাদের রাজনীতির ফসল মৃত্যুর মিছিল, বাংলার সোনার মাটিতে শ্মশানের স্তূপ। সংবাদ পত্রে জনযুদ্ধের রক্তের দাগ ছাপানো। চরম এক দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ মানুষকে বোঝে না। মধ্যবিত্ত জনসাধারণ রাজনীতির কৌশল এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে অথচ মানুষের সাথে মানুষের ভাব-ভালোবাসা ও আন্তরিকতার মতো প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের কাছে উপেক্ষিত। বসাই টুডু লক্ষ্য করে জন্মগত কমিউনিস্ট কালী সাঁতরার মধ্যেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা রয়েছে। মূলত কালী সাঁতরা বারবার বসাইকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু বসাই টুডু দলে ফেরেনি। কারণ বসাই টুডু কমিউনিস্ট আইডিয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। কমিউনিস্ট পার্টির মতো বাইরের আইডিয়াকে বর্জন করে নকশালদের মদত নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে

বসাই। কিন্তু সে অনড় থাকে নিজস্ব মতাদর্শে এবং আন্দোলনের মতলব নিয়ে। বসাই টুডু নকশালদের মতো ভুল করবে না। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, সে পথে বসাই থাকবে না। তিন-চার বছর ধরে টানা খরা-আকালের পরেও চাষি গোষ্ঠী অবহেলিত। স্বাধীনতার পরেও ভাগ চাষিরা জমি পায়নি। উলটে ভাগচাষিদের উচ্ছেদ করা হয়। জমিদার-জোতদারের কবলে সমস্ত অর্থ ও জমি থাকে। একইসঙ্গে তারা ধান ও জমি চক্রবৃদ্ধি-সুদে সাধারণ খেতমজুরের কাছে রাখে। আর এই চক্রবৃদ্ধি-সুদটি জোতদার-মহাজনের কাছে যেন লক্ষ্মীর মতো। অন্যদিকে আদিবাসী সৎকর্মীরা সাধারণভাবে প্রতিবাদ করে কিন্তু প্রতিবাদের মূল্য পার্টির লোকের কাছে কোনও গুরুত্ব নেই। অথচ সাঁওতাল, ওরাঁও-মুণ্ডা-বাউরি-তিওর-কেওট জাতিরা 'নকশাল পার্টির' সঙ্গে যুক্ত। আদিবাসী সাঁওতালরা প্রশাসনের কোনো পদেই স্থান পায় না। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কমিটিগুলিতেও বাঙালি শিক্ষিত মানুষ দায়িত্বে থাকে। প্রতাপ গোলদার পাঁচ হাজার জমির মালিক। আদিবাসীদের জন্যে সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত টাকাও প্রতাপ গোলদারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। টিপ সই নিয়ে খেতমজুরদের চক্রবৃদ্ধি সুদ নেয় সে।

কৃষক শ্রেণির মানুষ বাবু সমাজের কাছে চিরকাল মূল্যহীন হয়ে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ মাধব ও গোপীও প্রতাপ গোলদারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে। বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কাজ কৃষকসভায় গুরুত্ব পায়। ফলে বীরু পাঠকও নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। সে গোপী ও মাধবকে বোঝায় যে সত্তর দশক হলো মুক্তির দশক। লবন মাঝিও নকশাল পার্টিতে যোগদান করে। বসাই টুডুর দল ভারী হয়ে যায়। সে পালতাকুড়ি ও বানারির মধ্যবর্তী স্থানে প্রতাপকে মারার পরিকল্পনা করে। প্রতাপ নকশালদের ভয় করে না, বরং সাঁওতালদের ভয় করে। এরা নকশালদের মতো শিক্ষিত নয়। বসাই টুডু প্রতাপ ও মহিন্দকে হত্যা করে হাজার বছরের পাওনা যেন শোধ করে। প্রতাপের লাশ নিয়ে পুলিশ বিচার শুরু করে। তারপরেই পুলিশের গুলিতে বসাই টুডুর লাশও পাওয়া যায়।

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বসাই টুডুর অপারেশন ‘জাগুলা’ নামে পরিচিত। রামেশ্বর ভুঞা নিচুজাত আদিবাসীদের সহ্য করতে পারে না। রামেশ্বর ভুঞা প্রশাসনের লোকের সঙ্গে কারবার করে। প্রশাসন চায় নিচুজাত আদিবাসীরা মরুক। আদিবাসীদের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রামেশ্বর ভুঞা প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করে। আর আদিবাসী সাঁওতালরা তিরধনুক, হেঁসো, টাঙ্গি টেটা, কোঁচ বর্শা, বল্লম ইত্যাদি আদিম অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাঁওতালদের উপর ভীষণভাবে পুলিশ গুলি চালায়। বসাইয়ের শরীরেও গুলি লাগে। বসাই সহ আরও দু’জন সাঁওতালকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ বসাইকে শারীরিক অত্যাচার করে ফাঁসি দেয়। বসাই টুডুর লাশ দেখতে বাসে করে সঁওতালরা থানার সামনে হাজির হয়, আর অপর পক্ষে রামেশ্বর বেঁচে উঠে।

বাকুলি গ্রামে বসাই ও কালী সাঁতরার মধ্যে জমি-জায়গা ও আইন নিয়ে যুক্তি-তর্ক হয়। বাকুলি গ্রামের জোতদার সূর্য সাউ। তার দেড় হাজার জমি জায়গা আছে। খরার কালে সূর্য সাউ সরকারের যাবতীয় রিলিফ বি.ডি.ও- এর সঙ্গে চুক্তি করে লুটপাট চালায়। সূর্যসাউয়ের মতো জোতদারিদের পথ হলো- ‘তুরা মর্, আমি বড় হই? লা কালীবাবু, বসাইয়ের বুক ভেঙ্গে গিছু।’ বসাইয়ের বুক ভেঙ্গে যায় সূর্যসাউয়ের মত জোতদারির জন্য। বংশানুক্রমিক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সূর্য সাউদের। ১৯৭৩ সালে বাকুলি গ্রামে বসাই টুডু সূর্য সাউকে অপারেশন করে। বসাই টুডুকে নিয়ে ‘জিলা বার্তা’ পত্রিকাতে লেখালিখি হয়। ক্যাপটেন অর্জুন সিংহের নেতৃত্বে আর্মি ও পুলিশের গুলিতে বসাই টুডুর প্রাণ যায়। ১৯৭৩ সালে লেবর বিভাগ থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে খেতমজুর- সমস্যা জনিত ক্রোধের ব্যাপারটা প্রকাশ পায়। প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় কৃষ্ণ ভারতের আদিবাসী প্রথম সন্তান। ভারতের ইতিহাসে অশোক, সর্বস্বদাতা হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক, আকবর, বণিক, ইংরেজরা কেউ আদিবাসী সাঁওতালদের কথা ভাবেননি। ফলে বসাই টুডুর মতো সাধারণ খেতমজুরীর দাম থাকবে কী করে। বসাই প্রতিবাদ করে বার বার

মৃত্যু বরণ করেছে। সে যে পথে চলছে, সে পথ দিয়ে আদিবাসীদের মুক্তি আসছে না। ১৯৭২ সালের লেবর-দিপার্ট রিপোর্টে আদিবাসী উপরে সন্তোষ জনক কাজ হচ্ছে না বলে সে ক্ষোভ প্রকাশ করে। ১৯৭৪ সালে খেতমজুরের মজুরি সংশোধিত হয়। তা সত্ত্বেও ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র দিন মজুরিদের একই রেট রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় প্রায় ৩৭ লক্ষ খেতমজুরের জন্য ষোলোজন ইনপেক্টরকে নিয়োগ করা হয়। নতুন আইনে মজুরের হিসাব রাখা হয়। কিন্তু দেখা যায় নতুন হিসাবে মজুরিদের কোনো লাভ হয় না।

স্বাধীনতার পরে ভারতের রাজনীতি নানা মাত্রায় দেখা দিয়েছে। ধর্মে রাজনীতি, ব্যবসা-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে রাজনীতি, ব্যক্তিজীবনেও নানা নিয়মই ভারতের রাজনীতি ট্রাডিশন। স্বাধীনতার পরেও মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতা পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালেও রিভিশন চালু থাকে। ফলত মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্যেই বসাই টুডুর মত নিষ্ঠাবান কমিউনিস্টের মৃত্যু হয়। বসাই টুডুর বন্ধু কালী সাঁতরার চিন্তাধারা এবং কার্যকলাপ বিশেষ অভিনব নয়। পৃথিবীতে ধনী ও গরিব মানুষ থাকে, কারণ মানুষের দারিদ্র্য মানুষের সৃষ্টি। জাতিভেদের সমস্যা ও ক্ষেত মজুরের সমস্যার সমাধান হয়নি। জোতদার-জমিদারের কাছে সাধারণ মানুষের স্থান নেই। সেই কারণেই বসাইয়ের মৃত্যু হয়েছে বারেবারে। 'বসাইয়ের প্রথম মৃত্যু-বুলেটেদীর্ণ দেহ। বেয়নেটে মরবে না-বসাইয়ের দ্বিতীয় মৃত্যু- বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন মুখ ও পেট। সম্মুখ সংঘর্ষে মরবে না-গাছে হেলান দিয়ে বসাই, হাড় চুর্ণবিচূর্ণ তৃতীয় মৃত্যুতে। গ্যাংগ্রিনে মরবে না- গ্যাংগ্রিনে বেগনে হয়ে ফুলে ওঠা চকচকে বসাই চতুর্থ মৃত্যুতে।'[৩১] শেষ পর্যন্ত জাগুলা শহরের পাশে চরসা গ্রামে বসাই-এর পাঁচবার মৃত্যু। আসলে বসাই টুডু রামেশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষ করে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীকালে 'বসাই টুডু' নামে বিভিন্ন সাঁওতাল মৃত্যু বরণ করে। বসাই টুডু মারা গেলেও শতশত বসাই টুডুর জন্ম হয়।

গল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত গল্প হচ্ছে 'দ্রৌপদী'(১৯৭৭), এই গল্প নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে যেন মাইলফলক রূপে চিহ্নিত। প্রসঙ্গত কাহিনির প্রারম্ভেই উল্লেখিত হয়েছে গল্পের অন্যতম চরিত্র দ্রৌপদী এবং তার স্বামী দুলন মাঝিকে কেন্দ্র করে একটি সরকারি নির্দেশনামা- 'নাম দ্রোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্‌ মাঝি(নিহত), নিবাস চেরাখান্‌, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা...'।[৩২] গল্পের এই দুই চরিত্র অর্থাৎ দুলন ও দ্রৌপদী আসলে দাওয়ালী কাজের সূত্রে বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া ইত্যাদি স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাই সরকারি পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও তাদের নাগাল পেত না। অবশ্য ১৯৭১ সালে বাকুলি গ্রামে পুলিশের অভিযানে তারা ধরা পড়লেও নিহতের ভান করে সে যাত্রায় তারা রক্ষা পায়। তারপর থেকেই শুরু হয় তাদের পালিয়ে বেড়ানো জীবন। একইসঙ্গে পুলিশও তাদের ধরার জন্য প্রতিনিয়ত সন্ধান করতে থাকে বিভিন্ন স্থানে। বস্তুত এই আদিবাসী দম্পতি অত্যাচারী সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করে এবং সেই সঙ্গে তাদের জমিজায়গাও দখল করে নেয়। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি তাদের প্রতিবাদী মনোভাব, তারা বিভিন্ন গোলদার-জোতদার-মজাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানে, এমনকি থানার উপরেও সেই আক্রমণের রেশ ছড়িয়ে পড়ে। সতর্কিত প্রশাসন তখন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা আদিবাসী দম্পতিকে ধরার জন্য বাঁকুড়া থানায় নিয়োগ করে সেনানায়ক অর্জুন সিং-কে। তার উদ্যোগে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে জঙ্গলে শুরু হয় দ্রৌপদীদের তল্লাশি অভিযান। অভিযানকালেই সেনানায়কের দলে থাকা দুখীরাম ঘড়ারী যুবককে দেখতে পায়- 'সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও '৩০০-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু'হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মা-হো' বলে সফেন রক্ত উদ্‌গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সে-ই কুখ্যাত দুলন্‌ মাঝি।'[৩৩] এখানে 'মা-হো' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই শব্দের

অর্থ বোঝাতে গিয়ে লেখিকা সাঁওতাল চরিত্রের সাহায্য নিয়েছেন- ‘উনি মালদ’র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা ‘মা-হো’ বলল বেটে? মালদ’ হতে কেউ এল?।’ লেকিকার মতে ‘মা-হো’ শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন মালদা খচাকানন্দের জিতু সাঁওতাল।[৩৪] মালদার আদিনা মসজিদ দখল করেছিলেন জিতু সাঁওতাল। ১৯৩১-৩২ সালে জোতদার-জমিদার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে লড়াই হয়েছিল। বস্তুত গুলিবিদ্ধ এই যুবকই হচ্ছে দ্রৌপদীর স্বামী দুলন মাঝি। মৃত দুলনকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করে অর্জুন সিং দ্রৌপদীকে ধরার চেষ্টায় নিয়ত থাকে। তাই দুলনের শবদেহ তারা জঙ্গলে রেখে দেয় এবং তারা অপেক্ষা করে দ্রৌপদীর জন্য। কিন্তু দুলনের মৃত দেহ নিতে কেউ আসেনি। পুলিশের জালে পা না দেওয়া সতর্ক দ্রৌপদী পালিয়ে যায় মুসাই ও তার বউ-এর কাছে। সেখানেই সে জানতে পারে তাকে ধরার জন্য সরকার থেকে দু’শো টাকা পুরস্কার মূল্য ধার্য করা হয়েছে। অবশ্য সোমাই ও বুধন অর্থের মোহে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে দ্রৌপদীর সঙ্গে। দ্রৌপদী ধরা পড়ে জঙ্গলের মধ্যে সেনাদলের পুলিশের হাতে। শুরু হয় পুলিশি-নির্যাতন, সেনানায়ক অর্জুন সিং তাকে একঘন্টা ধরে জেরা করে। তার পর সে হুকুম দেয়- ‘ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল’। এরপর অসহায় দ্রৌপদীর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠে সেনাবাহিনীর আদিম যৌন হিংস্রতায়। বাহিনীর দ্বারা একাধিকবার ধর্ষিতা দ্রৌপদী একসময় জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। যখন জ্ঞান ফেরে তখন অদ্ভুত এক প্রতিবাদে গর্জে ওঠে দ্রৌপদী। বিবস্ত্র দ্রৌপদী সেনানায়কের সামনে প্রতিবাদের আগুন তোলে- ‘কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?...হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর লেঃ কাঁউটার কর?’।[৩৫]

এই গল্পে বোঝা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীর সৌন্দর্য কতটা গভীর। তিনি রাজনৈতিক বিষককে রাজনৈতিক ভাষার সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের অন্তিমে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা অসাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে মহাশ্বেতা দেবী দ্রৌপদীর মুখে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই ভাষাকে যথার্থভাবে ব্যবহারের জন্যে রাজনৈতিক ভাষার সাহায্যে বিষয় ও বিশেষত্বের মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। তাই দ্রৌপদীর ভাষাতেও সেই সংঘাত, ভাষার স্তরবৈচিত্র, ক্ষমতার, অধিকারের, শাসনের ভাষার; তকমাধারীদের ভাষায় তা নেমে আসে মধ্যম স্তরে, যেখানে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়; সেনানায়কের ভাষায় এবং তাকে ঘিরে ভাষার যে বহুমাত্রিক আবহ মহাশ্বেতা দেবী করেছেন, তাতে আছে ক্ষমতার জটিল বিন্যাস। এই নানা ভাষার বুনটে তৈরি ক্ষমতার জাল ছিন্ন করেই উচ্চারিত হয় দ্রৌপদীর ভাষায় 'লেঃ কাঁউটার কর্'- যেখানে প্রশাসনের ক্ষমতার ভাষা তার উচ্চারণের উলটে পড়ে, মাথা থুবড়ে পড়ে, তার প্রবল শারীরিক তাড়নায় তারই শরীর থেকে, তার প্রতিরোধ রোষ থেকে অর্থান্তরে পৌঁছে যায়।[৩৬]

মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত চারটি বিশেষ গল্পের নাম হলো 'অপারেশন? বসাই টুডু', 'দ্রৌপদী', 'জল', 'এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ'। 'অপারেশন? বসাই টুডু', আদিবাসী হয়ে জন্মালে বঞ্চনাবোধ থেকেই জন্মায় তার শরীফ উচ্চ শ্রেণির মানুষ বুঝতে পারে না অথচ কৃষ্ণ ভারতের কৃষ্ণ আদিবাসী হচ্ছে প্রথম সন্তান। তারপর ভারতবর্ষে একের পর এক জাতি প্রবেশ করেছে। আদিবাসীদের যে সমস্ত জমি জায়গা ছিল, সেইগুলি অ-আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত। দীর্ঘ বছর থেকে আদিবাসীরা সকল শাসনব্যবস্থা থাকে বঞ্চিত। রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকায় রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্তর দশকের নকশাল বাড়ি আন্দোলনের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার নেতিবাচক দিক বামপন্থী রাজনীতির ভ্রান্তি মনোভাব স্বীকার করতেই হবে। তারপরেও বাস্তবের সত্য ঘটনা অবলম্বনে মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী চোখে আঙুল দেখিয়ে

নির্দেশ দেয় নিপীড়িত মানুষের বীরত্বের কাহিনি। জমিদার প্রথার বিলোপ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মী চিন্তিত নয়, কারণ সত্তর দশকে গ্রাম বাংলায় ভূমিহীন মানুষ মহাজনদের অত্যাচারে অসহায়। মর্মান্তিক বাস্তব ঘটনায় কৃষকদের আন্দোলন দুঃখজনক। রাজনৈতিক কর্মীরা মেহনতি মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। অথচ তারা বীরত্বের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করেছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘অগ্নিগর্ভ’ গ্রন্থে ভূমিহীন কৃষক গোষ্ঠীকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়েছেন। একজন সমাজ সেবিকা রূপে কিংবা লেখিকা রূপে নিম্নশ্রেণির বিদ্রোহকে যথাযথ শিল্পরূপ দিয়েছেন। গ্রাম ভারতের দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য লেখিকার। ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থে কৃষক বিদ্রোহ এবং প্রশাসনের বর্বরতার ছবি নাটকীয় রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, বেরুবাড়ী প্রভৃতি এলাকার মানুষ আদিবাসী। পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে হত্যা করেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে। কালী সাঁতরা কিংবা ইন্দ্রের মতো চরিত্রের রাজনৈতিক আদর্শ অত্যন্ত হতাশার। এদের মধ্যে যাবতীয় গুণ বর্তমান, নিষ্ঠাবান চরিত্র কিংবা সংগ্রামশীল চরিত্র হিসাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে যুক্ত। বসাইয়ের আদর্শ থেকে তারা ভিন্ন এবং বসাইয়ের মতো তারা একাকী নয় অথচ বসাই টুডু কিংবা দ্রৌপদীর একক লড়াই। যা আসলে কৃষ্ণ ভারতের আদিবাসী জীবন সংগ্রামের ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

বাংলা গল্পের পালা বদলের ইতিহাসে গল্পকার নলিনী বেরার স্থান অনস্বীকার্য। তাঁর গল্প বলার ধরন ও প্রকাশ পাঠক সমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো ‘ঝাঁটার কাঠি’। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র কথক। কথক চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সুনি সাঁওতালের পরিচয় পাওয়া যায়, এই গল্পের প্রধান চরিত্র। সুনি সাঁওতাল ‘সেরেঞ’ (গান) নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সাধারণত সাঁওতাল মেয়েরা দাঁশায়, সহরায়, দং, লাগড়ে, ঝিকা- ইত্যাদি নানা উৎসবে নাচের তালে গান করে থাকে। সুনি সাঁওতালের জীবন গানছাড়া যেন অর্থহীন।

গল্পের মধ্যে দেখা যায় সুনি সাঁওতাল লেখকদের বাড়িতে কাজ করত। লেখকের বাবার সঙ্গে সুনির বেশ জমাট ও মজার সম্পর্ক ছিল। সুনি সাঁওতাল কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গান করত– 'গাডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম নরং, /ধীরি মাগাড় রে, দাঃক দ বদন রে নালম বড়ে।'[৩৭] তার আনন্দময় জীবনে, তার গানের ভুবনে উড়িষ্যা থেকে রাবণ নামে এক যুবক এসেছিল। সে সুনি সাঁওতালকে 'সিঁদুর বাপ্‌লা' করে ময়ূরভঞ্জে নিয়ে চলে যায়। 'সিঁদুর বাপ্‌লা' অর্থাৎ আদিবাসীদের মতে জোর করে মাথায় সিঁদুর ঘষে বিবাহ। অবশ্য সেটা আপত্তির কিছু নয়, কারণ তাদের সমাজে এ ধরণের বিবাহের রীতি প্রচলিত।

নলিনী বেরা তাঁর 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে সুনির জীবনের উত্থান-পতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনির সুন্দর জীবন কীভাবে ধংস হয়ে যায়- তারই বিবরণ এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। সাঁওতাল মেয়ে সারাদিন গান নিয়ে মেতে থাকে, আনন্দে তার জীবন অতিবাহিত হয়। সুনির এই আনন্দময় জীবন বেশি রইল না। বিবাহিত সুনির সংসার অল্পসময়েই ভাঙন ধরে। সমাজের অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে সুনির জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। রাবণ, তার মা ও ময়ূরভঞ্জের চিতুসোল গ্রামের মাতব্বর উসকানিতে সুনি সাঁওতালের গায়ে ঝাঁঠার কাঠি মারে। ঝাঁঠার বাড়ি খেয়ে সুনির মর্মান্তিক অবস্থা হয়ে উঠে। সুনির চোখে ঝাটার কাঠি খুচিয়ে দিয়েছে গ্রামের লোক। চিকিৎসার জন্যে সুনি কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়। যে হাসপাতালের ডাক্তার ছিল গল্প-কথক, তারই চিকিৎসাতে সুনি সুস্থ হয়ে উঠে। এখানে গল্পকার সাঁওতাল নারীর অসহায়তাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেন।

নলিনী বেরা শুধু সাঁওতাল নারীর বেদনার কথা বলেছেন তা কিন্তু নয়, সাঁওতাল পুরুষের জীবন কাহিনি তাঁর 'খোরপোষ' গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সনাতন টুডু, কথক চরিত্রের বাড়িতে কাজ করে। কথক চরিত্রের বন্ধু করমশাই এই গল্পের এক অন্যতম চরিত্র। করমশাই-এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল গ্রামের বৈচিত্র্যময়

পরিবেশ গল্প কথক তুলে ধরেছেন। কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় গানের মধ্যে বিভিন্ন শাক ও গাছগাছালির নাম পাওয়া যায়। আমাদের চারেপাশে বহু ধরনের শাক ও গাছ আছে, যা আসলে সাঁওতালরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। হিড়মিচা, ঘলঘসি, আঁটারি, চরচু, ডকা, শাল, পিয়াশাল, কেঁদ্, ভাদু, ভুড়রু, কইম, বাদাম, ভাদভেলা, কদম, গুটিমন, দুধিয়া, কুড়চি, সোনালি, জাড়া, জারুল, পড়াশ, পাকুড় প্রভৃতি গাছগাছালির সঙ্গে অরণ্য জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে। হরেক রকম গাছের নামের সঙ্গে সাঁওতাল মানুষের নামের মিলও পাওয়া যায় যেন। বিশেষ করে রাইবু, চামটু, গুড়গুড়িয়া, সামাই, সোমবারি, ঢালো, খেক্ রে, কুলাই, ছোট্রাই, পিথো, কাঁদুরা, পিলচু, পিতাম, গুরা, বড়কাই, সুনি, ভুসকি, ধনু, গুরভা ইত্যাদি গাছের নামের মতোই ব্যক্তি মানুষের নামকরণও দেওয়া হয় সাঁওতাল সমাজে। বস্তুত প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের মেলবন্ধন আদিম যুগ থেকেই। আর এই গল্পেও প্রকৃতির ব্যাপক ও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। কালী পুজোর সময় ক্ষেত ভর্তি সবুজ ধান দ্রুত হলুদ হয়, ধানের ডগা নত হয় শিষের ভারে। জল ক্রমশ কমে যায় ধানগাছের গোড়া থেকে। চ্যাঙ, গোড়ুই, মাগুর প্রভৃতি মাছ খলবল করে ধান ক্ষেতের মজি থেকে লাফিয়ে উঠে। একই সময়ে সাঁওতাল সমাজে সহরাই পরব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে 'ঢ্যাঙুয়ান' বা 'ধেনুয়ানের' দলের নেতা হলো সুনা সাঁওতাল। মাদল বাজিয়ে 'ঢ্যাঙুয়ান' দলের মহড়া হয়। মহড়া হওয়ার পরে গ্রামের ঘরে গিয়ে দুয়ারে দুয়ারে 'গরু-জাগরণ' হয়। 'ধেনুয়ানের' দল সারা বছরে একবারেই মাদল বাজিয়ে ঘরের দুয়ারে দুয়ারে গান করে, বিনিময়ে তারা ভাত বা চালও কিংবা টাকাও চায় না। 'খাপরা পিঠে' (রুটি) ও আধ বোতল মহুয়ার রসও তারা আবদার করতে থাকে। সমগ্র অমাবস্যার রাত জেগে 'কুলকুলি মেরে' ঢ্যাঙুয়ানের দল রাস্তায় বেরিয়ে গান করতে করতে যায়-

হাম্‌রা তো যাতেছিলি কুল্‌হি ন কুল্‌হি যে বাবু হো
তোরই গিরিহাই ডাকিয়েঁ ঘুরালো–

সুনা সাঁওতাল দলের মোড়ল। তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গান করতে থাকে–

'অহিরে– সব দিন তো মাগে ভালা ভাটো-ভিক্ষারী যে

ললিনবাবু হো –

আজি তো মাগি ধেঙ্গুয়ান।[৩৮]

'বুটি বাঁধনা' বা ভাইফোঁটার দিনে গল্পকথকের কথা কেউ শোনে না। গল্পকথক জানায়- 'বিলজঙ্গল ঢুড়ে লম্বা লম্বা বেনাঘাস, কুশগাছ দা দিয়ে কেটে আনলাম, আমাদের ঘরের নাচ দুয়ারে, 'পইড়ান' গাড়ব। পইড়ান হলো বেনাঘাসের বিনুনি, চুলের মতো পাকিয়ে অনেকটা মাটি খুঁড়ে সেই বিনুনির গোড়া পার্শ্ববর্তী কোনো শক্ত গাছের শিকড়ে অথবা অন্য কোনো ভারী জিনিসের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয় মাটি চাপা।'[৩৯] বিকালবেলায় ঢ্যাঙুয়ানের দল গায়ের জোরে 'পইড়ান' তুলে দিতে পারে তাহলে ঢ্যাঙুয়ানদের রসেবশে খাওয়াতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর গরু খেলানোর পার্টি হয়–

অহিরে...সবুদিন তো চরাঁই ভালা

বিরি মুগো ক্ষেতে যে বাবু হো

আজি তোরো দেখিব বলিয়ানি –

আজি কারো রণে ভালা হারি যদি যাও গো

তোরো ছালে বরদা খুঁটাবো।[৪০]

গরু খেলানোর পার্টি হয়ে যাওয়ার পরেই ঢ্যাঙুয়ান দলের গান-বাজনা সমাপ্ত হয়। তারপর যে যার ঘরে যায়। কাহিনিতে দেখা যায় বহুদিন পরে গল্প কথক সুনা সাঁওতালের ঘরে যায়। ঢ্যাঙুয়ান দলের নেতা সুনা সাঁওতাল বুড়ো হয়ে গেছে। তবে সেই পুরোনো যুগের গামলা, ঘটি, বসবার জায়গাটুকু, খাবার ভঙ্গি– এখনও রয়েছে। সুনা সাঁওতালের বাড়িতে কেউ নেই, একাই থাকে। সুনা সাঁওতাল স্তূপীকৃত অন্ধকারে বসে পান্তা ভাত খায়। গল্প কথক দেখে সুনা সাঁওতালের পায়ের তলায় একটা খিল ঢুকিয়ে নিজেকে পঙ্গু করে দিয়েছে। গল্প কথকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল– 'বাকি জীবনটার জন্য তুমি আমাদের বাড়িতে খোরপোষ দাবি কর, সুনাভাগ্না!'। তখন ঠোঁট দুটো থরথর করে ও চোখের কোণ বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে সুনা

সাঁওতাল বিড় বিড় করে বলে উঠে- 'এতদিন তুমাদের পালপোষ করে এসেছি, আজ তুমরা আমাকে খরপুষের লোভ দেখাচ্ছ- বলছ কী, তুমাদের কাছে খরপুষের ল্যাওড়া দাবি তুলতে? হ্যাঁ, দাবীদার?'।[৪১] গল্পের শেষে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে গল্পের কথক। ঢ্যাঙুয়ান দলের নেতা সুনা সাঁওতালের আনন্দময় জীবন এখন দুর্দশাময়। আর এভাবেই সুনা সাঁওতালের মধ্যে দিয়েই গল্পকার সাঁওতাল সমাজের বাস্তবজীবন তুলে ধরেছেন।

নলিনী বেরা সাঁওতাল সমাজের লোককাহিনির মধ্য দিয়ে জীবনের সারবস্তু বুঝিয়েছেন। তাঁর 'ঝরাপালকের জাদু' গল্পে সাঁওতালি লোককাহিনির বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণদের জাতপাত বর্ণনা উঠে এসেছে। লোকআখ্যানের কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় বুধনের মায়ের সাথে কথক চরিত্রের কথোপকথন। বুধনের মায়ের সঙ্গে গল্প কথকের সম্পর্ক নানি-নাতির, ফলত তাদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলতেই থাকে। তবে মস্করা করতে গিয়ে জাতপাতের কাহিনি উঠে এসেছে মায়ের কণ্ঠে। গল্পের ভিতরে গল্প, যে গল্প পাঠক সমাজকে নতুনভাবে যেন ভাবায়। যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষের গল্পকথাতে উচ্চশ্রেণির মানুষের নানা কার্যকলাপ ধরা পড়েছে। কাহিনিটা হলো এই রকম– একটা গ্রামে একটা বামুন ছিল। তার দুই বউ ছিল। দুই বউ এর রোজ ঝগড়া হত। ফলে ব্রাহ্মণের বাড়িতে খুব অশান্তি। ব্রাহ্মণ রেগে-দুঃখে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ রাস্তায় যেতে যেতে একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে হাড়ি-ডোম-সাঁওতাল-ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মড়া না পুড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দেওয়া হয়। শকুনরা তাদের মধ্যে হাড়ি-ডোম-সাঁওতালদের মাংস খায় অথচ ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মাংস খায় না। এরকম আশ্চর্য চিত্র দেখে ব্রাহ্মণ শকুনের দলকে বোকা মনে করে। কেননা তারা উচ্চশ্রেণি মানুষের মাংস না খেয়ে নিম্নশ্রেণি মানুষের মাংস খায়। ব্রাহ্মণের ভাষা একটা বুড়ো শকুন বুঝেছিল এবং তাতে তার প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট যে নির্দিষ্ট মানুষের মাংস খাওয়ায় তাদের ধর্ম। শকুনরা পালক দিয়ে পশু ও মানুষের আত্মা চিনতে পারে। কুকুর-বিড়ালের আত্মা যদি মানুষ পায় তাহলে মানুষও অমানুষ হয়ে যায়। এই

সমস্ত মহামূল্যবান কথা শুনে ব্রাহ্মণের মুখে নিজ বাড়ির গুপ্ত কথা উচ্চারিত হয়। শকুনের দেওয়া পালক গোজা দিয়ে সে নিজের বাড়ির দুই বউকে দেখল। দেখে আবিষ্কার করল যে, এক বউ 'কুকুর' আর এক বউ 'শুয়োর'।[৪২] এই ভাবেই গল্প শেষ হয়। সাঁওতাল সম্পর্কে ব্রাহ্মণ জাতির ধারণা এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তারই বৃত্তান্ত সাঁওতাল লোক কাহিনিতে উঠে এসেছে।

'ছেঁড়া কুড়চির মালা' গল্পেও নলিনী বেরা সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। গল্পে জানা যায় সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস। সাঁওতালরা বীরহোড় নামেও পরিচিত। তারা বন-জঙ্গল কেটে 'ডাহা' বা 'ডাহি' জমিতে চাষ করে। তারা জঙ্গলে বসবাস করে বলে তাদেরকে জঙ্গলের মানুষ বলা হয়। বন-জঙ্গলে সাঁওতালরা হাঁড়িয়া ও শালপাতার বিড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। তবে এই গল্পে লেখক বনজঙ্গলে বসতি স্থাপনের চিত্র বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে লেখকের আরও এক অন্যতম গল্প হচ্ছে 'ঘবা, তিহা-র গল্প'। গ্রামের মানুষ যখন শহরে গিয়ে বসবাস করে এবং শহরের বুকে দাঁড়িয়ে গ্রামজীবনের বৈচিত্র্যময় আখ্যান স্মৃতির পটে ঘুরতে থাকে। গ্রাম ও শহরের অপার পার্থক্য একজন চরিত্রের অভিজ্ঞতার নিরিখে ব্যক্ত হয়েছে গল্পের মর্মে মর্মে। গল্পের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, মেদিনীপুর গ্রামের জমিদার শ্রীসর্বেশ্বর সাঁপুই-এর ছেলে বিশ্বেশ্বর কলকাতার কৈলাস বসু স্ট্রিটে মেস বাড়িতে থাকে। সেই মেসে থেকে বাংলায় এম.এ পড়াশোনা করে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে অল্প-বিস্তর কবিতাও রচনা করে। আর সেটা নিয়ে তার শহুরে বন্ধুরা গ্রামের কবিতা নিয়ে মজা করে। কিন্তু কলকাতার মেসে শুয়ে শুয়ে বিশ্বেশ্বর মনে মনে গ্রামের কথা ভাবে– 'ডুমুরবাঁধ, জোড়বাঁধের ভূমিহীন দরিদ্র সাঁওতাল কামিন মনিষরা জন খাটতে হই হই করে আমডরার খেতে–খামারে নেমে পড়েছে। মাঠময় কার্তিক-অঘ্রানের ছড়ানো রোদ।

রোদের তাত এড়াতে কারোর মাথায় তালপাতার টোকা। কেউ বা পিঠে-মাথায় গামছাটাকেই বেঁধে রেখেছে কায়দা করে।’[৪৩] বিশ্বেশ্বর ডিসেম্বর মাসে ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি পেয়ে গ্রামের বাড়ি আমডহরায় ফিরে যায়। সকালবেলায় সে ডুমুরবাঁধ ও জোড়বাঁধ গ্রামের সাঁওতাল জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করে। সেখানকার কর্মঠ সাঁওতাল নারী-পুরুষরা নামাল কাজে বিদেশ যায়। বস্তুত বিদেশ বলতে এখানে অন্যদেশ নয়, গ্রাম থেকে দূরবর্তী ধনী ব্যক্তির গ্রামগঞ্জ। তখন বাড়িতে থাকে শুধুমাত্র সাঁওতাল বুড়োবুড়ি, নাবালক-নাবালিকের দল। শীতকালের রোদ পোহাতে পোহাতে অন্যদেশে যাওয়া কাছের মানুষগুলির জন্য তারা অপেক্ষায় থাকে সারাদিন। আর যারা বিদেশে যায়নি, তারা স্থানীয় আমডহরায় দিন মজুরি কাজ করে। এখানকার মানুষের জীবন চিত্র নিয়ে বেশ কয়েকটা কবিতা রচনা করে বিশ্বেশ্বর। এই কবিতাগুলি রচনার তার একমাত্র উদ্দেশ্য শহর কলকাতার পাঠক। তার শহরের বন্ধুবান্ধব ও লোকজন যেন গ্রামে অবস্থিত আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি বুঝতে পারে। সেই কারণেই গ্রামে ফিরে এসে বিশ্বেশ্বর গ্রামগুলিকে ঘুরে ঘুরে দেখে এবং আদিবাসী জীবনের দিকদিগন্ত অনুসন্ধান করে ক্রমাগত। সাঁওতাল জাতির কাহিনি, কথাকাহিনি, রূপকথা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিশ্বাস সংগ্রহ করে বিশ্বেশ্বর। তার সাথে পরিচয় হয় সাঁওতাল বুড়ো পিতম হাঁসদার। বিশ্বেশ্বর বুড়ো মানুষের মুখে প্রাচীন উপকথার গল্পকাহিনি শুনে- ‘উল বেলএ হরমো তাম হো। বেল সিঁজো তু-আ তাম হো। নো-আ হরমো, নো-আ তো-আ দো। ওকু-এ লাগাত কান।’[৪৪] এই হেঁয়ালির অর্থ বিশ্বেশ্বর বুঝতে পারে না। এর অর্থ বোঝার জন্য পিতম বুড়ো তাকে গুতিকোড়া আর কাড়মিকুড়ির কাহিনি শোনায়। গুতিকোড়া এক গরিব ঘরের ছেলে। আর কাড়মিকুড়ি এক ধনী ‘পারানিকে’র মেয়ে। তাদের দু’জনের ভাব-ভালোবাসা সম্পর্ক। তারা দেখা করে কুদোহুড়ির জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে গুতিকোড়া গরু চরাত আর বাঁশি বাজাত। দলদলি ঝরণাতে কাড়মিকুড়ি কলসি কাঁখে জল আনতে যায়। বাঁশির টানে সমাজের লাজ-লজ্জা এবং বাড়ির মান-সম্মানকে পিছনে ফেলে

দিয়ে কাড়মিকুড়ি গুতিকোড়ার কাছে যায়। একদিন গুতিকোড়ার আসতে দেরি হয়। সেইদিন কাড়মিকুড়ি রেগে গিয়ে বলে– 'যাও তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি গরিব গুতিকোড়া, আমি ধনী পারানিকের মেয়ে। আমার সম্মান নিয়ে হেলা করার তোমার কোনো অধিকার নেই।'[৪৫] তখন কেঁদে কেঁদে গুতিকোড়া বলে– 'আমার কি দোষ বল? আমি তো কাড়া-মোষ গোহালে রেখে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি। আর আমি যে গরিব, আমি যে গুতিকোড়া- সে তো জেনে শুনেই তুমি আমাকে ভালোবেসেছ! বেশ, আমি চলে যাছি। আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!'[৪৬] তখন রেগে-দুঃখে গুতিকোড়া ফিরে যায়, সেই সময়েই কাড়মিকুড়ি বলে উঠে– 'আমার কৈশোরে-তুমি আমার ছিলে। আমার যৌবনের ফুল যখন ফুটল– তখন তুমি পর হলে।'[৪৭] তখন গুতিকোড়া কাড়মিকুড়িকে ঠিক মতো বুঝতে না পেরে হতচকিত হয়ে ফিরে দেখে। আর তখনই গুতিকোড়া সেই গানটা গায়। যার বাংলা অর্থ– 'পাকা আমের মতো রসে টসটসে তোমার দেহ। পাকা সুগোল বেলের মতো বিস্ময়কর তোমার স্তন দুটি। কিন্তু এখন, কার জন্য এসব– এই রসালো শরীর, শাঁসালো সুগোল বুকজোড়া?'[৪৮] মেয়েটি গান গেয়ে উত্তর দেয়, যার বাংলা অর্থ এই রকম– 'আমাকে নিয়ে আর কিছু বল না, প্রিয়! আমার শরীর নিয়ে আর তুমি আফশোস কর না। প্রিয়তম এই রসালো দেহ এই সুগোল স্তন দুটি কেবল তোমার জন্যই।'[৪৯] বুড়ো সাঁওতাল মানুষের মুখে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে কাহিনি যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর রাখালের ভাব-ভালোবাসা যে ফেলা দেওয়ার নয়, তা বুঝতে পারে বিশ্বেশ্বর।

নলিনী বেরা তাঁর 'ঘবা, তিহা-র গল্প' এর মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামের ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন। গ্রামের জোতদার-জমিদাররা নিম্নশ্রেণির মানুষের উপর কীভাবে অত্যাচার করে এবং নারী জাতির প্রতি তাদের কতটা লোভ থাকে- তারই বয়ান এই গল্পের পাতায় পাতায় উঠে আসে। নলিনী বেরা এই গল্পে খুব সচেতনভাবে গ্রামের জটিল সমস্যার

পরিস্থিতি উত্থাপন করেছেন। গ্রামে বিশ্বেশ্বরদের বিশাল জমি-জায়গা আছে। এখানে তাদের বাড়িতে বহু সাঁওতাল মুনিশ কাজ করে। তাদের মধ্যে জোড়বাঁধের অন্যতম নারী রতনমণি মুর্মু, তার ডাক নাম রতনি। পোয়াতী মেয়ে সে। তার একটা এক-দেড় মাসের শিশু সন্তানও রয়েছে। রতনির বয়স তিরিশ থেকেও কম। মেয়েটা চঞ্চলা প্রকৃতির।

গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় সকালবেলায় পিতা-পুত্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনার চিত্র। বিশ্বেশ্বর সাঁওতাল গ্রাম ডুমুরবাঁধ, জোড়বাঁধের দিকে ঘুরতে যায়। অন্যদিকে সর্বেশ্বর সাঁপুই এঘর-ওঘর ছুটে ছুটে তদারকি করে। তার হাঁস-মুরগি আছে। তদারকির আলাদা লোক রাখা আছে। সেই দিন সকাল থেকে একটা পাখির ডাক শুনে– 'টি-উ-ল টু-টু'। কিন্তু পাখিটার নাম কোনো মতেই জানতে পারে না। সেখানে মুনিশ রতনিকে দেখতে পায়। বিকাল বেলা ধানঝাড়া শেষ। কাজ সেই রকম নেই, ফলে তার মুনিশরা বাড়ি চলে যায়। যেটুকু অবশিষ্ট পড়ে আছে, সেটার জন্যে কাজ করে রতনি। রতনির কাছে গিয়ে সর্বেশ্বর বারেবারে ডাক দেয়। রুক্ষ টাঁড়ের মতো ঢিবি-ঢাবা শরীরের রতনি, ধামায় ভরে ধান তুলছে। সর্বেশ্বর বারবার রতনিকে বিরক্ত করে। আচমকা ধানের গোলায় ফেলে রতনমণিকে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষণ করে সর্বেশ্বর। গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে খুব উত্তেজনা পরিবেশ দেখা যায়। কারণ, সর্বেশ্বর যে রতনিকে ধর্ষণ করেছে, তা সমগ্র গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ষণের খবর রতনি তার স্বামীকে বলে দেয়। ডুমুরবাঁধ, জোড়বাঁধের সাঁওতাল গ্রামে সালিশি সভা বসে। সভার বিচারে সাঁপুইয়ের জরিমানা হয়। কিন্তু সে টাকা না দিয়ে সাঁওতালদের ফাঁকি দেয়। ফলে সাঁওতালরা ভনায়ক ক্ষুব্দ হয়। ক্ষুব্ধ সাঁওতাল 'শারজম গিরা' আইন প্রয়োগ করে। সর্বেশ্বর সাঁপুইয়ের বিরুদ্ধে যে 'শারজম গিরা' পাঠানো হয়। তাতে হাজার হাজার সাঁওতাল কাঁড়-কাঁড়বাঁশ-টাঙ্গি-বল্লম- তির ধনুক নিয়ে হাজির হয়। যত বেলার দিকে যায় ততই যেন সর্ব্বেশ্বরের চিন্তা বাড়ে কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা তার ছেলেকে সাহস জোগায়। এই দিকে সাঁওতালরা ধামসা মাদল বাজিয়ে,

রেগড়া টামাক বাজিয়ে কাতারে কাতারে এসে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে মেদিনীপুর থেকে সশস্ত্র পুলিশের ডাবল ব্যাটেলিয়ান, প্ল্যাটুন ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও ৪০০ পুলিশ এবং বাজুড়া থেকে সৈন্য ও ৬০০ পুলিশ আসে। পুলিশ আছে বলেই সর্বেশ্বরের কোনো ভয় নেই। কারণ পুলিশ তাদেরই দলের লোক।

এই সব ঘটনা দেখে বিশ্বেশ্বর নিজের আমডহরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতার কৈলাস বসু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে চলে যায়। আবার তার শুরু হয়ে যায় মেস বাড়ীর জীবন। তারপর বিশ্বেশ্বর বহুদিন যাবত বাড়ির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। গ্রামের খবর সংবাদপত্রেই দেখে নেয়। সেখান থেকেই খবর পায় যে গ্রামের অবস্থা কীরকম বর্তমানে রয়েছে। সে আমডহরার জঙ্গলে বাঘ মারার, হাতি মারার খবর পায়। নানা কারণে বিশ্বেশ্বর বাড়ি যায়নি। তার বাবা ও ভাই এর উপরে রাগ হয়। তার রাগ হয় গ্রামের উপরে। সে কোনো লজ্জায় বাবার সঙ্গে একঘরে থাকবে। বিশেষত ডুমুরবাঁধ, জোড়বাঁধের সেই 'দুড়ুপে দুড়ুপে' বলে উঠা, সবজান্তা সাদা চুলদাড়িঅলা সাঁওতাল বুড়োটার কাছে সে লজ্জায় মুখ দেখাবে কী করে? আর ধর্ষিতা রতনমণি– সে কী বলবে? এই সমস্ত কথা চিন্তা করে সে বাড়ি যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমডহরা গ্রামে ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে সাঁওতালদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। নতুন করে আবার গ্রামের ভাষা শেখে। গ্রামের জীবন সে মানিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়।

'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে লেখকের দৃষ্টিকোণ দিয়েই সুনি সাঁওতালের জীবনদশা ও মর্মান্তিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'খোরপোষ' গল্পে সনাতন টুডুর জীবনের করুণ অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। 'ঘবা, তিহা-র গল্প'– গল্পের গ্রামের শিক্ষিত ছেলে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টিতে সাঁওতাল জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গল্পে বিশ্বেশ্বরের দ্বন্দ্ব বার বার ধরা দিয়েছে। এ যেন নিজের চরিত্রের সঙ্গে নিজেরই দ্বন্দ্ব। গ্রাম্য সাঁওতাল সমাজকে উপেক্ষা করতে পারে না, আবার

গ্রহণও করতে পারে না। এই দ্বন্দ্বের মূলে তাঁর পিতার সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের লড়াই। গ্রামের সমস্যাকে উপেক্ষা করে শহর কলকাতাতে বহু দিন থেকেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো সমস্যা থেকে বহু দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়। আবার তাকে মিশতে হয় সাঁওতাল জনজাতির সঙ্গে।

সৈকত রক্ষিতের বেশ কিছু গল্প আছে, যে গল্পগুলিতে সাঁওতাল জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে জীবনের বিছিন্নতা, অস্তিত্ব ও সংকটকে গল্পকার তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'মাড়াই কল' গল্পে মাংসহীন শরীর চেপুলাল বেসরার, সুষম ছন্দ ও রীতিতে গাঁথা তার শরীরে হাড়ের মালা। চেপুলালের অকপট হাসি ও রক্তহীন বিবর্ণ মাড়ির মধ্যে রয়েছে নির্বিকারচিত্ততা এবং উদাসীন মনের অভিব্যক্তি। কুঞ্জ মোদক হলো তার মালিক। চেপুলাল গাড়োয়ান হিসাবে মালিকের বাড়িতে কাজ করে। তাকে দিনরাত বনে-পাহাড়ে গরুর গাড়ি চালাতে হয়। চেপুলাল বনের ভালুক, বুনো হাতির ভয় পায় না, অবশ্য ভয় পেলেও তার কোনো বিকল্প উপায় নেই। বনে-জঙ্গলে থাকতে থাকতে চেপুলাল যেন জংলীর মতোই বেঁচে থাকে। শুধু তার মালিক কুঞ্জ মোদক জংলী হয়নি। যুগ যুগ ধরে চেপুলালের মতো নিরীহ মানুষগুলি জংলী হয়ে আছে।

চেপুলালের বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যু সবই কুঞ্জ মোদকের হাতে নিয়ন্ত্রিত। জীবনে আর কতদিন বেঁচে থাকবে চেপুলাল, সেটা নিয়েও সে বিশেষ চিন্তিত। মালিকের জবানে বিশেষ উত্তর পাওয়া যায় না। চেপুলালের জীর্ণ শরীরের প্রতি মোদকের মায়া-মমতা নেই। কারণ চেপুলালের মৃত্যু হলে কুঞ্জ মোদকের কোনো ক্ষতি নেই। চেপুলালের ছেলে বড় হলে মোদকের কাছেই কাজ করবে। বংশ পরম্পরা ও পারিবারিক সূত্রেই চেপুলাল মোদকের চাকর।

চেপুলালের তেমন কোনো পারিবারিক জীবন নেই। তবে তার সংসার আছে। অথচ পরিবারের লোকের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ও ব্যক্তিগত কথোপকথনের জায়গা নেই। তার স্ত্রীর নাম

হলো ভাবনি। ভাবনির সারা শরীরে ময়লা, শরীর থেকে আলাদা করে ময়লা বোঝা যায় না। ময়লা ও গায়ের রঙ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। এ যেন জঙ্গলেরই ক্ষয়িষ্ণু এবং শেষতম অসভ্য প্রজাতি সে। কুঞ্জ মোদকের অনুপস্থিতে সকাল বেলায় ভাবনি গুড় খেতে থাকে কাজের ফাঁকে। ভাবনি আখ-রসের গুড় তলপেটে লুকিয়ে রাখে, আগামী দিনগুলিতে যাতে একটু খেতে পায়। মূলত বাসি ভাত আর শাকই হলো তাদের খাদ্য। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ ছাড়া বিশেষ কোনো উপার্জন নেই। ভাবনি অবশ্য সাঁওতাল নারীর মতোই তাদের সঙ্গে মাথায় করে ঝাঁটির বোঝা পাহাড় থেকে নিয়ে যায় সেনাবনার হাটে, সেটা বিক্রি করে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে তাদের এক পুত্র সন্তান আছে। নাম তার হীরালাল। হীরালালের জন্ম হওয়ার আগে থেকেই যেন হীরালালের জীবন বৃত্তান্ত ঠিক হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে যাই হোক না কেন, এখানে চেপুলালের কোনো লাভ নেই, লাভ বলতে কুঞ্জের আছে। চেপুলাল খুব সহজ সরলভাবে সত্য কথা বলে দেয় তার ছেলের জন্য। অর্থাৎ মালিকের কাছে সারা জীবন কাজের লোকের অভাব হবে না।

কুঞ্জ মোদকের গুড় উৎপাদন করার মাদলা রয়েছে। মাদলা হলো পিনিয়ন। চালা ঘরের মেঝেতে উনুনের পাশে ঘুর ঘুর করে সারা দিন ঘুরতে থাকে। আর সেখান থেকে গুড় উৎপন্ন হয়। চেপুলালের আরাম-বিরাম বলে কিছু নেই। চেপুলালের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সবই তার শরীরের প্রাচুর্য। তার সমস্ত শরীরের হাড়গুলি দেখা যায়। গুড়ের ভাপে আর ছাইয়ে চেপুলালের অবস্থা খুব করুণ হয়ে উঠে। সে স্নান করার সময় পায় না। দিনের পর দিন কাজ করতে করতে চেপুলালের শরীরে ঠাণ্ডা জমে গেছে, কপ বসে গেছে গলায় যার ফলে তার রোজ ঘন ঘন কাশি হয়। চেপুলাল কম্বলের অভাব বোধ করে ঠাণ্ডাতে, শীতের সময় সারারাত কাঁপতে থাকে। ঠাণ্ডা-গরম বৃষ্টিবাদল দিনে সাঁওতালরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বন-জঙ্গল মাঠে-ঘাটে কাজ করে। আর গুড়ের টাকা গুনে কুঞ্জ মোদক। একটা টাকাও কম নেয় না। কিন্তু

চেপুলালের অবস্থা যে খুব করুণ, তার খেয়াল নেই কুঞ্জ মোদকের। রাতের বেলা হাতি আসার ফলে গ্রামের সব লোক হাতি তাড়াতে যায় কিন্তু চেপুলাল যেতে পারেনি। অন্যদিকে কুঞ্জ প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে আসে। ততক্ষণে চেপুলালের মৃত্যু হয়। কুঞ্জ ভয়ে ভয়ে বলতে বলে-' হাড়িক, হাড়িক! বলতে বলতে সে, ভয় এবং সন্দেহ নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই চণ্ডাল! আজ উঠবি ন নাই রে?'[৫০] । জীবিত অবস্থায় আসলেই চেপুলালের জীবন অত্যাচার করেছে কুঞ্জ। আর মৃত অবস্থায় কুকুরের খাদ্য হয়ে গেছে চেপুলাল। চেপুলালের মতো চরিত্র পুরুলিয়া ছাড়াও বাঁকুড়া-মেদিনিপুর-টাটা ও চাণ্ডিল অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায়। গ্রামের মানুষগুলি আখের ক্ষেতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আর লাভের অংশ ভোগ করে মহাজনবর্গ। এভাবেই চেপুলালের মতো গ্রাম বাংলার আদিবাসীরা মহাজনদের কাছে কাজ করে অনন্তকাল ধরে।

সৈকত রক্ষিতের অন্যতম গল্প হলো 'রাঙা মাটি'। এই গল্প ডাইনি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সাঁওতাল সমাজে ওঝার গুরুত্ব সর্বাধিক, তার স্থান ভগবান তুল্য। গল্পে দেখা যায় লোকালয় থেকে বহু দূরের পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে আদিবাসীদের বসবাস। সেখানে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত। সামনে টিলা, পিছনে পাহাড়, তারই মাঝখানে সাঁওতাল গ্রাম রাঙামাটি অবস্থিত। তবে গ্রাম ঠিক নয়, মাত্র কুড়ি-বাইশটি ঘর। এই কয়েকটি ঘরে শ'দেড়েক সাঁওতাল মানুষের বসবাস। অবশ্য অল্প সংখ্যক সাঁওতাল হলেও নর-নারীর বৈচিত্র্য সাজসজ্জার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিশেষ করে নারীরা মাদাল বিচির মতো কালচে অথচ মসৃণ হারের রঙের হার ব্যবহার করে। তাদের গলায় ও হাতে উল্কির চিহ্ন থাকে, এতে যেন সেই আদিবাসী নারীদের সৌন্দর্য অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠে। দূরের কোনো সাঁওতাল মেলা থেকে অল্পবয়েসী মেয়েরা হাতভর্তি প্লাস্টিকের চুড়ি পরে আসে। এছাড়া মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ডাইনি বিশ্বাসী মানুষের অঙ্গে তাবিজের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ সমগ্র রাঙা মাটি

গ্রামের মানুষ ঝাড়ফুঁক বিশ্বাসী। এমনকি গ্রামের লোক তাদের সাংসারিক অশান্তি থেকে শুরু করে রোগজ্বালা সমস্ত কিছুতেই ওঝার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বনমালীও ওঝাকে বিশ্বাস করে। বনমালী সংসার চালানোর জন্য সারাদিন মাঠে খাটে, সেই সঙ্গে শুয়োর ও গরুর ব্যবস্যা করে। বনমালীর এক শুয়োর হারিয়ে যায়। শুধুমাত্র বনমালী নয়, গ্রামের সমস্ত মানুষের কাছে একটা গভীর প্রশ্ন চিহ্ন উঠে আসে যে, শুয়োরটা কোথায় হারিয়ে গেল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমগ্র গ্রামের মানুষ শুয়োর খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করে ওঝার মাধ্যমে। মূলত ওঝা যা নির্দেশ দেয়, সেটাই তারা খুশি মনে গ্রহণ করে। ফলত, গ্রামের লোক রাঙা মাটির পার্শ্ববর্তী গ্রাম শালপাড়া থেকে ওঝাকে ডেকে আনে। শালপাড়ার ওঝার বাটি চালানোর মধ্য দিয়ে দোষীকে খুঁজে। বাটি চালানোর পদ্ধতি এরকম-

> বাটিতে রাখে সামান্য ইঁদুর মাটি, কিছু দুব্বা ঘাস। একমুঠো ধানের ওপর সেই বাটি রেখে সে ভিড়ের মধ্যে তার নির্বাচিত লোককে সেটা ছুঁয়ে থাকতে বলে। এবং নিজে জ্বলন্ত ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে যখন মন্ত্র পড়তে থাকে আর থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, চল, 'চল মা সিংহবাহিনী', তখন দেখা যায়-বাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে শেষমেশ তা কোনো একজনের দিকে ধাবিত হয়।[৫১]

বস্তুত ওঝার এই সূক্ষ্ম কলাকৌশল গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারে না। গ্রামের লোক ওঝার এই পদ্ধতিকেই অব্যর্থ আর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে। যে কোনো কারণেই হোক বনমালীর শুয়োর নন্দলালের আস্তাকুঁড়ের কাছে চরে বেড়াচ্ছিল। ফলে গ্রামের লোক ওঝার কারুকার্যের দ্বারা নন্দলালকেই চোর হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা দিয়ে গ্রামের মানুষ আনন্দফূর্তি করে। কিন্তু নন্দলাল মনে মনে বনমালীকে উদ্দেশ্য করে বলে- 'ঠিক আছে! হামিও তকে বুঝাব।' মূলত নন্দলালের এই ক্রোধ থেকেই একটা সময় বিরাট সমস্যা তৈরি হয়। নন্দলাল পরিকল্পনা করে বনমালীকে দোষী সাব্যস্ত করায় এক অসুস্থ গরুর মাধ্যমে। যে গরুর রোগ সারানোর জন্য ওঝা গুণ্ডা বেঙিকে

ডেকে আনা হয় গ্রামে। সে নন্দলালের গরুকে দেখে এবং রোগের ঔষুধের নির্দেশ দেয়। নন্দলাল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটাছুটি করে ওষুধ তৈরির মাল-মশলা জোগাড় করে-

> জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে নানা শিকড়-বাকড়। সীতা চুল, রাম চুল, লক্ষ্মণ চুল এমনি সব নামের লতা-পাতা চাটান পাথরে থেতো করে নেয়। মানবাজারের পাদু ঠাকুরের মুদিখানা থেকে আনে কাগজের পোঁটলা করা বেঙি মশলা। বাটনার সঙ্গে মশলা দিয়ে সে এক জামবাটি মিশ্রণ বানায়। আর পুকুর ঘাট থেকে নিয়ে আসে একটা কালো ব্যাঙ।[৫২]

নন্দলাল গরুর চোয়াল ফাঁক করে একটা জ্যান্ত ব্যাঙকে গলিয়ে দেয়। তারপর জামবাটিসুদ্ধ ওষুধ-জল ঢেলে দেয়। ওঝা গুঙা বেঙির মতে গরুর পেটে পোকা রয়েছে। সেই পোকা মারার জন্য ওঝা এক সপ্তাহের ওষুধ দেয়, দিনে দুবার করে গরুকে খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু খাওয়ানোর পরও গরু সুস্থ হয় না। বরং গরু আরও ভয়ানক কাহিল হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত গরু মারা যায়। গুঙা বেঙি মতে নন্দলালের গরুকে ডাইনি খেয়েছে। ফলে খুব তাড়াতাড়ি করে গ্রামের লোক শালপাড়ার বংশী ওঝাকে ডেকে আনে। বংশী ঠাকুরের মন্ত্র পড়া ও চিকিৎসা পদ্ধতিও কম বিচিত্র নয়-

> গরুর চারেপাশে গণ্ডি কেটে, সে, গণ্ডির দাগে দাগে একটার পর একটা জ্বলন্ত ধূপকাঠি বসাই। এই বহুমুখি ধোঁয়া দিয়ে সে মন্ত্রশক্তির লোকদেখানি পরিবেশ তৈরী করে। মরা গরুর শিংয়ে তেল দেয়। সিঁদুর দেয়। তার ঢাউস পেটের ওপরেও সিঁদুরের কয়েকটি আঁক টেনে স্বচরিত মন্ত্র অনর্গল বিড়বিড় করে যায়। মাঝে মাঝে, ‘ভগবতী! মা-সিংহবাহিনী।’ হুঙ্কার ছাড়ে। গণ্ডির মধ্যিখানে গাইকে লক্ষ্য করে মুঠো মুঠো ছুঁড়তে থাকে ধান।[৫৩]

বংশী ঠাকুরের মন্ত্রের নির্দেশে গ্রামের লোক বনমালীর বউ সঞ্চারিণীকে ডাইনি হিসাবে সন্দেহ করে। আর একবার যদি ডাইনি বলে কেউ সন্দেহের তালিকায় আসে, তাহলে তার রক্ষা নেই। তাই সখা বাবার কাছ থেকে ফিরে এসে, হিংস্র ও নিষ্ঠুর মানুষগুলো বনমালীর ভিটেমাটি ধ্বংস করে। একমাত্র গ্রামের লোক কালী, যে ডাইনি বিশ্বাস করে না। তাই সে প্রতিবাদ করে উঠে,

গ্রামের মানুষকে পুলিশ-প্রশাসনের ভয় দেখায়। কিন্তু গ্রামের লোক পুলিশের বিচার চায় না। তাদের মতে গ্রামের সমস্যা গ্রামের লোকই দেখবে। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন ও মাতব্বর মানুষরা ষোলো আনা জরিমানা বসিয়ে দেয় দোষীর উপর। তাই গল্পে দেখা যায় গ্রামের লোকের অত্যাচারে ভয়ার্ত সঞ্চারিণী ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। সেই করুণার চোখে তাকিয়ে বনমালীর মন থেকে কুসংস্কার যেন মুছে যায়–

> এতদিন সে-ও বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু এখন, নিজের বুয়ের এই শোচনীয় পরিণতি, তাকে, তা অজ্ঞানতাকে-বিবেক ও বুদ্ধি আঘাত করল। যে তার শ্রমে-দারিদ্র্যে, হতাশায় ক্লান্তিতেও অবিচল সং দিয়ে এসেছে, তার অন্তর্নিহিত স্নেহ-মমতার অবমাননায় নিজেকে সে ভেবে বসল মূঢ়। অনুশোচনাও হলো তার।[৫৪]

বনমালীর শাস্তিস্বরূপ গ্রামের লোক তিনশো টাকা জরিমানা হিসেবে ধার্য করে। জরিমানার তিনশো টাকার জন্য মাথা নত করে সে আর্তনাদ করে উঠে। রবিবার দিনে মানবাজারের হাটে গরু বিক্রি করে জরিমানার তিনশো টাকা জোগাড় করে গ্রামের লোককে দিয়ে দেয়। তারপর অন্ধকারের রাতে কালী, বনমালী ও সঞ্চারিণী গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়। তাদের গরু-ছাগল-শুয়োর নিয়ে নিঃশব্দ অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বহু দূরে পালিয়ে যায়। ভিন্ন গ্রামে অথবা পাহাড়তলির কোনো নিরূপদ্রুব গাছের তলায়। যেখানে সরীসৃপের মতো বিষধর মানুষ নেই।

'ডাইনী' বিশ্বাসের জন্যে ওঝা ডাকা, সখা-ঘর যাওয়া, ধূলা-উড়ানির হেরাফেরি বাবদ চাল-চিঁড়ায় টাকা পয়সা খরচা হয়। এই জরিমানার পিছনে শিক্ষাহীন গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা জানে না, বোঝে না। গ্রামের মানুষ আইনগত নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত নয়। তাদের সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে এক প্রশাসন কায়েম করে রেখেছে। সেখানে বনমালীর মতো নিরীহ ও দুর্বল লোকের বউ ডাইনি সাব্যস্ত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার হয়। কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখে অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুম চলে। কুসংস্কারের বিরোধিতা করলেই ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হয়।

সৈকত রক্ষিতের 'ছল' গল্পে দেখা যায় সাঁওতাল গ্রামের নাম জারটাঁড়। এই গ্রামে বন-বাদাড় খুব বেশি, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সেই তুলনায় খুব কম। চাষযোগ্য যতটা জমি আছে, তাতেও তিন বছর থেকে বৃষ্টির অভাবে ঠিক মতো চাষ হয় না। ফলে সাঁওতালরা ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জারটাঁড় গ্রামের ধ্বংস-লীলার কথা পার্শ্ববর্তী দুলদুলি গ্রামের ওঝা বলে। সখাবাবার কথায় গ্রামের লোক কালসুলি হাঁসদার বউকে ডাইনি চিহ্নিত করে। কালসুলির বাবা সহ্য করতে না পেরে, প্রতিবাদ করে উঠে। কালসুলি ও তার বাবা গ্রামের লোকের বিচার মানতে না চাইলে, ঘর্মাক্ত ও উত্তেজিত রামলাল প্রবল ধমক দিয়ে গর্জে উঠে- 'ইয়াদের এত বড় হিম্মৈত? ডাইন-ভূত মাইনবেক নাই? ডাইন-ভূত মিছা? আগু হঁ স্বীকার করুক, তবে ইয়াদেরকে ছাড়ব।'[৫৫] ভক্তি হাঁসদাও ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে ডাইনি বিশ্বাসের কথা। গ্রামের লোক কালসুলি হাঁসদাকে জরিমানা করে আশি টাকা নগদ ও তিন মণ ধান। জরিমানা দিতে না চাইলে গ্রামের লোক বর্গি উল্লাসে কালসুলির বাড়িতে উৎপাত করে, ঘর থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যায়। তখন কালসুলি বলে উঠে-

> নাই। স্যাটি হবেক নাই। তুমরা জৈর্‌বানা লিবে, তাইলে ক্যানে হামার বউকে গাঁয়ের ল্যা বাহারে খেদে দিবে? আর উ-ত এখনও মানুষই খায় নাই। তাইলে আর কিস্যার ডাইন? যেদিনকে উ মানুষ খাবেক, সেদিনকে খেততে হবেক নাই? হামিই উয়াকে টুঁটিয়ে পা দিয়ে চৌকেটে মারব ![৫৬]

কালসুলির স্ত্রী কালিন্দী মানুষ খায়নি, ফলে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। কিন্তু গ্রামের লোক কালিন্দী হাঁসদার দিকে আঙুল তুলে বলে- 'একটা ঘরে জিন্ত মানুষই ঢুঁকায় ইয়াকে একরাত কুলুপ দিঁইয়ে আটক রাখা হোক। যদি না খায়, তবে ডাইন্ ন ফাইন?'।[৫৭] সবার মধ্যেই ভয় কাজ করে, ফলে কেউ সাহস পায় না। শেষ পর্যন্ত রামলালই ডাইনির সঙ্গে একরাত থাকে। একটা ঘরের মধ্যে তারা বন্দী হয়।

অন্ধকার রাতে রামলাল কালিন্দীর কাছে যায়। কালিন্দী ভয়ে ভয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু রামলাল কালিন্দীকে বেশ জটিল জালে জড়িয়ে ফেলে। ডাইনি সন্দেহ করে গ্রামের লোক কিছুতেই তাকে ছাড়ে না। আর তাকে নিয়ে রামলালের দীর্ঘ দিনের গোপন চাওয়া-পাওয়া ছিল। তখন কালিন্দী বুঝতে পারে ঘরের ভিতরেও ডাইনি আর বাইরে গেলেও ডাইনি। তার মৃত্যু অবধারিত। সে মরতে চায় না, বরং ডাইনির অপবাদে বেঁচে থাকতে চায়। এই গ্রামে তার কোনো মতেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়-

> এই ঘর থেকে বেরোতে হলে তাকে তো ডাইনি হয়েই বেরোতে হবে? যদি সে পালিয়ে যায়? জাড়াটাঁড় থেকে কোলিয়ার দিকে চলে যায়? তাহলে তো রামলালকেও পালিয়ে যেতে হবে? রামলাল সেকথাই বলে কালিন্দীকে। বলে, ‘যাবি? চ ক্যান্নে, গাঁয়ের ল্যা পালাঁইয় হামরা কথাও চৈলে যাব![৫৮]

জমাট অন্ধকারে কালিন্দী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে রামলালের সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরের দিন গ্রামের লোক তাদেরকে দেখতে পায়নি। তারা রটিয়ে দেয়- ‘কিন্তুক ডাইন্? কুথ্য গেল ডাইনটা? কৌতূহলী গ্রামবাসীদের এই প্রশ্নের জবাব তারা বলে, ডাইন্ কি আর থাকে? রামলালকে খাঁইয়ে উ কুথায় ছন্ন হয়ে গেছে!’[৫৯] রামলাল তার গোপন রিরাংসা পূরণ করবার জন্য ‘ডাইনি’ প্রথার রাজনীতি করে। গ্রামের লোককে বোকা বানিয়ে রামলাল কালিন্দীকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

‘যশোমণি মুর্মু’ গল্পেও দেখা যায় যে, বান্দোয়ান বাজার থেকে দক্ষিণ প্রান্তে বেশ দূরে পাহাড় কেটে ঘন জঙ্গলের মধ্যে লতাপাড়া, কুচিয়া ও দুয়ারসিনি প্রভৃতি গ্রাম আছে। গ্রামগুলিতে যাওয়ার জন্যে পাকা রাস্তা নেই, ফলে শহরের মানুষের কাছে বেশ দুর্ভেদ্য রহস্যময় ভূমি, সেখানে সাঁওতাল-শবর-মুণ্ডা-ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীদের বসবাস। সভ্যতার আলো থেকে এদের জীবন বহু দূরে। গতর-খাটানো জংলী মানুষদের জীবন প্রকৃতি নির্ভর। নীল আকাশ, উঁচু-নিচু জমি, ডকা-কুসুম-শিমুল-পলাশ, টিপি-ডুংরি, সবুজ ঘাসের বন, চিরিক-মিরিক বোনি,

বুয়ানের শিস, এক ঝাঁক পায়রা প্রভৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝখানে আদিবাসীদের বসবাস। ডাঙ্গা জমির কারণে সবুজ ফসল উৎপাদন হয় না। প্রকৃতি নির্ভর তাদের জীবন খুবই কষ্টকর।

'যশোমণি মুর্মু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোমণি মুর্মু, বয়স ষাটের উর্দ্ধ হলেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তার খড়ে ছাওয়া জরাজীর্ণ ঘর। ঘুণ ধরা খুঁটি, দেয়ালে ছঁচ-মাটির লেপন। তার চারপাশে রুগ্ন মাদি-শূকর। এই গল্পে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ- এর অবচেতন চিন্তার বিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পের সময় কাল ১৫১২ থেকে ১৫৭৫ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ভবিষ্যতের কল্পবিশ্বেও সাঁওতাল সমজের চিত্র একই রকম থাকবে বলে গল্পকার মনে করেন। এখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ- কথা যশোমণির চিন্তার মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। যশোমণি তার জন্ম-মৃত্যু নিয়ে নানা চিন্তা করে। সে কখনো নিজের ছেলের কথা ভেবেছে কিংবা নিজের অতীত যৌবনের কথা ভেবেছে। কিন্তু যশোমণি জীবনের অর্থ খুঁজে পায়নি। সে উপলব্ধি করেছে আদিবাসী জীবনে সুখ নেই। ফলে যশোমণি মরণের পরে শান্তি পেতে চায়। তার বিশ্বাস ভিত্তি করেই গল্পের সারবস্তু প্রকাশিত হয়েছে।

যশোমণি তার বাড়িতে একাই থাকে, যদিও তার জাগরণ মুর্মু নামে একটা ছেলে আছে। কিন্তু তার ছেলে বাড়িতে থাকে না, ঘুরে বেড়ায়। মা টাকা না দিলে, ছেলে মাকে মারধোর করে। যশোমণি সবসময় ভয়ে ভয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। মরার পর তার দেহ শান্তি পাবে না, নরকে চলে যাবে। তাই নিজের সৎকারজনিত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বেঁচে থাকতেই করে রেখে যেতে চায়- 'আদিবাসী হয়ে জন্মে বেঁচে থেকে সে শান্তি পায়নিই, সুখ পায়নি, দড়ির জীবিকায় বাঁধা পড়ে একটা দিনও মুক্তি পায়নি সে। তাই মরার বাদে অন্তত আত্মার শান্তি চায়।'[৬০]

যশোমণি বেঁচে থাকতে সাঁওতাল পরিবারকে রীতি মেনে বলে যেতে চায়। তার মৃত্যুর পরে তার ছেলে ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করবে, সকলকে রান্না করে খাওয়াবে। যশোমণি আর বেশি দিন বাঁচবে না। দু-পাঁচ মন ধান, খুদ আর মালু, মাদি শূকর, পাই ভূট্টা, থালা বাসন আর কিছু

নগদ টাকা রেখে যাবে মাঝিবাবার কাছে। যশোমণির জীবনে হারানোর কিছু নেই। মরে গিয়ে শান্তি পেতে চায়। বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত সাকিম লুকাপানি গ্রামে যশোমণির আনুমানিক জন্ম- ১লা আঘন ১৫১২ বঙ্গাব্দ এবং মৃত্যু ২১শা কার্ত্তিক ১৫৭৫ বঙ্গাব্দ। যশোমণি তার ছেলের জন্যে চিন্তিত। তার ছেলে একা একা থাকেনি। নিজে দিয়ে রান্না-বান্না করেনি। নিজে সে কাজ করেনি। যা খেয়েছে মায়ের উপার্জন থেকে। কিন্তু এখন তাকে সব কাজ করতে হবে-

> ভোর হওয়ার আগেই টঁকা নিয়ে মহুল তুলতে নিয়ে যেতে হবে। আকালের দিনে ঘরে চাল-চিঁড়া-গুন্দলু ঘাঁটা না থাকলে শস্যহীন ধানখেতের আলে-আলে ইঁদুর খুঁজে বুলতে হবে, খরায় খানাখন্দ শুকিয়ে গেলে কানাডাঙা হাঁড়ি নিয়ে দু-ক্রোশ রাস্তা পায়দল করে নদীতে চুয়া কেটে জল আনতে হবে, বর্ষার দিনে লতাপাত ছিঁড়ে ঘরে আনতে হবে শাগ সিজাসিজি করে খাওয়ার জন্য, ঘাটে ঘাটে ঘুরে জলা জমিতে কালো কেশর পেলে ভখা পেটে তাও খেতে হবে। খেতে হবে সাপ, গোসাপ, ব্যাঙ, খ্যেড়া-পেটের জ্বালায় জিভের কথা ভাবলে চলবে কেন?[৬১]

যশোমণির কাছে জীবনের অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠে। যশোমণি বেঁচে থাকতে চায় না, আদিবাসী জীবন তার সহ্য হয় না। জঙ্গলমহলে মানুষের বসবাস সম্ভব নয়। এখানে বেঁচে থাকার অর্থ হলো নিরন্তর ঘাস-কাটা। মাথায় ভারি বোঝা বহন করা, ঘাসকে পাকিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া জীবনের অর্থ নেই। মৃত্যুর চিন্তা যশোমণিকে গ্রাস করেছে। ফলে তার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। গ্রামের লোকের নানা কথা সহ্য করতে হয় তাকে। যশোমণি গ্রামবাসীদের কথার জবাব দেয় না। তার কোনো দুঃখ ও অনুশোচনা নেই। মারাংবুরুর নাম করে সে হাতজোড় করে মরতে চায়। কিন্তু একটা সময়ে যশোমণিকে দেখে গ্রামের লোক পালিয়ে যায়। যশোমণি আপ্রাণ বলতে থাকে, সে ভূত নয়। অথচ গ্রামের মানুষ তার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। গ্রামবাসী যশোমণিকে ভূত মনে করে, ফলে যশোমণি নিজেকে প্রমাণ করতে পারে না যে, সে মরেনি। যশোমণির কান্না আসে না, গভীর শূন্যতার মধ্যে যশোমণি স্তব্ধ হয়ে থাকে। সৈকত

রক্ষিত যশোমণি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল সমাজের অপরিবর্তনীয় বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যচর্চা পুরুলিয়া জেলার ভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত আদিবাসী জীবন। যে জীবন নিয়ে বিশেষ চর্চা হয়নি, সভ্য সমাজের কাছে আজানা, সেই অনাবিষ্কৃত মানুষের জীবন সংগ্রাম, অভাব-অনটন, সংস্কারগ্রস্ত, ব্যর্থতার গ্লানি ও আদিম জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশের জীবন্ত বিবরণ তাঁর লেখনীর বিষয়বস্তু। তাঁর 'মাড়াই কল' গল্পে অত্যাচারিত সাঁওতাল জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে চিত্রিত। 'রাঙা মাটি' গল্পে ডাইনি বিশ্বাসের ভয়ঙ্কর অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে। নন্দলাল ও সঞ্চারিণীর জীবন হাহাকারে পরিণত হয় গ্রামের মাতব্বর মানুষের দাপটে। গ্রামের মানুষের কাছে পুলিশ প্রশাসনের গুরুত্ব নেই। প্রাচীন কাঠামোয় সমাজের গঠন প্রণালী, তার বিরুদ্ধে নন্দলাল অসহায় এক ট্র্যাজিক চরিত্র। তাঁর 'ছল' গল্পে ডাইনি বিশ্বাসের কেন্দ্রে ব্যক্তি মানুষের প্রবৃত্তি উন্মোচিত হয়েছে। অশিক্ষিত মানুষ সেই অন্ধবিশ্বাসের জগৎ থেকে বেরতে পারেনি। গল্পকার সাঁওতালদের কুসংস্কারের আড়ালে মানুষের প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'যশোমণি মুর্মু'- গল্পের মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর চিন্তার বিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়েছে। চরিত্রের চেতনাতে অতীত জীবনের যৌবনের অনুভূতি ফিরে আসে বর্তমান সময়ে। আবার বর্তমান সময়ে অকর্মণ্য ছেলের জন্য যশোমণি চিন্তায় মগ্ন থাকে। তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে ভবিষ্যৎ জীবনের মৃত্যু চেতনায়। সে উপলব্ধি করে আদিবাসী জীবনের সমস্যা ও সংকট। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্করারের প্রতি সৈকত রক্ষিতের গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ গল্পের ছত্রে ছত্রে।

স্বাধীনতা উত্তরকাল বাংলা গল্পে শিক্ষিত বাঙালির চেতনা ও বোধ বুদ্ধির পর্যবেক্ষণে সাঁওতাল জীবনের নানা নিয়ম-কানুন ও সমাজের বিধি-বিধানে নর-নারী সম্পর্কের জটিল প্রেম এবং আখ্যানের গতিবেগ টানটান উত্তেজনা রূপায়িত হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসা বিষয়টি শুধু

যুবক-যুবতীর নয়, সমাজের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতাল যুবক-যুবতীর রূপজ প্রেম, দেহগত প্রেম ও দাম্পত্য প্রেম আবার দেহাতীত প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। সাঁওতাল নর-নারীর রূপতৃষ্ণা, মোহ, কামনা, অভিমান, বিচ্ছেদ প্রভৃতি মানবিক প্রেমের স্তর গল্পে স্থান পেয়েছে। সাঁওতাল জীবন কেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্পের রীতি, রুচি, ভাব, ভাষার সৌন্দর্য, চিত্রধর্ম ও শিল্পরস নিপুণভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতালদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পুরাণ কাহিনি, লোককাহিনি, ইতিহাস, লড়াই, সংগ্রাম-সর্বোপরি সাঁওতাল সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বাংলা ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে, এই বিষয়ে গল্পকারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালি গল্পকাররা দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত ও শোষিত সাঁওতালদের প্রতি প্রবল সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন। সামাজিকবোধ ও দায়বদ্ধতা থেকে বহু লেখকের পর্যালোচনায় সাঁওতালদের অস্তিস্ত্ব ও জীবন সত্যের উত্তরণ ঘটেছে। বাংলা ছোটগল্পে দরিদ্র মানুষের জটিলতা ও অর্থান্বেষণের ব্যাকুলতায় শুভবোধের অকুণ্ঠ নির্মম হাহাকারে পরিণত হয়েছে। মাটি ঘেষা সাঁওতাল জীবনের শূন্যতা, যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ী সময়ের অন্তঃস্বরূপ সংগ্রাম সহজেই লক্ষণীয়। বাংলা গল্প বিশ্বে সাঁওতালদের জীবন বৃত্তান্তে সচেতন ইতিহাসচর্চার তাৎপর্যে বেঁচে থাকার তাগিদে সংগ্রামী সংকল্প ও সত্তা বিস্তৃতরূপে উৎঘাটিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৮

২। ঘোষ, সুবোধ, *চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ,* শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জৈষ্ঠ্য ১৯৪৯, পৃষ্ঠা- ২২৬-২৭

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *কালচিতি,* গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৭৯

৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮২

৫। তদেব, *শিকারী,* পৃষ্ঠা- ৫৯৭

৬। বন্দ্যোপাধায়, তারাশঙ্কর, *শিলাসন,* তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৪৩

৭। তদেব, *কমল মাঝির গল্প,* পৃষ্ঠা- ৩১৬

৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৭

৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৮

১০। তদেব, *একটি প্রেমের গল্প,* পৃষ্ঠা- ৪৫৮

১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭২

১২। তদেব, *ছোটগল্প,* পৃষ্ঠা- ২৬

১৩। চৌধুরী, রমাপদ, *লাটুয়া ওঝার কাহিনী,* গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪, পৃষ্ঠা- ২৩৬

১৪। তদেব, *রেবেকা সোরনের কবর,* পৃষ্ঠা- ২৬৯-৭০

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭০

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৩

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৮

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৭

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৮

২০। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৯

২১। তদেব, *ঝুমরা বিবির মেলা,* পৃষ্ঠা- ২৯৮

২২। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৭

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৯

২৪। তদেব, *নারীরত্ন,* পৃষ্ঠা- ৩১৫

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৬

২৬। তদেব

২৭। তদেব

২৮। তদেব

২৯। দেবী, মহাশ্বেতা, *অপারেশন? বসাই টুডু,* গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ১০১

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১০

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৬

৩২। তদেব, *দ্রৌপদী,* পৃষ্ঠা- ১৮০

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮২

৩৪। তদেব,

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৯

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, *মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন-এর ভূমিকা,* অক্ষররেখা, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৮

৩৭। বেরা, নলিনী, *ঝাঁটার কাঠি,* সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৫

৩৮। তদেব, *খোরপোষ,* পৃষ্ঠা- ১০১

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০১-২

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৬

৪২। তদেব, *ঝরাপালকের জাদু,* পৃষ্ঠা- ১১০

৪৩। তদেব, *ঘবা, তিহা-র গল্প,* পৃষ্ঠা- ৪১৮

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৩

৪৫। তদেব

৪৬। তদেব

৪৭। তদেব

৪৮। তদেব

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৪

৫০। রক্ষিত, সৈকত, *মড়াই কল,* উত্তরকথা, পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫১

৫১। তদেব, *রাঙা মাটি,* পৃষ্ঠা- ১৬৯

৫২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭০

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭২

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৫

৫৫। তদেব, *ছল*, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৭

৫৭। তদেব

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৯

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৯

৬০। তদেব, *যশোমণি*, পৃষ্ঠা- ৩৮১

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৪

উপসংহার

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতাল জনজাতির জীবন নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এর কারণ 'শিল্পায়িত' ও 'পুঁজিবাদী', এর ফলে সমাজে নব্যবিশ্বের সঙ্গে সংযোগের ফলে রোমান্টিক ও পলায়নী প্রবৃত্তি অবতারণা হয়। পুজিবাদ উদ্ভুত 'বহিরাগত' মূলত সাহিত্যকীর্তিতে 'প্রকৃতি'কে সমাজ থেকে দূরবর্তী অবস্থান রূপে চিত্রিত করে, যে অবস্থানে লেখক সময়ে সময়ে 'মানসিক স্বীকৃতি' নিতে থাকেন। এই সাময়িক 'পলায়নবৃত্তি' বা সাহিত্যিক অভিগমন উপরিউক্ত 'পুজিবাদে'র ফসল। সীমান্তবর্তী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তথাকথিত অসভ্য সমাজ, এই পলায়ানকারী সাহিত্যিকদেরই রোম্যান্টিক প্রবণতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উনিশ শতকীয় বঙ্গ সমাজ এবং তার অন্তর্গত কিছু সাহিতিকগণ পশ্চিমী চেতনাটি ঔপনিবেশিক ধারক। এর ফলস্বরূপ বাঙালি সাহিত্যিকগণ প্রকৃতি ও প্রকৃতির কোলে অবস্থিত মানুষের জীবন কাহিনি আখ্যানরূপে প্রকাশ করতে থাকেন। উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এই ধারার অন্যতম লেখক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কাজের সূত্রে ভাগলপুরের বন-জঙ্গলে গিয়েছিলেন। শহর ও নাগরিক জীবন ছেড়ে অরণ্য জীবন অন্বেষণ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই মহাশ্বেতা দেবীও আদিবাসীদের নিয়ে 'প্রকল্প' হিসেবে চর্চা করেছেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে একুশ শতকের প্রথমার্ধে। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী লেখিকা নামেও পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত-এর মতো সৃষ্টিশীল লেখকদের রচনাগুলিতেও আদিবাসী চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে আদিবাসী চর্চা বর্ণময় হয়ে উঠে। আসলে সত্তর দশকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নানা সংকট অনুভব করেছেন। অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, গ্রাম-বাংলায় বসবাসকারী আদিবাসী, দলিত ও নিম্নবর্গের মানুষদের ইতিহাস ও সমাজকে না তুলে ধরলে বাংলা সাহিত্যের চর্চাতে খামতি থেকে যাবে। তাছাড়া আদিবাসীদের কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আদিবাসী দৃষ্টিকোণ থেকে

দেখতে চাননি। আদিবাসীর বেশ কিছু সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মিল থাকায় লেখকদের কাছে আদিবাসীরা আপন হয়ে উঠে। আব্দুল জব্বার তাঁর 'মাতালের হাট' উপন্যাসে সাঁওতাল জাতিকে 'হিন্দু' বলেই চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালরা 'হিন্দু' নয়। সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, কালীপদ ঘটক, শক্তিপদ রাজগুরু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, মানব চক্রবর্তী- সাঁওতালদের সম্বন্ধে নানা বই-পত্র, পত্র-পত্রিকা পড়াশোনা করেছেন এবং ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ করে 'গবেষণাধর্মী' গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। যার ফলে বহু লেখক ইংরেজদের দেওয়া সাঁওতাল সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে পোষণ করে গেছেন। 'ডকুমেনটেনশন'ধর্মী কথন শৈলীর বয়ানে কলকাতার নাগরিক জীবনের মানসিকতা ও মধ্যবিত্ত চেতনা সাঁওতাল জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে গল্প-উপন্যাসের রুদ্ধশ্বাস গতি কিংবা চরিত্রসৃষ্টির চমক অনুপস্থিত। সেখানে আছে আদিম বন-জঙ্গলের লোকায়ত বাগভূমির শিকড়সন্ধানে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা প্রয়োগ কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নেই ব্যতিক্রম সৃষ্টিছাড়া। তবে সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাসের দিক থেকে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আলোচ্য গবেষণার প্রথম অধ্যায় 'সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি', এই পরিচ্ছেদে আমরা পেয়েছি যে সাঁওতাল জনজাতির জীবন ইতিহাস। সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক, গবেষক, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তির গবেষণা থেকে জানা যায় সাঁওতালরা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়ড' (Proto-Australoi) গোষ্ঠীর মানুষ। এরা অস্ট্রিক ভাষা বংশের মানুষ। এদের বসবাস পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, নেপাল ও বাংলাদেশে। শহর থেকে বহু দূরের প্রান্তিক এলাকায় এদের বাসস্থান। কৃষি নির্ভর এদের জীবন। কৃষিভিত্তিক সমাজে সৃষ্টিতত্ত্বের ঐতিহ্য অনুসারে এরা মনে করে তাদের জাতিগত পরিচয়ের শিকড়ের সূত্রপাত 'খেরওয়াড়' বা 'খেরওয়াল' বংশ থেকে। পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি

হলো এদের প্রথম মানব-মানবী। সাঁওতালরা পিলচু বুড়া-পিলচু বুড়িকে পৃথিবী সৃষ্টিকর্তারূপে স্মরণ করে। এছাড়া সাঁওতালরা পূজা বা সেবা করে সিঞ চান্দো, নিন্দা চান্দো, মারাং বুরু, জম সিম, জাহের থান, গোসাই এরা– প্রভৃতি দেব-দেবীদের। বস্তুত তাদের মূল বিশ্বাস বোঙ্গাদের উপর। এদের গ্রামজীবন পরিচালনা করে গ্রামের 'পাঁচজন'। এরাই গ্রামের আনুষ্ঠানিক বিবাহ, টুঙকি দিপিল বাপলা, অর আদের বাপলা, ঞির বল বাপলা, ইতুৎ সিন্দুর বাপলা, সাঙ্গা বাপলা, কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা প্রভৃতি বিবাহ পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া 'এরক সিম বোঙ্গা', 'হারিয়াড় সিম বোঙ্গা', 'জান্থাড়', 'সহরায়', 'বাহা', 'নাওয়াই', দাঁসায়', 'কারাম', 'মাঃ মড়ে,' 'শিকার পরব'- বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান তাদের সমাজে হয়ে থাকে।

এই গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা', এই অধ্যায়ে আমরা পেয়েছি সাঁওতাল জনজাতির মাইগ্রেশনের ইতিহাস। এর মূলে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাঁওতালরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বারে বারে ত্যাগ করেছে। তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে ইংরেজ সরকার শাসন করেছিল। ইংরেজদের অত্যাচার থেকে এরা মুক্তি পায়নি। দুঃখ কষ্ট এদের জীবনে সঙ্গী ও ছায়ার মতো থাকে। স্বাধীনতা উত্তরকালেও ক্ষমতাশীল মানুষের অত্যাচারে সাঁওতালরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। সাঁওতাল সমাজের নানা রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও সংস্কার ভুলে গিয়ে এরা পালিয়ে বেড়ায় শুধুমাত্র জীবিকার আশায়। আর্থিক সংকটের কারণেই বর্তমানে অস্তিত্বের সংকট এদের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় হলো 'বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন'(১৯৪৭-২০১৫), এই অধ্যায়ে সাঁওতালদের বৈচিত্র্যময় জীবন দেখা যায়। বাংলা উপন্যাসে মূল কাহিনি, উপকাহিনি ও চিত্রকল্প-উপমার মধ্যে সাঁওতালদের জীবন বৈচিত্ররূপে ফুটে উঠেছে। বাঙালি ঔপন্যাসিকরা যেভাবে সাঁওতাল জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তার সাহস ও মেজাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে সাঁওতাল জীবনে বিভিন্ন দিকগুলির পরিবর্তন এসেছে। তাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট ইংরেজ আমল থেকে। তারা বছরের পর বছর ধরে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন ও যুদ্ধ করে বেঁচে আছে। বাবা তিলকা, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব, ফুলো, ঝানো হলো সাঁওতাল সমাজ তথা ভারতের বীর যোদ্ধা। এদের লড়াইয়ের অনুপ্রেরণায় লক্ষ লক্ষ সাঁওতালরা বেঁচে আছে বর্তমানে। এদের একতা, জোট, সংঘবদ্ধ জীবনই একমাত্র অস্ত্র বেঁচে থাকার। লড়াই-সংগ্রামে শুধুমাত্র পুরুষরাই যোগদান করেনি, নারীরাও এগিয়ে এসেছে। সাঁওতাল নারীদের বিদ্রোহিনী সত্তা দেখানো হয়েছে। ফুলো ঝানোর মতোই দেখতে পায় রুকনী, টুকনী, মানকী, ভৈরবী, দুলালীর মতো বিদ্রোহিনী নারী। নারীরা অত্যাচারিত, ধর্ষিত হয়েছে ক্ষমতাবান মানুষের কাছে। নারীরা যে ধর্ষিত হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে সাঁওতাল সমাজ বারে বারে প্রতিবাদ, লড়াই, আন্দোলন করেছে। সাঁওতালদের প্রতিবাদের স্বর বাংলা কথাসাহিত্যে নতুনভাবে স্থান পেয়েছে।

তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতালদের লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে দিকুদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর ফলে সাঁওতালদের জোট নষ্ট হয়। বাঙালি ও সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যে মেলবন্ধনের ছবি যেমন রয়েছে, তেমনি উভয় জাতির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বও উঠে এসেছে। বাঙালি ও সাঁওতালদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আসলে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কারণে। সাঁওতাল সমাজে দিকুদের প্রভাবে গণ আন্দোলনের পরিবর্তে খতম করার রাজনীতি বড় হয়ে উঠে। যার প্রমাণ রয়েছে নকশাল আন্দোলনে, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে কিংবা মাওবাদী আন্দোলনে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের ধারা রূপায়িত হয়েছে। সাঁওতাল জনজাতির শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তনের ফলে মানুষের সংস্কৃতিরও অদল-বদল হয়েছে। মানুষের জীবন অদল-বদল

হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাচীন জাতি বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। মানবসভ্যতার বিকাশের পিছনে তাদের সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিহার্য। আদিম জনজাতি দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করত। গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম সমাজের সাংস্কৃতিক উপকর্ষ-অপকর্ষের মাপকও তাই আলাদা আলাদা। এই সংস্কৃতির মধ্যেই আচরণগত পরিবর্তনও ধরা পড়ে। আচরণগত পরিবর্তন সমাজ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মতবাদেরও প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ সংস্কৃতি এমন একটা বিষয় যা থেকে মানুষের সংস্কৃতির সার্বিক দিক পাওয়া যায়। সমাজ ও সংস্কৃতিতে সাঁওতালদের জীবনবোধ ও জীবনদর্শনের ইতিহাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষগুলি সাঁওতালদের পাহাড় পূজা ও মেলাগুলিতে উপস্থিত হয়ে ভারতের মহামিলনের ছবিও অম্লান হয়ে থাকবে আখ্যান ভুবনে। সাঁওতালদের 'মেলা' বা পূজনীয় স্থানগুলি সমগ্র জাতির মিলন মেলাতে পরিণত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই বিশ্বাস, জ্ঞান, শিল্প ও রীতিনীতি রয়েছে। তাদের সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বাসস্থান, সংগ্রাম ও জীবিকার ইতিবৃত্ত। তাদের অভ্যাস, কলাকৌশল ও মূল্যবোধের ছবিও স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে। বাংলা উপন্যাসে সাঁওতালদের সংস্কারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সমাজের পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বিশ্বাস ও ধারণা। সমাজের বিধি, নিয়ম-কানুন ও পরিশীলিত বিবর্তনের রূপরেখা সংস্কৃতির অন্যতম দিক। সাঁওতাল জাতির মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের চর্চাতে সংস্কৃতির ধারণা পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সাঁওতালদের গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনের মধ্যে সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্য গ্রথিত। বহুকাল পর্যন্ত অরণ্যবাসী এই আদিম জনগোষ্ঠী শ্রুতিপরম্পরায় তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞান বহন করে চলেছে। তবে একেবারে অ-পরিবর্তনশীল নয় এই পরম্পরা। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে সাঁওতালরা নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে পারছে না। খ্রিস্টান ধর্মে ধমান্তরিত হয়েছে। আবার তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও দেখা যায়। এখানেও

অর্থনৈতিক টানাপোড়েন রয়ে যায়। আবার সাঁওতালদের কাছে ডাইনি বিশ্বাসই বড়, তাদের সমাজে জানগুরু হল ভগবানের সমতুল্য। এরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত মানুষ, এই অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে সাঁওতাল সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করে। তাদের সব সমস্যা সমাধান করতে পারে না সালিশিসভা। গ্রাম সমাজে সালিশী সভার গুরুত্ব কিছুটা হলেও কমেছে। এর কারণ আধুনিক শিক্ষার প্রভাব। অনেক উপন্যাসেই শিক্ষিত সাঁওতাল চরিত্রের কথা পেয়েছি। তারা আদিবাসী সমাজের কথা ভেবে কাজও করেছে। আবার অনেকেই শিক্ষা লাভের পর কিংবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পাওয়ার পর আদিবাসী সমাজ থেকে দূরে সরে থেকেছে।

সাঁওতাল জীবন কেন্দ্রিক যে সমস্ত বাংলা উপন্যাস উঠে এসেছে, সেখানে উপন্যাসের গঠনগত দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রায় সব উপন্যাসে সাঁওতালদের লোকজ উপাদান ও লোকায়ত জীবন প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতালদের পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের রীতিনীতিগুলি আখ্যানে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। মারাংবুরু, জাহেরথানে জাহেরদেব, মোরেকোদেব, পরগণা বোঙ্গা এবং গোসাই এরাঃ- প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রসঙ্গ এসেছে। সাঁওতাল জনজাতির 'শারী সারজম বাহা হো', 'মাঘ উৎসব', 'এরোক' ও 'জান্থাড়'– ইত্যাদি রীতিনীতি বাংলা উপন্যাসের পরতে পরতে রয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় সাঁওতালদের 'দাঁশাই' উৎসব আর বছরের শেষে 'শিকার' উৎসব যেমন উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তেমনি সাঁওতালদের 'বাঁধনা' পরব গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে। মূলত সাঁওতাল সমাজ ও তাদের জীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের গঠনগত দৃষ্টিভঙ্গি দিকগুলি নতুনত্ব ও অভিনবত্ব রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় হলো ‘বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন’(১৯৪৭-২০১৫), এই অধ্যায়ে আমরা পেয়েছি চেনা জগতের আখ্যান নয়, বরং দূর বিস্তৃত অঞ্চলের নির্জন স্নিগ্ধ পরিবেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রবহমানতায় ভারতের চিত্র। ছোটগল্পগুলিতে সাঁওতালদের সংগ্রাম কিংবা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ খুব বেশি নেই, বরং প্রকৃতির কোলে অবস্থিত সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের কাহিনি ছোটো ছোটো গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। একেবারে প্রান্তিক ভারতের ছবি উঠে এসেছে। সেই সমস্ত প্রান্তিক অঞ্চলের মেয়েরাও পড়াশোনা করছে, শিক্ষিত হয়ে উঠছে। আদিম নারী থেকে আধুনিক শিক্ষিত নারীয় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। সেখানে প্রাচীন বিশ্বাসে সমাজ পরিচালিত হয়, যেখানে অন্ধ বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই রকম পরিবেশে অশিক্ষার চূড়ান্ত সীমাকে লঙ্ঘন করেছে কিছু সুবিধাভোগী পুরুষ চরিত্র। যেখানে তারা সাঁওতালদের অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নারীর যৌন জীবন উপভোগ করেছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় সাঁওতালরা সুবিধাভোগী মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। সাঁওতাল সমাজে অসহায়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে প্রতিবাদী সাঁওতালরা নীরব থেকেছে। বাধ্য হয়ে তারা পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। আর্থিক সংকটের জন্যই আদিবাসী জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে অনেকেরই। আজীবন ব্যাপী জঙ্গল আর কাঠ কাটা ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। অর্থাৎ সাঁওতাল জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা, কষ্টের অনুভব পরিস্ফুট হয়েছে ছোটগল্পগুলিতে।

বাংলা ছোটগল্প নির্মিত হয়েছে বিশেষ একটি সময়কে ধরে নয়। সমকালীন সাঁওতাল জীবনচিত্রাবলী নির্মাণ করতে গিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা হয়নি গল্পের পাতায়। বাংলা ছোটগল্পগুলিতে সাঁওতালদের রাজনীতি, লড়াই, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, হিংসা-ক্রোধ তেমনভাবে উঠে আসেনি, যেমনভাবে উঠেছে আদিম জনজাতির জীবনশিল্প। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে গ্রথিত আছে দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়ন, সংগ্রাম, লড়াই, হতাশা ও ব্যর্থতা এবং বন-জঙ্গল-

পাহাড়ের দরিদ্রজীবন ও পরিশ্রমী কৃষি জীবন। সাঁওতালদের মাটির রস, বাতাসের গন্ধ ও চলমান জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আখ্যায়িত হয়েছে বাংলা ছোটগল্পে।

গল্প-উপন্যাস মিলেই কথাসাহিত্য। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিরাট এক ন্যারেটিভ থাকে কথাসাহিত্যে, যাকে বলে জীবনের বিন্যাস। কথাসাহিত্যের জীবন বিন্যাস তৈরি হয় বাস্তব জীবন থেকে। একটা জাতির জীবন নিয়ে একজন লেখকের আখ্যান যতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, তার থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে একটা জাতির জীবন নিয়ে বহু লেখকের বহুমাত্রিক রচনায়। দশকের পর দশক যখন সাঁওতাল জীবনের বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় তখন তা সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাঁওতাল জীবনের প্রতিবাদ-লড়াই-সংগ্রাম, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির চিন্তা-চেতনার ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলা কথাসাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে সাঁওতাল জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙালি লেখকদের ক্রমাগত চিন্তাধারাগুলি উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাঁওতাল জীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্ত হয়ে উঠেছে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অরণ্যের দিনরাত্রি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* একাদশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* দশম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৭

ঘটক, শ্রীকালীপদ, অরণ্য-কুহেলী, পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ মহালয়া, ১৯৪৯

চক্রবর্তী, মানব, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৯৯৪

চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪

জব্বার, আব্দুল, *মাতালের হাট,* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫

দেবী, মহাশ্বেতা, *সিধু কানুর ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১

দেবী, মহাশ্বেতা, *শালগিরার ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১

বেরা, নলিনী, *দুই ভুবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

বেরা, নলিনী, *শাল মহুলের প্রেম,* মর্ডান কলাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ২০১০

বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস, রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, ও চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পা.), বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *দ্বৈরথ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), ঘোষ, সুবোধ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জৈষ্ঠ্য ১৯৪৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, ঘোষ, সুমথনাথ, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার (সম্পা.), বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* ষোড়শ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৭৮

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, ঘোষ, সুমথনাথ, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার (সম্পা.), বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ* খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৮০

মিশ্র, ভগীরথ, *জানগুরু,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, *পঞ্চতপা,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৯৬১

রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৫

সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়,* জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *তৃণভূমি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬

সহায়ক গ্রন্থ: বাংলা

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক,* প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক,* দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯

আজাদ, আনোয়ার (সম্পা.), *আদিবাসীর বিবর্ণ আলাপ,* উৎস প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে বইমেলা ২০১৪

আজাদ, সালাম, *আদিবাসীদের ভাষা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও ভারত,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

ইসলাম তরু, মাযহারুল, *বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

উমর, বদরুদ্দীন, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের কৃষক,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

কর, ধীরেন্দ্রনাথ, *রাঢ় বাঁকুড়ার লোকভাষা ও লোকশব্দাবলী,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৮

খোকন, সালেক, *আদিবাসী পুরাণ,* জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ১৮২৩

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

ঘোষ, ঋষিপ্রতিম, *তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২

ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

ঘোষ, দীপঙ্কর (সংকলন ও সম্পা.), *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০5

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড),* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খণ্ড),* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.), মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *সুনির্বাচিত কয়লাকুঠি গল্পসংগ্রহ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১০

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮

চট্টোপাধ্যায়, অসীম (সম্পা.), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা (ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার),* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৯

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ২০১৭

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *বাংলা সাহিত্য পরিচয়,* তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৯

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সাংস্কৃতিকী,* প্রথম খণ্ড, বাক-সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৯৬০

চৌধুরী, অরুণ, *আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম,* গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৩

চৌধুরী, অরুণ (সম্পা.), দত্ত, লোকনাথ, *সাঁওতালকাহিনী (বনবীর-গাথা),* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮

চৌধুরী, কমল (সংকলন), *জঙ্গলে জঙ্গলে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৪

চৌধুরী, কমল (সম্পা.), *সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১

চৌধুরী, ভূদেব, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৪

চৌধুরী, ভূদেব,*বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার,* মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২

চৌধুরী, রমাপদ, *গদ্য সংগ্রহ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ২০১০

চৌধুরী, শম্পা, *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০

টুডু, বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬

ঠাকুর, কিশলয়, *পথের কবি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা মে ১৯৮২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্যের পথে* (সাহিত্যতত্ত্ব নিবন্ধ), বিশ্বভারতী, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৮

দত্ত, লোকনাথ, *সাঁওতালি কাহিনী(বনবীর-গাথা),* চৌধুরী, অরুণ (সম্পা), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৯

দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

দাশ, উদয়চাঁদ, *আখ্যানের সম্প্রসারণ উনিশ শতক বিশ শতক,* প্রকাশনা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ২০০৯

দাশ, বুদ্ধদেব, *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

দাশ, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম (তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার),* নক্ষত্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৭

দাশগুপ্ত, অশীন, *প্রবন্ধ সমগ্র,* ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১

দাশগুপ্ত, রাহুল, *উপন্যাসকোষ* (১৮২৫-২০১৫), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব,* ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড দ্য বুকসেলার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৪

দাস, সহদেব, *অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাসে প্রান্তজন,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৯

দাস, স্বপনকুমার, *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সংগ্রহ,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালী, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৭

দে, দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত ১৯৪৭- ২০১০,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২

দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০১০

দেবী, মহাশ্বেতা, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৭৭

দেবী, মহাশ্বেতা, *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ কার্তিক ২০১১

দেবী, মহাশ্বেতা ও সাহা, পৃথ্বীশ (অনুবাদক), এল্যুইন, ভেরিয়ার, *আদিবাসী জগত,* সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০০

নিয়োগী, আশিস (সম্পা.), *স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ: আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা সম্ভবনা,* জাতীয় গ্রন্থগার কর্মী সমিতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৮

পলমল, অরূপ (সম্পা.), *কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত,* ডাভ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৩

পালিত, চিত্তব্রত, *ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ চিত্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

পাল, রবিন, *উপন্যাস তত্ত্ব কিছু কথা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯

পাল, রবিন, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪

পাল, রবিন, *কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *রমাপদ চৌধুরী: বৈচিত্র ও অনুসন্ধান,* উজাগর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী,* উজাগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

মাহাত, পশুপতি প্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

বনফুল, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প,* সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৬৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন (সম্পা.), *সাঁওতালী কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (এক অনালোচিত অধ্যায়),* পাঠক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী (দশম খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথম খণ্ড),* নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৯৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* একবিংশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৯৮৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *উপন্যাস রাজনৈতিক,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, বিভূতিভূষণের কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথি (ভাষান্তর), চক্রবর্তী, দিগম্বর, *সাঁওতাল হুল- ১৮৫৫,* পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিয়ম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন, *ভাষাত্মদর্শন,* ধ্যানবিন্দু, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ষড়বিংশ মুদ্রণ আষাঢ় ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক গ্রন্থাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *সেরা মানিক,* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা মাঘ ১৯৯২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *ধিমাল,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *গ্রামবাঙলার গঠন ও ইতিহাস,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *প্রসঙ্গ আদিবাসী,* অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা (অনুবাদ), *গঠনবাদ, উত্তর- গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫

বসু, দেবকুমার, *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

বাগ, গীতা, *বীরভূমের সাঁওতালি জীবন-বৈচিত্র্য,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *আদিবাসী রূপকথা,* শ্রীমতি রিংকি বাস্কে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ষষ্ঠ প্রকাশ আগস্ট ২০১৩

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, নবম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম প্রকাশ মার্চ ২০১৩

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান,* পূর্বালোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩

বিশ্বাস, কণিকা, *অনুসন্ধান মহাশ্বেতা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২

বিশ্বাস, নীতিশ ও বিশ্বাস, মুকুলেশ (সম্পা.), *বঙ্গ সংস্কৃতি: সংহতির ঐতিহ্য,* ঐক্যতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৫

বিশ্বাস, সুকৃতিরঞ্জন, *প্রসঙ্গ দলিল মুক্তি আন্দোলন,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫

বসু, প্রদীপ (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী* (*বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান*), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০১২

ব্যানার্জী, অনিমেষ (সম্পা.), *পুরুলিয়া: ব্রাত্যজীবনের গল্পমালা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৮

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা,* কোরক, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩

ভৌমিক, সুহৃদকুমার, *বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য,* মনফকিরা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

ভৌমিক, সুহৃদকুমার (অনুবাদ, সংযোজন ও ভূমিকা), বোডিং, রেভাঃ পল ওলাভ, *সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ,* মারাংবুরু প্রেস, পূর্ব মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ ২০১১

ভৌমিক, সুহৃদকুমার, *সাঁওতালি ভাষা চর্চার গুরুত্ব নির্ণয়,* স্মরণিকা সাঁওতালি ভাষার আন্তর্জাতিক সম্মেলন, মার্চ ২০০৫

ভট্টাচার্য, অমর, *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন,* নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২

ভট্টাচার্য, জগদীশ, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী,* ভারবি, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৮

ভট্টাচার্য, তপোধীর, *কথার সময়: সময়ের কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ২০১৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ, *উপন্যাসের কথা,* জি. এ. ই. পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬১

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ধর্ম ও সংস্কৃতি (প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০১৮

ভট্টাচার্য, বীতশোক, *কথাজিজ্ঞাসা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ২০০৩

ভট্টাচার্য, বীতশোক, *বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ২০০৬

ভট্টাচার্য, সুভাষ, *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৭

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *আদিবাসী প্রেমের লোককথা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *আদিবাসী রূপকথা,* কৃতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮১

মণ্ডল, দীনবন্ধু, *সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৫

মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ, *জঙ্গলমহল, চুয়াড় বিদ্রোহ ও সমকালীন ভূমিব্যবস্থা,* সহজ পাঠ, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫

মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন,* পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ জুলাই ২০১২

মাহাতো, ক্ষীরোদচন্দ্র, *মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

মিত্র, শিবেন্দুশেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

মিদ্দে, সুরঞ্জন (সম্পা.), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, প্রথম পাবলিকেশন জুন ২০১৮

মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

মিশ্র, ভগীরথ, *নির্বাচিত গল্প,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৩

মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, *জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

মুর্মু, বিমল, *সাঁওতালি ভাষা ও বিশ্বের ভাষা মানচিত্র,* আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯

মৌলিক, সুমন কল্যাণ (ভাষান্তর), *নকশালবাড়ি থেকে লালগড় (একটি বহুমাত্রিক ক্রিটিক: ১৯৬৭-২০১২),* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

রাজিব, রাহেল (সম্পা.), *রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৫

রাণা, সন্তোষ ও রাণা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮

রায়, অলোক, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০০

রায়, অলোক (সম্পা.), *সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

রায়, অরিন্দম, *আদিবাসী জীবনের আখ্যান ও আখ্যানে আদিবাসী জীবন,* এবং প্রান্তিক, বারাণসী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৮

রায়, তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

রায়, দেবেশ, *উপন্যাস নিয়ে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রায়, নীহাররঞ্জন, *কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি,* জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

রায়, সুপ্রকাশ, *তেভাগা সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, সংশোধিত দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১২

শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯০৪

সমাদ্দার, ভাস্বতী, *বাংলা উপন্যাসের পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮),* পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

সমাদ্দার, রণজিৎকুমার, *সাঁওতাল গণযুদ্ধ: সমকালীন সমাজ ও সাহিত্য,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

সরকার, পবিত্র, *লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব,* চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট মিলিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪

সরকার মোহিনীমোহন, রায় রিপন (সম্পা.), *সতীনাথের সাহিত্য মননে ও সৃজনে,* পরম্পরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

সরকার, রেবতীমোহন, *নৃবিজ্ঞান প্রবেশিকা,* দ্বিতীয় খণ্ড, নলেজ হাউজ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭),* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

সরেন, সুন্দরী, *সাঁওতালী লোকসঙ্গীত,* সুশীল কুমার সরেন, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১

সাহা, চন্দনা, *আদিবাসী সংগীত পটভূমি মালদহ,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০১৬

সেন, অঞ্জন ও বসু, প্রদীপ (সম্পা.), *জাতপাতের কথা: ভারতীয় সমাজ ও জাতপাতের সমস্যা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎবঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫

সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ: দ্বন্দ্বের বিন্যাস,* প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ কার্তিক ২০১৩

সেন, শুচিব্রত, *সত্তার সন্ধানে: বঙ্গসংস্কৃতি (আদিবাসীযাপন ও অন্যান্য),* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর,* পাল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

সেনগুপ্ত, বাঁধন, *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,* সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬

সোলাইমান, আবেদ ইবনে, *আদিবাসীদের জীবনধারা,* রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯

সুর, অতুল, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্য লোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮

হালদার, গোপাল, *বাংলা বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (দ্বিতীয় খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭

হেমব্রম, বাদল, *শারদীয়া আদিবাসী জগত প্রবন্ধ সমগ্র ২০০১- ২০০৩,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রকাশকাল জুলাই ২০১৪

হেমব্রম, পরিমল, *আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

হেমব্রম, পরিমল, *সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭

হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি ভাষা চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০

হোতা, দিব্যেন্দু (সম্পা.), সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

হোসেন, সোহরাব, *জনজাগরণের উপন্যাস অরণ্যের ইতিহাস,* করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

বাংলা অভিধান:

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *রাজনীতির অভিধান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৩

দত্ত, দেবাশিস (সম্পা.), *অভিনব বাঙ্গালা অভিধান,* দ্য ইউনিক বুক সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

দাশ, ক্ষুদিরাম (সংকলক), *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৬৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৬৭

মণ্ডল, স্বস্তি, *মণীন্দ্রলাল বসু,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

মিত্র, সুবলচন্দ্র (সংকলিত), *সরল বাঙ্গালা অভিধান,* নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৪

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি: বাংলা

কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পা.), *বিষয়: নলিনী বেরা* (কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা), সৃজন, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৯

চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী (সম্পা.), *সমকালীন পত্রিকা,* দামোদর গ্রুপ অফ প্রিন্টার্স, দুর্গাপুর, বর্ষ- ২, সংখ্যা- ৬, ২০০৫

গুহ, স্বাতী, বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা, বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ (সম্পা.), *আরসি নগর (সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা),* বর্ণনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২০

দাশ, শ্যামলকান্তি (সম্পা.), *কবিসম্মেলন পত্রিকা,* কলকাতা, দশমবর্ষ নবম সংখ্যা মে ২০১৪

দে, আমর (সম্পা.), *গল্প সরণি (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা),* কলকাতা, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ২০১১

দেবী, মহাশ্বেতা, *আমার কথা,* কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ২০০৫

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *উজাগর (পার্টিশন, মানবধিকার, গণতন্ত্র ও সাহিত্য সংখ্যা),* উজাগর প্রকাশন, হাওড়া, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৬

ফুয়াদ, আফিফ (সম্পা.), *দিবারাত্রির কাব্য (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা),* দ্বাবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৪

ফুয়াদ, আফিফ (সম্পা.), *দিবারাত্রির কাব্য (সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা),* চতুর্দশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৬

বর্মণ, যোগেশচন্দ্র (সভাপতি), *লোকশ্রুতি/৮,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

বসু, অরূপ (সম্পা.), *বারনরেখা,* কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৭

ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা.), *লোকশ্রুতি/২০,* বিংশ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলার জমিদার),* বাগুইহাটি, কলকাতা, প্রাক-শারদ ২০১৮

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (ক্রোড়পত্র: সুবোধ ঘোষের সাহিত্য ও জীবন),* বাগুইহাটি, কলকাতা, প্রাক-শারদ ২০০৮

মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পা.), *তবু একলব্য (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা),* দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৮

রায়চৌধুরী, সুব্রত (সম্পা.), *তথ্যসূত্র (মন্বন্তরের কথা কথায় মন্বন্তর),* রক্তকরবী, কলকাতা, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২০১৫

সরকার, নীলকমল (সম্পা.), *অক্ষররেখা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৮

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (ভালোবাসা বাংলা কথাসাহিত্যে),* মুর্শিদাবাদ, ৪৭ বর্ষ, ২০০৮

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (ভালোবাসা: বাংলা কথাসাহিত্যে পর্ব ২),* মুর্শিদাবাদ, ৪৮ বর্ষ, ২০০৯

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (অভিনব সৃষ্টি: বাংলা কথাসাহিত্যে ২),* মুর্শিদাবাদ, ৪৯ বর্ষ, ২০১০

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক (নানারূপে নারী: সেকাল-একাল ১),* সোনারপুর, কলকাতা, মাঘ ২০১৭

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক, অঞ্চলের নানা কথা,* সোনারপুর, কলকাতা, আশ্বিন ২০১৭

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক (প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি),* সোনারপুর, কলকাতা, আশ্বিন ২০১৮

সামন্ত, সুবল (সম্পা.), *এবং মুশায়েরা (গুণময় মান্না সংখ্যা),* কলকাতা, শারদীয় ২০১০

সামন্ত, সুবল (সম্পা.), *এবং মুশায়েরা,* কলকাতা, বৈশাখ-আষাঢ় ২০১৪

হালদার, নারায়ণ (সম্পা.), *ভাষা ও সংস্কৃতি,* ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, নদীয়া, আষাঢ়, ২০১৬

সাঁওতালি গ্রন্থ:

ভৌমিক, সুহৃদকুমার (সম্পা.), টুডু রেস্কা, মাঝি রামদাস, *খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি,* মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৮

মুর্মু, রামেশ্বর, *খেরওয়াল কওয়াঃ বিন্তি-ভৌগতি,* আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

মুর্মু, সহদেব, *শিকার দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ সেরেঞ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৫

মুর্মু, সাধু রামচাঁদ, *লিটৌ গোডেৎ,* কালিপদ হেমব্রম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চম প্রকাশ ২০১৭

স্ক্রেফসরুড, রেভারেনড এল ও, *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা,* পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, কলকাতা, আকাদেমি প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ: ইংরেজি

Archer, W. G, Tribal law and Justice, Concept publishing Company PVT.LTD, New delhi, First Published 1984

Bagchi, T. and Bhattacharya, R. K. (Eds.), Bondopadhyaya, S, Sing, K. S. People of India: West Bengal, Anthropological Survey of India, Seagull Books, Calcutta, Second Edition: April, 2008.

Bodding, P.O, *Material for A Santali Grammar II,* Dhirendra nath Baskey, Kolkata, First Published-1929, Reprinted- 2011

Bodding, P.O, Santal Folk Tales, Vol- i, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bodding, P.O, Santal Folk Tales, Vol- ii, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bodding, P.O, Santal Folk Tales, Vol- iii, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bompas, Cecil Henry, Folklore of the Santal Parganas, Gyan Publishing House, New Delhi, 2015

Census of India (2011), Primary Census Handbook, Govt. of India, New Delhi, First Edition: April 2013

Choudhuri, Nirad C, *The Continent of Circe*, Jaico Publishing House, Bombay, First Publication 1960

Cuddon, J. A, *Literary terms and literary theory*, Penguin book, 2013

Dalton, E.T. *Descriptive Ethnology of Bengal*, Op.cit.

Das, Dr. A. K, *To be with Santals*, Cultural Research Institute, on behalf of Scheduled Castes and Tribes Welfare Department, Government of west Bengal, Calcutta, 1982

Gupta, Ratna(Editor), *Profile of tribal Women in West Bengal,* Bulletin of the Culture Research Institute, Schedule Castes & Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, First Published- 1990

Hembrom, Timotheas, The Santal and the Biblical Creation Tradition, Adivaani, Kolkata, 2013

Kisku, D.B, The Santals and Their Ancestors, Hihiri Pipiri, Dumka, 2000

Lubbock, Percy, *The Craft of Fiction*, B.L Publication, New Delhi, 1979

L.P. Vidyarathi, Aspects of Tribal Leadership in Chhotanagpur, Leadership in India, Asia Publishing House, Bombay, 1967

Matthews, Brander, *The Philosophy of the short-story,* Longmans, Green, and Co, First edition, January, 1901

Mukherjee, Charulal, The Santal, Gyan Publishing House, New Delhi, 1962

Munda, Ram Dayal, *Adi-Dharam (Religious beliefs of the Adivasis of India),* Adivaani, Kolkata, First Publication 2014

Oraon, Dr. Prakash Chandra, Land and People of Jharkhand, Jharkhand Tribal Welfare Research Institute, Welfare Department, Government of Jharkhand, Ranchi, 2003

O' Malley, L.S.S, *Bengal Districts Gazetteers,* Midnapore, Logos Press, New Delhi, 2015

O' Malley, L.S.S, Bengal Districts Gazetteers, Birbhum, Logos Press, New Delhi, 2015

Ram Dayal Munda, S. Bosu Mullick, *The Jharkhand Movement*, IWGIA Document no-108, Copenhagen, 2003

Risley, H.H, *The Tribes and Castes of Bengal*, Firma KLM Private limited, Calcutta, 1998

R.N. Mishra, *Regionalism and State Politics in India*, Ashish Publishing House, New Delhi, 1984

Sen, Sunil Kumar, *Tribal Struggle for freedom Singhbhum 1820-1858,* Concept Publishing Company, New Delhi, First Published- 2008

Saraswati, Baidyanath (Editor), *Tribal Thought and Culture,* Concept Publishing Company PVT.LTD, New Delhi, First Published- 2017

Troisi, J, Tribal Religion, Manohoar, New Delhi, 1979

The Gazette of India, *Extraordinary*, Part-ii Section-3, Publish by Authority, No (4) - New Delhi, Wednesday, September 6, 1950

The Gazette of India, *Extraordinary*, Part-ii Section-3, Publish by Authority, No (316-A) - New Delhi, Monday, October 1956

Vidyarthi, L.P(Editor), *The profile of the Marginal and Pre-farming Tribes of Central-Eastern India,* Schedule Castes & Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, First Published- 1981

বৈদ্যুতিন উৎস

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সত্যজিৎ রায়ের ছবি অরণ্যের দিনরাত্রি: পঞ্চাশ বছর পর আবার অরণ্যে* – মানবেন্দ্রনাথ সাহা, লিঙ্ক- https://aponpath.com/aranyer-dinratri-abar-aranye-manabendranath-saha/, Accessed 27th January, 2020

চৌধুরী, রমাপদ, *যুগের অবসান: সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮),* লিঙ্ক- *https://zeenews.india.com/bengali/entertainment/sahitya-academy-awardee-bengali-writer-ramapada-chowdhury-passes-away-at-96_206274.html*, Accessed 1st July, 2018

চৌধুরী, রমাপদ, *জীবিতের পোস্টমর্টেম? এই কাজই করতেন রমাপদ চৌধুরী,* লিঙ্ক - *https://www.dailyo.in/bangla/arts/remembering-ramapada-chowdhury-obituary-abhimanyu-kharij-writer/story/1/25928.html*, Accessed 25th August, 2018

চৌধুরী, রমাপদ, *শ্রীরমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮),* লিঙ্ক- https://www.anandabazar.com/editorial/ramapada-chowdhury-died-at-the-age-of-95-1.840037 Accessed 6th June, 2019

বেরা, নলিনী ও রক্ষিত, সৈকত, *চেনা জীবনকেই তাঁরা বিষয় করে তুলেছেন,* রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লিঙ্ক- https://www.anandabazar.com/culture/book-reviews, Accessed 16th April, 2018 2022

বেরা, নলিনী, *স্বভূমি-স্বজনদের জীবনচরিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায়,* লিঙ্ক- https://www.anandabazar.com/culture/book-reviews/review-of-a-novel-penned-down-by-nalini-bera-1.985393, Accessed 28th April, 2019

বেরা, নলিনী, *নলিনী বেরা'র আখ্যান: প্রান্তিক জীবনের যাপিত চরিত লিখেছেন সসীমকুমার বাড়ৈ,* লিঙ্ক- https://pagefournews.com/nolini-bera-sasimkumar-braai/, Accessed 14th Febuary, 2021

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর, *কার্মাটাঁড়ে রয়ে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর, রয়েছে নানা গল্প,* লিঙ্ক - https://www.anandabazar.com/editorial/vidyasagar-s-last-days-were-not-so-well-1.1049818 , *Accessed* 12th July, 2022

মিশ্র, ভগীরথ, ভগীরথ মিশ্র'র লেখালিখি, লিখেছেন:সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমীর ঘোষ, লিঙ্ক- https://galpersamay.com/2017/09/25/ , Accessed 19th February, 2022

মিশ্র, ভগীরথ, *কথাকার ভগীরথ মিশ্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ: 'গল্পপাঠে'র পক্ষে* নীহারুল ইসলাম ও বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, https://www.galpopath.com/2015/04/blog-post_40.html, Accessed 3rd March, 2022

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, *সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,* প্রয়াণের ২৫ বছরে মুখ খুললেন কন্যা সর্বাণী মুখোপাধ্যায়। লিঙ্ক- http://archives.anandabazar.com/archive/1140111/11smaran.html , Accessed 2nd May, 2020

রক্ষিত, সৈকত, *Interview of Saikat Rakshit, Writer,* লিঙ্ক- https://www.youtube.com/watch?v=Rz5F_2_cpP4, Accessed 24th March, 2020

রক্ষিত, সৈকত, *সৈকত রক্ষিতের সঙ্গে কথোপকথন,* লিঙ্ক- https://www.youtube.com/watch?v=0lc0EfWKk9c, Accessed 5th June, 2022

STATISTICAL PROFILE OF SCHEDULED TRIBES IN INDIA 2013 MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION Government of India *www.tribal.nic.in*, Accessed 12th July, 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Novel , Accessed 25 September, 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Santal_people , Accessed 20th January, 2019